চরিত-সুধা

পঞ্চম খণ্ড

পঞ্চম সংস্করণ

শ্রীরামদাস বাবাজী

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।।



চরিত-সুধা

শ্রীশ্রীমদ্ রাধারমণ চরণ দাস দেব বাবাজী মহারাজের

জীবনচরিত

পঞ্চম খণ্ড

পঞ্চম সংস্করণ

প্রকাশক

শ্রীরামদাস বাবাজী

শ্রীশ্রীরাধারমণ বাগ, শ্রীধাম নবদ্বীপ

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৫২০ ইং ১।৪।২০০৫

প্রকাশক ঃ

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহারাজের প্রতিষ্ঠিত
শ্রীশ্রীনিতাইগৌরাঙ্গ ট্রাষ্টের "ট্রাষ্টীবোর্ড"।
শ্রীপাঠবাড়ী আশ্রম, কলকাতা-৭০০ ০৩৫

প্রাপ্তিস্থান ঃ

শ্রীপাঠবাড়ী আশ্রম
বরাহনগর, কলকাতা-৩৫
দূরভাষ ঃ ২৫৭৭-০১৩৩
৫৫২৫-১৭৩১

মুদ্রক ঃ

শ্রীদুলাল চন্দ্র মান্না
রামকৃষ্ণ সারদা প্রিন্টিং
১৯ই/এইচ/১৯, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০০৬
দূরভাষ ঃ ২৩৫১-৭৯০২

মুদ্রণব্যয়ানুকুল্যে ৪০.০০

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

জয় নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জয় হরে কৃষ্ণ হরে রাম ॥

নিবেদন

পরমকরুণাময় শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গের অপার করুণায় এবং শ্রীশ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণকৃপাশীর্ব্বাদে তাঁহার পুণ্য "চরিত-সুধা" **পঞ্চম খণ্ড পঞ্চম সংস্করণ** নির্ব্বিঘ্নে পুর্নমুদ্রিত হইল। ভক্তগণ ইহা পাঠে পরমানন্দ লাভ করিলেই কৃতার্থ হইব।

পরমকরুণ শ্রীগুরুদেব যাহাকে কৃতান্তের করাল কবল হইতে প্রসহ্য নিঃসারণপূর্ব্বক অদোষদর্শিতাগুণে তাহার অশেষদোষরাশি মার্জ্জনা করিয়া পরমৌদার্য্যসলিলে তাহার অস্পৃশ্যতা-মালিন্য প্রক্ষালন করতঃ শ্রীচরণাশ্রয় এবং প্রুফ সংশোধনাদি যোগ্যতানুরূপ সেবাধিকার প্রদানে কৃতার্থ করিয়াছিলেন, স্বতন্ত্রতাদোষে নির্মম কলির নিদারুণ নিষ্পীড়নে শতধাভিন্ন তাহার হৃৎপিণ্ডটি করুণামৃতনিষেকে সঞ্জীবিত এবং দুর্বিষহ অর্ন্তজ্বালা নির্বাপিত করিয়া তাহাকে কৃপাদত্ত সেবামৃত পানে পরিতৃপ্ত করুন—শ্রীগুরুচরণে সর্বান্তঃকরণে এই প্রার্থনা।

নবদ্বীপ (নদীয়া)
শ্রীশ্রীরাধারমণ বাগ
২৫শে আশ্বিন, ১৩৮২ সাল

বিনীত—
প্রকাশক

সূচীপত্র

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

বন্দনা

গুরুং পূর্ণানন্দং সজলনয়নং প্রেমবিবশম্
নবদ্বীপানন্দাম্বুধিশশধরং ভক্তসুখদম্।
মুহুর্বৃন্দারণ্যং ভ্রমতি রসিকান্ ভক্তনিকরান্
পরিপ্লুতং বাগ্ ভিরমৃতমধুরৈঃ স্বৈরহি ভজে।।

শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু, দীননাথ দীনবন্ধু,
পতিত পাবন অবতার।
জয় দেব গণপতি, জয় মহেশ পার্ব্বতী,
করুণা করহ এই বার।।
জয় গৌর নিত্যানন্দ, পরম আনন্দকন্দ,
অধম তারণ গুণনিধি।
শ্রীঅদ্বৈত গদাধর, শ্রীবাসাদি সহচর,
ভক্তিভরে বন্দি নিরবধি।।
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ, মদন মোহন সাথ,
শ্রীরাধারমণ বংশীধারী।
নবীন নীরদ শ্যাম, রসময় রসধাম,
বিনোদ বিহারী বনোয়ারী।।

রসিক শেখর বর,　　　　রসে তনু ঢর ঢর,
ললিত ত্রিভঙ্গ বাঁকা ঠামে।
দামিনী দমন কাঁতি,　　　　নব গোরোচনা ভাতি,
বৃষভানু-সুতা শোহে বামে।।
রাধাকুন্ড, শ্যামকুন্ড,　　　　জয় শ্রীললিতা কুন্ড,
কালিন্দী মানস সুরধুনী।
জয় গিরি গোর্বদ্ধন,　　　　জয় কুসুম কানন,
জয় জয় বৃন্দাবন ভূমি।
পরাণ রতন ধন,　　　　প্রভু শ্রীরাধারমণ,
অশ্রু কম্প পুলকিত অঙ্গে।
অন্তরঙ্গ ভক্ত সঙ্গে,　　　　লীলারস পরসঙ্গে,
ভ্রমিলেন করি কত রঙ্গে।।
বড় সাধ ছিল চিতে, (তার)　　　　এক বিন্দু আস্বাদিতে,
তাই লিখিবারে হৈল লোভ।
হৃদয় কঠিন অতি,　　　　সদাই চঞ্চল মতি,
বর্ণিতে না পারি রৈল ক্ষোভ।।
ব্রজের বৈষ্ণবগণ,　　　　আর যত প্রভুর গণ,
জানি মোরে শিশু অল্পমতি।
শোধি ভ্রম প্রমাদাদি,　　　　আস্বাদিবে নিরবধি,
সবার চরণে এ মিনতি।।

চরিত-সুধা।

পঞ্চম খন্ড

রসিকবাবুর পরিবর্ত্তন।

একদিন শ্রীযুক্ত রসিকলাল পাল মহাশয় বাবাজী মহাশয়ের দর্শনে আগমন করিলেন। বাবাজী মহাশয় উলঙ্গভাবে আপন মনে বসিয়া আছেন। রসিকবাবু প্রণাম করিবামাত্র ইনি একটু চমকিতভাবে প্রতি-প্রণাম করিয়া উঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাবা! তোমার নাম কি?"

রসিক। আজ্ঞে! আমার নাম রসিকলাল পাল।

রসিক-বাবুর মুখে খুব বড় গোঁফ রহিয়াছে। গোঁফ জোড়াটির উপরে বাবাজী মহাশয় পুনঃ পুনঃ লক্ষ্য করিতেছেন, আর কি যেন ভাবিতেছেন। ক্ষণকাল পরে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমরা কোন জাতি?"

রসিক। আজ্ঞে! আমরা সুবর্ণ বণিক।

"সুবর্ণ বণিক" শব্দটি শুনিবামাত্র বাবাজী মহাশয় ভাবে গদ গদ হইয়া গেলেন। চক্ষু দুইটি রক্তবর্ণ এবং ঢুলু ঢুলু হইল; সাশ্রুগদ-গদ-কণ্ঠে বলিলেন,— "বাবা! কি জাতি বলিলে?"

রসিক। আজ্ঞে! সুবর্ণ বণিক।

বাবাজী। তোমরা সুবর্ণ বণিক? না বাবা, আমার বিশ্বাস হইতেছে না। যে

সুবর্ণ বণিকের কুলে শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই কুলে জন্মিয়া অদ্যাপি যখন তোমার মুখে গোঁফ রহিয়াছে এবং গলায় মালা নাই, তখন আমার বিশ্বাস—কুলে কোনওরূপ গোলমাল আছে। বণিক-কুলের নাথ—নিত্যানন্দরায়। **বণিক-কুলপাবন** নিতাইয়ের একটী নাম। সুবর্ণ বণিক কুলের প্রতি নিতাইয়ের যেরূপ কৃপা, অন্য কোনও জাতির প্রতি সেরূপ কৃপা হয় নাই—হইবার প্রত্যাশাও কম।

রসিকবাবু পরম ভক্ত; বাবাজী মহাশয়ের কথা শুনিয়া যেন বড়ই লজ্জিত এবং সুখী হইলেন। কারণ এ জাতীয় সরল ভাষায় উচিত কথা এযাবৎ তিনি আর কখনও শুনেন নাই। তাই অবনত মস্তকে কথাটী যেন প্রাণের সহিত গ্রহণ করিয়া করযোড়ে বলিলেন,—"আজ্ঞে! আমার মনে একটী প্রশ্ন উদয় হইয়াছে, যদি আদেশ হয় ত নিবেদন করি।"

বাবাজী। স্বচ্ছন্দে বল বাবা, কোনই সঙ্কোচ নাই।

রসিক। আজ্ঞে! বাহ্যিক বেশ-ভূষার আবশ্যকতা কি? যাজন ত অন্তরে!

বাবাজী। বাবা। পরমার্থ জগতের কথা শেষে বলিব; আগে বাহ্যিক বেশের আবশ্যকতা আছে কি না, তোমার নিজের প্রতি একটু লক্ষ্য করিয়া দেখ দেখি! কাপড় পরার উদ্দেশ্য লজ্জানিবারণ; তবে দশটাকা দামের ভাল ধোলাই ধুতিখানা না পরিয়া ছয়হাতি মোটা মার্কিন পরা হয় না কেন? বহু মূল্যের জামা-জুতা পরার আবশ্যকতা কি? ভদ্র-অভদ্র, ধনী-দরিদ্র তো অন্তরের কথা—বাহ্যিক বেশের আবশ্যকতা কি? ব্যারিষ্টার বা উকিলবাবু হাইকোর্টে যাইবার সময় যদি তদুচিত বেশ-ভূষা পরিধান না করেন, তবে সেই সভার সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন কি? এখানেও যেমন বাহ্যিক বেশের দ্বারা সভ্য-শ্রেণীভুক্ত হওয়া যায়, তদ্রূপ পরমার্থ জগতেও গুণের বিচার পশ্চাৎ; সর্ব্বাগ্রে বেশের বিচার চাই। অর্থাৎ বেশের দ্বারা তত্তৎশ্রেণীর

পরিচয় পাওয়া যায়। এইগুলি সমস্ত বাহিক প্রয়োজন; আভ্যন্তরিক কথা হইতেছে অন্যরূপ। ধর, গঙ্গাস্নান করিয়া পবিত্র বসন-ভূষণ পরিধান পূর্ব্বক কোনও দেবদর্শনে গমন কালে যেরূপ মনোবৃত্তি হয়, কলের জলে স্নান করিয়া হ্যাট-কোট, পেন্টালুন, জুতা, টুপী প্রভৃতি পরিধান পূর্ব্বক হাতে ছড়ি, মুখে চুরুট এবং নানারূপ এসেন্স বা আতরে সুবাসিত হইয়া থিয়েটার দেখিতে যাইবার সময় মনোবৃত্তি ঠিক সেইরূপ হয় কি?

রসিক। এ ত কখনই হইতে পারে না। বাস্তবিকই এতদিনে বুঝিলাম যে, বেশ-ভূষার সঙ্গে মনোবৃত্তির বিশেষ সম্বন্ধ আছে। আচ্ছা, বেশের সঙ্গে যেমন সম্বন্ধ আছে, সেইরূপ আহারের সহিতও কি সম্বন্ধ আছে?

বাবাজী। বেশ-ভূষা অপেক্ষা আহারের সহিত মনোবৃত্তির বিশেষ নিকট সম্বন্ধ। আহারীয় দ্রব্যের প্রতি গ্রাসে গ্রাসে তিনটি গুণ, শাস্ত্র বলিয়াছেন,—"তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুধপায়োঽনুঘাসম্।" অর্থাৎ আহারীয় বস্তু দ্বারা প্রথম তুষ্টি তৎপরে পুষ্টি এবং ক্রমে ক্ষুন্নিবৃত্তি হইয়া থাকে। যেমন স্বাভাবিক তৃপ্তি এবং পুষ্টি সাধনের পর তবে অভাব দূর হইয়া থাকে, পরমার্থ ভাবটিও ঠিক সেইরূপ। ভগবদ্গীতায় ভগবান অর্জ্জুনকে আহারের সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিকরূপে ত্রিবিধ ভেদ বলিয়াছেন। সাত্ত্বিক আহারে সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। দ্রব্যগুণ কোথায় যাইবে? নিশ্চয়ই তাহার ক্রিয়া হইবে।

রসিক-বাবু প্রভৃতি অন্যান্য যে সমস্ত ভক্তবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন, সকলেই বাবাজী মহাশয়ের মুখে সরল ভাষায় নানারূপ তত্ত্বকথা শ্রবণে পরমানন্দ লাভ করিয়া ইহার আদেশক্রমে স্বীয় স্বীয় বাসায় প্রস্থান করিলেন। ইনি যথাসময়ে স্নান আহ্নিকাদি শেষ করতঃ মহাপ্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক কিঞ্চিত বিশ্রাম করিলেন।

এই ঘটনার দুই তিন দিন পরে একদিন রসিকবাবু একটী চাকর সঙ্গে

লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দূর হইতে বাবাজী মহাশয়কে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। অপূর্ব্ব পরিবর্তন! রসিকবাবু যেন আর সে রসিকবাবু নাই; অত বড় সখের গোঁফ কামাইয়া রাজসিক বেশ ভূষাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক বেশ সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন হইয়াছেন। বাবাজী মহাশয় উহার অবস্থার পরিবর্তন দর্শনে পরম প্রীতিলাভ করিয়া নিজ সন্নিকটে বসাইয়া নানারূপ উপদেশ বাক্য দ্বারা উহার মানসিক সন্দেহ ভঞ্জন করিতে লাগিলেন। রসিকবাবু কি যেন কি বলিবার জন্য ইচ্ছুক হইয়াছেন, কিন্তু সাহস পাইতেছেন না দেখিয়া বাবাজী মহাশয় বলিলেন,—"তুমি কি বলিতে চাহিতেছ বল। সঙ্কোচতার কোন প্রয়োজন নাই।" তখন রসিকবাবু সাহস পাইয়া বলিতে লাগিলেন,—"আজ্ঞে ! আমি আর কি বলিব? আপনি অন্তর্য্যামী, আমার অন্তরের ভাব সমস্তই বুঝিতে পারিয়াছেন। আমার বড়ই অভিলাষ যে, একবার সগণে এ অধমের বাড়ীতে পদার্পণ করিয়া আমার পশুজীবন ধন্য করেন।"

বাবাজী। আচ্ছা, তোমার যে দিন ইচ্ছা হয় লইয়া যাইবে।

রসিক। আজ্ঞে আদেশ হয় তো অদ্য গাড়ীর ব্যবস্থা করা যাউক।

বাবাজী। আজ না হইয়া কাল সকালে হইলেই ভাল হয় না কি?

রসিকবাবু "আপনার যাহা ইচ্ছা" বলিয়া সেদিন চলিয়া গেলেন। পর দিবস প্রাতঃকালে সগণে বাবাজী মহাশয়কে লইয়া গেলেন। যথাসময়ে স্নান আহ্নিকাদি শেষ করিয়া ইহারা নাম কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। বহুক্ষণ কীর্ত্তনের পর রসিকবাবুর বিশেষ আগ্রহে বাবাজী মহাশয় উঁহাকে মন্ত্র প্রদানপূর্ব্বক উঁহার জন্ম-জন্মান্তরীণ অশেষ পাপ তাপ দূর করতঃ সত্ত্বগুণ সম্পন্ন করিলেন। রসিকবাবুর একটী ভয়ানক ব্যাধি ছিল, প্রস্রাবের সঙ্গে রক্ত পড়িত। অনেকরকম চিকিৎসাদি করাইয়াও কোন ফল হয় নাই। শুনিবামাত্র বাবাজী মহাশয় অযাচিত ভাবে উঁহাকে আলিঙ্গন দানে কৃতার্থ করিয়া বলিলেন,—

"যাও বাবা! আজ হইতে তুমি নীরোগ ও নিশ্চিন্ত হইলে। তোমার যাবতীয় রোগ-শোক, পাপ-তাপ আমি গ্রহণ করিলাম। তোমরা নিতাইর গণ; নির্ম্মল ভাবে নিতাইচাঁদকে ডাক—মনুষ্যজীবন ধন্য হইবে।" রসিকবাবু বাবাজী মহাশয়ের এইরূপ অমৃত মধুর বাক্যে এবং সুশীতল বক্ষের স্পর্শে যেন কোন অপ্রাকৃত আনন্দময় রাজ্যে প্রবেশ করতঃ পরম শান্তি লাভ করিলেন। বলিতে কি, সেইদিন হইতে উঁহার সেই কঠিন অসাধ্য ব্যাধি দূর হইয়া গেল।

বাবাজী মহাশয়ের আদেশে রসিকবাবু শ্রীযুক্ত গোবিন্দানন্দকে সঙ্গে লইয়া একবার শ্রীধাম নবদ্বীপ দর্শনে গমন করিলেন। তথায় গিয়া পরম গুরুদেব শ্রীল শ্রীযুক্ত গৌরহরিদাস মহান্ত মহারাজের দর্শন পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ বাবাজী মহাশয় শ্রীধাম পুরীর শ্রীরাধারমণ কুঞ্জ মঠস্থ শ্রীরাধারাধারমণ বিগ্রহদ্বয় নবদ্বীপ লইয়া আসিয়াছিলেন। রসিকবাবু এবং গোবিন্দানন্দ কয়েক দিন শ্রীধামে থাকিয়া কলিকাতা যাইবার প্রস্তাব করায় জানি না বৃদ্ধ বাবাজী মহারাজের মনে কি ভাবের উদয় হইল, বিগ্রহদ্বয় পুরী পাঠাইবার অভিপ্রায়ে উঁহাদের সঙ্গে কলিকাতায় বাবাজী মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। উঁহারা বাবাজী মহাশয়ের কাছে বিগ্রহদ্বয় আনিয়া দিলে, ইনি কেদারবাবুর বাগানেই বিগ্রহ রাখিয়া সেবাদি করাইতে লাগিলেন।

এইরূপে কয়েক দিন যায়, একদিন রসিকবাবু সগণে বাবাজী মহাশয়কে উঁহার কাশীপুরস্থ বাগানে কিছুদিন থাকিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করায়, বাবাজী মহাশয় সগণে কেদারবাবুর বাগান পরিত্যাগ-পূর্ব্বক রসিকবাবুর কাশীপুরস্থ বাগানে গমন করিলেন। বাগানটী অতীব মনোরম। সকলেই পরম প্রীত হইয়া স্বাধীনভাবে তথায় বাস করিতে লাগিলেন। বাবাজী মহাশয় শ্রীরাধা-রাধারমণ বিগ্রহদ্বয়কে কয়েক দিন নিজ নিকটে রাখিয়া যথাসময়ে উপযুক্ত সঙ্গী দ্বারা শ্রীধাম পুরী পাঠাইয়া দিলেন।

অযাচিত-কৃপা।

এই ঘটনাটী সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বিহারী দাস বাবাজী মহাশয় নিজে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই এই স্থানে উদ্ধৃত করা হইল। তিনি লিখিয়াছেন—

"আমি নিতান্ত অজ্ঞ। পরম করুণাময় বাঞ্ছাকল্পতরু **শ্রীশ্রীগুরুদেবের অযাচিত-কৃপার** কথা কি আর বলিব? এমন কোন ভাষা নাই—যাহার দ্বারা আমার প্রাণের কথা প্রকাশ করিতে পারি। তবে আমা হেন নরাধমের প্রতি তাঁহার যে অলৌকিক কৃপা, যেতে মতে তাহার কিঞ্চিৎ প্রকাশ করিবার অভিপ্রায়ে আনুষঙ্গিক নিজের জীবনের কয়েকটী কথা লিখিতে বাধ্য হইলাম।

আমার যখন বয়স ১৭।১৮ বৎসর, তখন হইতে অমি কলিকাতা ৯০ নং সারপেন্‌টাইন লেনস্থ শ্রীশ্রীমৎ ভোলানাথ জ্ঞানানন্দ মহাশয়ের নিকট যাতায়াত করি। প্রায় ৭।৮ বৎসর কাল তাঁহার নিকট হইতে অনেক উপদেশাদি শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। তিনি একজন ভাল বক্তা, অনেক সভা সমিতিতে বক্তৃতা করিতেন। তাঁহার এমন অপূর্ব্ব কবিত্বশক্তি ছিল যে, মুখে মুখে সুন্দর পদরচনা করিতে পারিতেন। তিনি নিজেও বেশ গায়ক ছিলেন। তিনি প্রায় যখন যেখানে যাইতেন, কৃপা করিয়া আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন। আমার মাথায় তখন লম্বা চুল ছিল। থান কাপড় পরা, গায়ে সাদা চাদর এবং হাতে একতারা। এইরূপ ভাবে তাঁহার সঙ্গে সভা সমিতিতে গান কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতাম। এইরূপ করিয়া পরমানন্দে দিন কাটাইতেছিলাম। তীর্থাদি পর্য্যটনে বড়ই ঝোঁক ছিল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দোলযাত্রা উপলক্ষে আমার মাতা ঠাকুরাণীর সঙ্গে যখন শ্রীধাম পুরী যাই তখন একবার ভাগ্যক্রমে সগণে শ্রীশ্রীমদ্ বাবাজী মহাশয়ের শ্রীচরণ দর্শন করিয়াছিলাম ও শ্রীশ্রীজগন্নাথের জগমোহনে ইহার সুমধুর কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়াছিলাম; কিন্তু তখন আমার

ভাগ্যে ইঁহার কৃপা লাভ ঘটে নাই। তাহার পর শ্রীধাম বৃন্দাবন প্রভৃতি নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতাম। প্রায় অনেক সময়ই কাশীধামে যাইতাম। তখন কাশীধামে শ্রীশ্রীমৎ ভাস্করানন্দ স্বামী শ্রীশ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি অনেক সাধু মহাত্মাগণ প্রকট ছিলেন।

আমি অনেক সময় তাঁহাদের নিকট বসিতাম এবং নানারূপ উপদেশাদি শ্রবণ করিতাম তখন অমার সাধু দেখিবার ভারি ঝোঁক ছিল। অনেক সময় পরিব্রাজক শ্রীশ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ স্বামীজীর যোগাশ্রমে থাকিতাম। স্বামীজী আমাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। এইরকম ভাবে কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল। দৈবাৎ শ্রীযুক্ত ভোলানাথ জ্ঞানানন্দ মহাশয় সমাধিলাভ করিলেন। তখন আমার যে কি অবস্থা, তাহা যাঁহারা জীবনে কাহারও আনুগত্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন। তখন ত্রিজগৎ যেন আমার নিকট শূন্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল। খাইতে শুইতে সর্ব্বদা তাঁহার সেই মধুময় সঙ্গের কথা স্মরণ করিয়া চোখের জলে আমার বুক ভাসিয়া যাইত।

আমি তখন কলিকাতা বহুবাজার সাঁকারিটোলায় একটী বাড়ীতে বাস করিতাম। সেই বাড়ীতে শ্রীগোবর্দ্ধন দাস নামক একটী বালক তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও মাতার সহিত বাস করিত। এই বালকটী সচ্চরিত্র এবং হরিভক্ত। গোবর্দ্ধনদাস কিছু দিন পূর্ব্ব হইতে শ্রীযুক্ত নবদ্বীপদাদার কৃপায় শ্রীশ্রীমদ্ বাবাজী মহাশয়ের কৃপাপাত্র হইয়াছিল। অবকাশমত আমাকে পাইলেই বালকটী কেবল ভক্তগণের কথা কহিত, কেবল শ্রীশ্রীনিতাইগৌরাঙ্গ ও শ্রীরাধাগোবিন্দের তত্ত্বকথাই শুনাইত এবং **ভক্তিপথই** যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট, ইহাই অনেক রকম করিয়া আমাকে বুঝাইত। আমার কিন্তু ও সকল কথা বিশেষ ভাল লাগিত না। তবে শুনিতে হয়, তাই শুনিতাম মাত্র। তখন সদাসর্ব্বদা জ্ঞানানন্দ মহাশয়ের স্বরচিত এবং ভাবুক সাধক ভক্তগণের রচিত নানা রকম পদ গান করিতাম।

অনেক সময় আমি গোবর্দ্ধনদাসের সহিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে নানারূপ তর্ক করিতাম এবং কেহই পরাস্ত মানিতাম না। এইরূপ ভাবে কিছু দিন যায়, একদিন আবার পূর্ব্ববৎ তর্ক আরম্ভ হইল। জানি না কাহার শক্তিতে সেদিন বালক আমাকে কাঁদাইয়া ফেলিল। তখন আমি কাতরভাবে গদগদকণ্ঠে বলিলাম—"ভাই! এসকল তত্ত্ব আমি কেমন করিয়া বুঝিতে পারিব?"

গোবর্দ্ধন। ভক্তি-গ্রন্থ পড়, তাহা হইলে এই সকল তত্ত্ব ক্রমে বুঝিতে পারিবে।

আমি। এই সকল গ্রন্থ কোথায় পাওয়া যায়?

গোবর্দ্ধন। সমস্তই বহরমপুরে পাওয়া যায়। যে সকল গ্রন্থ তোমার বিশেষ প্রয়োজনীয়, তাহা আমি শীঘ্র আনাইয়া দিব।

আমি। ভাই! যত সত্বর হয়। আমাকে গ্রন্থগুলি আনাইয়া দিতে হইবে।

গোবর্দ্ধন। আচ্ছা, আপাততঃ আমার নিকট যে সকল গ্রন্থ আছে, সেই সকল গ্রন্থ পড়। আবার এমন এক মহাপুরুষকে তোমায় দেখাইব যে, তুমি তাঁহাকে দেখিলে আর ভুলিতে পারিবে না।

আমি। তিনি কোথায় থাকেন?

গোবর্দ্ধন। উপস্থিত তিনি শ্রীধাম পুরীতে আছেন। যখন কলিকাতায় আসিবেন তখন তোমাকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিব। তাহা হইলে তোমার সকল আশা মিটিয়া যাইবে।

এই কথা শুনা অবধি আমার মন যেন কি রকম হইয়া গেল। প্রায়ই ঐ মহাপুরুষের কথা গোবর্দ্ধনকে জিজ্ঞাসা করি। গোবর্দ্ধনদাস বেশ সংকীর্ত্তন করিতে পারে। যখন যেখানে সংকীর্ত্তন হয়, সেইখানে আমাকে কৃপা করিয়া সঙ্গে লইয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে কীর্ত্তন করিতে বলে। আমিও তাহার সহিত সংকীর্ত্তনে যোগ দিয়া থাকি।

এইরূপে কিছুদিন যায়, একদিন গোবর্দ্ধনদাস আমায় বলিল,—"বিহারীদাদা! বাবাজী মহাশয় শ্রীধাম পুরী হইতে বরাহনগরে শ্রীযুক্ত কেদার কর্ম্মকারের বাগানে আসিয়াছেন। তুমি তাঁহাকে দেখিতে যাইবে কি?"

আমি। বেশ কথা ভাই! তবে এই রবিবার দিন যাওয়া যাইবে।

গোবর্দ্ধন। উপস্থিত তাঁহার ভাবটা পাগলের মত।

আমি। মহাত্মারা কখন কি অবস্থায় থাকেন, তাহা কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই।

রবিবার দিন বাবাজী মহাশয়ের দর্শন মানসে রওনা হইয়া বেলা আন্দাজ বারটার সময় আমরা দুইজন বরাহনগরে গিয়া শ্রীযুক্ত কামাখ্যা দাস বাবাজী মহাশয়ের বাড়ীতে পৌঁছিলাম। সে সময় সেখানে পঙ্গত হইতেছিল। পৌঁছিবামাত্রই তাঁহারা আমাদিগকে প্রসাদ পাইতে আদেশ করিলেন। সেখানে স্থান বেশী না থাকায় একজন ভক্ত আমার হাত ধরিয়া একেবারে আমাকে তাঁহার পাতায় বসাইলেন। যেন কত দিনের পরিচয়! 'এস ভাই এস" বলিয়া অন্ন-প্রসাদের সহিত ডাল তরকারী মাখিয়া একগ্রাস আমার মুখে তুলিয়া দিলেন। আমি ইহার পূর্ব্বে কখন কাহারও পাতে বা একসঙ্গে বসিয়া এইরূপ ভাবে প্রসাদ পাই নাই; কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সেদিন আমার মনে কোনরূপ বিকার আসিল না। জানি না, সৎসঙ্গের কি গুণ এবং বৈষ্ণব অধরামৃতের কি শক্তি!

গোবর্দ্ধনদাসও ঐরূপ একজনের পাতায় বসিয়া গেল। এইরূপে পরমানন্দে প্রসাদ পাইয়া একটু বিশ্রাম করতঃ সেইখানেই ছাতা, চাদর রাখিয়া দুই জনে কেদারবাবুর বাগানে বাবাজী মহাশয়ের শ্রীচরণ দর্শন করিতে গেলাম। বাগানের মাঝখানে পুষ্করিণী আর চারিদিকে গাছপালা। বাগানের মধ্যে উত্তরদিকে একটী কোঠার মধ্যে বাবাজী মহাশয় তখন দাঁড়াইয়া আছেন এবং চারিদিকে অনেক

ভক্তগণ রহিয়াছেন। আমরা দুইজনে ভিতরে যাইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্ব্বক একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলাম। বাবাজী মহাশয় যেন আনমনা ভাবে অবস্থান করিতেছেন। চক্ষু ঢুলু ঢুলু রক্তবর্ণ—কত লোককে কত কি বলিতেছেন, তাহার ঠিক নাই। কিছুক্ষণ পরে শ্রীযুক্ত বটুদাদাকে ও শ্রীযুক্ত গোবিন্দদাদাকে বলিলেন,—"দেখ, তোমরা এই মুহূর্তে এস্থান হইতে শ্রীধাম বৃন্দাবন রওনা হও। সময় মত আবার দেখা হইবে।" এই সকল ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া আমার মনে অত্যন্ত ভয় হইল এবং বুঝিলাম যে, এসময় আর কোন কথাবার্ত্তা হইবে না। সুতরাং দুইজনে শ্রীযুক্ত কামাখ্যা দাস বাবাজী মহাশয়ের বাটী হইতে ছাতা চাদর লইয়া সেখানকার সকলকে দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক বাহির হইয়া বরাহনগর বাজারের মোড়ে ঠিকা গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। এমন সময় শ্রীযুক্ত গোবিন্দদাদা, বটুদাদা ও কুঞ্জবাবু ইঁহারাও গাড়ী খুঁজিতেছিলেন। ভালই হইল—আমরা পাঁচজনে একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া কলকাতা অভিমুখে রওনা হইলাম। যথাসময়ে গাড়ী হইতে নামিয়া আমরা আমাদের বাসায় গেলাম। শ্রীযুক্ত গোবিন্দদাদা এবং বটুদাদা কুঞ্জবাবুর সঙ্গে তাঁহার বাড়ীতে গেলেন।

ইহার কয়েক দিন পরে গোবর্দ্ধনদাস আবার আমায় বলিল—"বিহারী দাদা! বাবাজী মহাশয় এখন কাশীপুরে শ্রীযুক্ত রসিকলাল পালের বাগানে আছেন। দেখিতে যাইবে কি?

আমি। যাইব বই কি ভাই? সেদিন যাইয়া মনের আশা মিটে নাই বা তাঁহার শ্রীমুখের কোনও উপদেশ শ্রবণ ভাগ্যে ঘটে নাই। আগামী শনিবার বৈকালে যাওয়া যাইবে।

তাহাই হইল। শনিবার বৈকালে আমরা দুইজনে পদব্রজে রওনা হইয়া রাত্রি প্রায় দশটার সময় উক্ত কাশীপুরস্থ বাগানে পৌঁছিলাম। বাবাজী মহাশয়

তাহার কিছুক্ষণ পূর্ব্বে মহাপ্রসাদ পাইয়া মেজের উপর বিছানায় বসিয়া আছেন। আমরা উভয়ে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলে ইনি গোবর্দ্ধন দাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোরা বাড়ী হইতে প্রসাদ পেয়ে এসেছিস্?"

গোবর্দ্ধন। আজ্ঞে, হ্যাঁ।

বাবাজী মহাশয় কিন্তু তবুও ছাড়িলেন না। কত স্নেহভরে উভয়ের পেট টিপিয়া দেখিয়া বলিলেন,—"যা, কিছু প্রসাদ খেয়ে আয়।" আমরা প্রসাদ পাইতে গিয়া দেখি—তখন ইঁহার সঙ্গিগণের প্রসাদ পাওয়া শেষ হইয়া গিয়াছে। কিছু প্রসাদ হাঁড়ীতে ভিজান ছিল, তাহাই আমরা কিছু কিছু পাইলাম। প্রসাদ পাইয়া পুষ্করিণীতে মুখ হাত ধুইতে গেলাম। নূতন জায়গা, তাহাতে রাত্রিকাল—সঙ্গে কোনরূপ আলো ছিল না। সিঁড়ির দুই পার্শ্বে যে ভিত গাঁথা থাকে, তাহার উপর শেওলা পড়িয়াছিল। যেমন আমি পা দিয়াছি, অমনি পা পিছ্‌লাইয়া একেবারে পুষ্করিণীর মধ্যে অগাধ জলে পড়িয়া গেলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! কে যেন আমাকে অলক্ষিত ভাবে জলের উপর ভাসাইয়া তুলিয়া দিল! ইহার পূর্ব্বে আমার সাঁতার জানা ছিল না। তখন আমার প্রাণে কে যেন বুঝাইয়া দিল যে, এসকল একমাত্র বাবাজী মহাশয়ের কৃপা ভিন্ন আর কিছুই নয়। তাহার পর জল হইতে উঠিয়া উড়ানীখানি বাতাসে শুকাইয়া তাহা পরিধান পূর্ব্বক কাপড়খানি এক জায়গায় শুকাইতে দিলাম এবং ঐ অবস্থাতেই যে স্থানে বাবাজী মহাশয় শয়ন করিয়া আছেন, আস্তে আস্তে সেই স্থানে আসিয়া তাঁহার চরণতলে শয়ন করিলাম। গোবর্দ্ধনদাস আমার ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া **বাবাজী মহাশয়ের কৃপার** জয় দিতে দিতে আসিয়া সেই ঘরের মধ্যে আমার পার্শ্বেই শয়ন করিল। রাত্রি প্রভাত হইলে আমরা প্রাতঃক্রিয়া সমাপনপূর্ব্বক বাবাজী মহাশয়ের নিকটে আসিয়া দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক সেইখানে বসিলাম। কিছুক্ষণ পরে বাবাজী মহাশয় আমাকে লক্ষ্য করিয়া গোবর্দ্ধনদাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ ছেলেটি কে?"

গোবর্দ্ধন। আজ্ঞে! আমরা এক বাড়ীতে বাস করি—একসঙ্গে সর্ব্বদা বেড়াই। ইনি আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিবার জন্য আসিয়াছেন।

বাবাজী মহাশয় তখন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার নাম কি?"

আমি। আজ্ঞে! আমার নাম বিহারীলাল দাস।

বাবাজী। তোমার সংসারে কে আছেন?

আমি। আজ্ঞে! আমার মা ও স্ত্রী আছেন।

বাবাজী। তোমার দীক্ষা হইয়াছে?

আমি। আজ্ঞে! হ্যাঁ।

বাবাজী। তুমি এখানে আসিয়াছ কেন?

আমি। আজ্ঞে! আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিবার জন্য।

বাবাজী। তোমার হাতে এত মাদুলী কেন?

আমি। আজ্ঞে! সদাসর্ব্বদা আমার অনেক রকম অসুখ-বিসুখ হয়, সেই জন্য আমার মাতাঠাকুরাণী অনেক রকম ঠাকুরের ঔষধ আনাইয়া দিয়াছেন।

বাবাজী। অমি যদি তোমার পাপ-তাপ, অসুখ-বিসুখ সমস্ত লই, তাহা হইলে তুমি তোমার হাতের তাগা মাদুলী সমস্ত খুলিয়া ফেলিয়া দিতে পার কি?

আমি আর কোন কথা বলিতে পারিলাম না। মনপ্রাণ যেন কেমন হইয়া গেল। চোখে জল আসিল। অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিলাম,—"আজ্ঞে ! আপনার যাহা ইচ্ছা তাহাই করুন। আজ হইতে আমি আপনার হইলাম।"

বাবাজী মহাশয় এই কথা শুনিয়া নিজ হস্তে আমার হাতের তাগার সহিত কতগুলি সোনার মাদুলী এবং কোমরের ঘুন্‌শী সমস্ত ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন এবং একজন সঙ্গীকে সেইগুলি পুষ্করিণীতে ফেলিয়া দিতে আদেশ করিলেন। মাদুলীর সহিত একটী ভাল রুদ্রাক্ষ ছিল। তাহা রাখিয়া দিলেন। পূর্ব্ব হইতে

কতগুলি রুদ্রাক্ষ একটী সূতায় গাঁথিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা আনাইয়া তাহার মধ্যে আমার হাতের রুদ্রাক্ষটী গাঁথিয়া নিজ হস্তে পরিলেন। লীলাময়ের লীলা সকলই বিচিত্র!

বাবাজী মহাশয়ের মাথার বালিসের নীচে কতকগুলি নূতন তুলসীর মালা ছিল। তাহা হইতে মাঝারি রকমের দুইকণ্ঠী মালা প্রসাদী করিয়া নিজ হস্তে আমার গলায় পরাইয়া আমাকে আলিঙ্গন করিলেন; কিন্তু এসময় মন্ত্রাদি কিছুই দিলেন না। আমিও কিছু বলিতে সাহস করিলাম না। কেন যে মন্ত্রাদি দিলেন না, তাহা অন্তর্য্যামী গুরুদেবই জানেন। ইনি বলিতে লাগিলেন,— "আজ হইতে তোর সকল পাপ-তাপ অসুখ-বিসুখ আমি নিলাম। তুই আমার নিতাই গৌর ভজ।'

যখন এই সমস্ত ঘটনা হইতেছিল, তখন সেই ঘরের এক পার্শ্বে শ্রীযুক্ত রামদাদা স্নান করিয়া তিলক করিতেছিলেন। বাবাজী মহাশয় বলিয়া উঠিলেন,— "রাম! তুমি একবার ইহাকে আলিঙ্গন কর।" রামদাদা বাবাজী মহাশয়ের আদেশানুযায়ী আমাকে বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক চিরজীবনের মত কনিষ্ঠ ভ্রাতারূপে অঙ্গীকার করিলেন।

কয়েক বৎসর যায়, জানি না কাহার আকর্ষণে সেইবার রথযাত্রায় পুরী যাইবার জন্য আমার মন বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ইহার সাত আটমাস পূর্ব্বে আমার স্ত্রী পরলোক গমন করিয়াছেন; সুতরাং তখন মনও খুব উদাস। সঙ্গে আমার মাতাঠাকুরাণী ও আন্দাজ ৩ $\frac{১}{২}$ বৎসরের একটী কন্যা, ইহাদিগকে লইয়া অমি শ্রীধাম পুরী রওনা হইলাম। যথাসময়ে পুরী ঝাঁজপীটা মঠে পৌঁছিয়া বাবাজী মহাশয়ের শ্রীচরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবামাত্র তিনি হাসিমুখে আমাদের সর্ব্বাঙ্গীনকুশল জিজ্ঞাস । করতঃ কুণ্ডাইবেণ্টসাহিতে আমাদের থাকিবার জন্য একটী বাসা বন্দোবস্ত করিয়া একজন লোক সঙ্গে আমাদিগকে বাসায় পাঠাইয়া

দিলেন। আমরা পরমানন্দে সমুদ্র স্নান এবং দর্শন করিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। মঠেই প্রসাদাদি পাই।

দেখিতে দেখিতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের নবযৌবন কাল আসিয়া উপস্থিত হইল। ইচ্ছাময়ের কি ইচ্ছা জানি না, সেই দিন সকাল বেলা হঠাৎ বাবাজী মহাশয় সকলকে কীর্ত্তন করিতে বলিলে, সকলেই হৃষ্টচিত্তে নাম কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। খুব মাতামাতি কীর্ত্তন হইতেছে, কাহারও বাহ্যস্মৃতি নাই। ভগবৎ ইচ্ছায় তখন ভয়ানক বৃষ্টি উপস্থিত হইল। আমরা মনে করিলাম—বুঝি সংকীর্ত্তন বন্ধ হইবে। শ্রীগুরুদেবের কৃপায় কীর্ত্তন বন্ধ হওয়া ত দূরের কথা, পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণতর আনন্দের সহিত নাম চলিতে লাগিল। সেই সময় বাবাজী মহাশয় অনেককে মন্ত্র দিতে লাগিলেন। এই ব্যাপার দর্শন করিয়া আমি মনে মনে ভাবিতেছি,—"প্রভো! একমাত্র আমিই আপনার কৃপালাভে বঞ্চিত হইব? এখনও কি আমার সময় হয় নাই?" ভাবিতে ভাবিতেই অন্তর্যামী প্রভু আমার মনোভাব বুঝিতে পারিলেন। ইঙ্গিতে আমাকে আকর্ষণ করিয়া আলিঙ্গনদানে আমার কোটি কোটি জন্মার্জ্জিত পাপ-তাপ দূর করতঃ কর্ণে মন্ত্র প্রদান করিলেন। সুশীতল বক্ষঃ স্পর্শে আমার সকল জ্বালা জুড়াইয়া গেল। আমি যেন অপ্রাকৃত শান্তি-সাগরে ডুবিয়া গেলাম। মনে মনে শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে আত্ম-সমর্পণ করিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতে লাগিলাম। আমাকে কৃপা করিবার পর সেদিন আর কাহারও মন্ত্র হইল না। যথাসময়ে শ্রীগুরুদেব এবং বৈষ্ণবগণের অধরামৃত পাইয়া বাসায় গমন করিলাম।

রাত্রে শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ দর্শন মানসে গমন করিয়া দেখি—ইনি একখানি চাদরে আপাদ মস্তক আচ্ছাদন করিয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। আমি ধীরে ধীরে গিয়া শ্রীচরণ সেবা করিতে লাগিলাম। কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতেই আমার মনে কতগুলি সন্দেহমূলক প্রশ্ন উদিত হইয়াছে। সে দিন বাসা হইতে

মনে মনে সংকল্প করিয়া বাহির হইলাম যে, আজ শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে সমস্ত মনের কথা নিবেদন করিয়া, ইঁহার কৃপায় মনের সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া লইব। যদিও সে সময় অন্য কেহই নাই; কিন্তু তিনি বিশ্রাম করিতেছেন। পাছে কোনওরূপ কষ্ট হয় ভাবিয়া আমি আর কিছুই বলিতে সাহস পাইতেছি না। **অযাচিত কৃপাকারী অন্তর্য্যামী প্রভু** আমার অন্তরের সমস্ত ভাব অবগত হইয়া, অর্দ্ধস্ফুট স্বরে ধীরে ধীরে এক একটী করিয়া আমার হৃদয়ের যাবতীয় সন্দেহ নিরসনপূর্ব্বক বলিলেন,—"দেখ, এ সমস্ত কথা একমাত্র নিজ অনুভবের জন্য। ইহা সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রকাশ করিলে ভজনপথের অনেক ব্যাঘাত জন্মে। সুতরাং কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না। আমি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ দুইখানি বক্ষে ধারণপূর্ব্বক শ্রীমুখনিঃসৃত বাক্যামৃত পান করিয়া জীবন ধন্য মনে করিতে লাগিলাম। মুখে কোন কথাই বলিতে পারিলাম না। কিছুক্ষণ এইভাবে কাটিয়া গেল—হঠাৎ চমক ভাঙ্গিল; দেখিলাম ইনি নিদ্রিত। তখন ধীরে ধীরে শ্রীচরণ দুইখানি বালিসের উপর রাখিয়া আমি স্থানান্তরে যাইয়া বিশ্রাম করিলাম। শ্রীগুরুদেবের কৃপায় তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া গুণ্ডিচামার্জ্জন, জল-কেলি, রথাগ্রে কীর্ত্তন নর্ত্তন প্রভৃতি দর্শন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা প্রত্যক্ষ অনুভব করতঃ পরমানন্দে দিন যাপন করিতে লাগিলাম। এই সময় কলেরা আরম্ভ হইতেছে দেখিয়া শ্রীগুরুদেব হোড়াপঞ্চমীর দিন অন্যান্য অনেক লোকের সহিত আমাদিগকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন।

আমা হেন নরাধমের প্রতি শ্রীশ্রীগুরুদেবের অপার করুণার কথা লিখিবার বা বুঝাইবার ভাষা নাই। যদি কেহ আমার অন্তঃকরণের ভাব অনুভব করিতে পারেন, তবে তিনি বুঝিবেন যে **অযাচিত-কৃপাকারী পরম দয়াল শ্রীগুরুদেবের** আমার প্রতি কিরূপ অদ্ভুত কৃপা। তিনি প্রতি মুহূর্ত্তে কৃপা করিতেছেন; কিন্তু

স্বতন্ত্রতা দোষে আপনার লব্ধ পরমার্থ ধনেবঞ্চিত হইলাম! এমন অমূল্য রত্ন হাতে পাইয়াও দুর্দ্দৈব দোষে চিনিতে বা যত্ন করিতে পারিলাম না। ধিক্ আমার জীবন!"

বিবিধ লীলা।

একদিন যোগেনবাবুর বিশেষ আগ্রহে বাবাজী মহাশয় সগণে রসিকবাবুর বাগান হইতে উঁহাদের সঙ্গে দর্জিপাড়ায় আগমন করিলেন।

যোগেনবাবুর বড় ছেলে যতীনের বড়ই পায়রা পুষিবার সখ্। নানা দেশদেশান্তর হইতে বহু মূল্য দিয়া পায়রা আনিয়া পুষিতেছেন। বাবাজী মহাশয় উপস্থিত হইয়াই বলিলেন—"যতীন! এ ঘরে কি আছে?"

যতীন। আজ্ঞে! নানাদেশের নানাপ্রকার পায়রা পোষা আছে।

বাবাজী। উহাদিগকে পোষা হয় কেন?

যতীন। আজ্ঞে! উহারা নানারূপ ভাবে নৃত্য করে—অনেক রকম ভাবে উড়ে। এই সমস্ত দেখিতে বড়ই সুখ হয় তাই রাখিয়াছি।

বাবাজী। বাবা! তোমার একটু দেখিবার সুখ হইবে বলিয়া স্বাধীন উন্মুক্ত জীবগুলিকে আবদ্ধ করিয়া রাখা কখনই উচিত নয়। তুমি খাইতে দিয়া যদি যত্ন করিতে পার তবে উহারা আপনা আপনিই তোমার বশতাপন্ন হইবে, বাঁধিয়া রাখা কেন? উহাদিগকে উন্মুক্ত করিয়া দাও।

যতীনবাবু এতক্ষণ নীরবে বাবাজী মহাশয়ের উপদেশপূর্ণ কথা শুনিতেছিলেন। "উন্মুক্ত করিয়া দাও" এই কথাটী শুনিবামাত্র যেন কেমন হইয়া গেলেন। প্রাণের মধ্যে নানারূপ আন্দোলন হইতে লাগিল। হৃদয়ের মধ্যে প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তির তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। বাসনার সংগ্রামে

শ্রীগুরুদেবের পরীক্ষার কথা একেবারে ভুল হইয়া গেল। কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় অবস্থায় নীরবে অধোবদনে দাঁড়াইয়া রহিলেন। যোগেনবাবুর মনে যদিও বাবাজী মহাশয়ের আজ্ঞা পালনের ইচ্ছা জন্মিয়াছিল; কিন্তু যতীনের মন কিছুতেই নরম হইল না। বাবাজী মহাশয়ও আর কোন কথা বলিলেন না। ক্ষণকাল পরে অন্যের অলক্ষিত ভাবে গিয়া উহাদের বাটীর ড্রেণ পরিষ্কার করিতে লাগিলেন। সঙ্গিগণ বাধা দিতে গিয়া অকৃতকার্য্য হইয়া বিষণ্ণ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। লীলাময়ের কি লীলা করিতে ইচ্ছা হইল তিনিই জানেন। অতঃপর সকলের অনুরোধে গঙ্গাস্নানে গমন করিলেন।

নিমতলা ঘাটে স্নান করিয়া প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র মোহন গোস্বামী মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্র মোহন গোস্বামী প্রভুপাদের ঠাকুরবাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ইঁহাকে দেখিয়াই প্রভুপাদ পরমাগ্রহের সহিত নাট মন্দিরে বসাইলেন। নাট মন্দিরের এক পার্শ্বে কয়েক যোড়া জুতা রহিয়াছে। ঐ জুতার উপর যেমন বাবাজী মহাশয়ের নজর পড়িল, অমনি বলিলেন—"প্রভু! আপনারা আচার্য্যসন্তান, আপনাদের বাড়ীতে চামড়ার জুতা কেন?" প্রভুপাদ একটু লজ্জিতের ন্যায় হইয়া বলিলেন,—"কি করা যায় বাবা! যস্মিন্ দেশে যদাচার', সহরে বাস করিতে হইলে জুতা ব্যবহার না করিলে কোন মতেই চলে না।" 'যস্মিন্ দেশে যদাচার' কথাটা বাবাজী মহাশয়ের মনে লাগিয়া গেল। নিজের বিশেষ কৃপাপাত্র জহরলাল বসুকে বলিলেন,—"দেখ জহর! 'যস্মিন্ দেশে যদাচার' জামা জুতা মোজা কাপড় ইত্যাদি চাই।" জহরবাবু পরমানন্দে গুরু-আজ্ঞা শিরোধারণপূর্ব্বক একযোড়া ভেলভেটের জুতা, একটা জামা এবং এক জোড়া মোজা আনিয়া দিলেন। গোস্বামী প্রভুর আগ্রহে অগত্যা সে বেলা প্রভুর বাড়ী প্রসাদ পাইতে স্বীকৃত হইলেন। প্রভুর সহিত নানারূপ তত্ত্ব কথার আলোচনা হইতেছে, এই সময় যোগেনবাবু এবং তাঁহার পুত্র

যতীনবাবু গাড়ী করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দূর হইতে বাবাজী মহাশয়ের দর্শনমাত্র উভয়ে কাতরভাবে আসিয়া ইঁহার চরণ ধারণ পূর্ব্বক সাশ্রুগদগদকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—"বাবা! আমাদের অপরাধ ক্ষমা করুন। আপনি বাড়ী ছাড়িয়া আসিবামাত্র যতীনের পুত্র শ্রীমান্ হরেকৃষ্ণের ভয়ানক জ্বর হইয়াছে। এমন কি চক্ষু মেলিবার পর্য্যন্ত ক্ষমতা নাই। আপনি না গেলে কোন মতেই চলিবে না।" বাবাজী মহাশয় বলিলেন,—"কি করি! প্রভুপাদ কৃপা করিয়া মহাপ্রসাদ দিতে চাহিয়াছেন; সুতরাং কৃপাদত্ত বস্তু পরিত্যাগ করা কোন মতেই সম্ভবে না। তোমাদের কোন ভয় নাই, নিতাই চাঁদের ইচ্ছায় ভাল হইয়া যাইবে। আমি গিয়া আর কি করিব।" যতীনবাবু কিছুতেই সে কথায় সম্মত হইলেন না। উঁহাদের ব্যাকুলতা দেখিয়া বাবাজী মহাশয় অগত্যা বৈকালে উঁহাদের বাড়ী যাইবার জন্য প্রতিশ্রুত হইলেন। ইঁহার আদেশে যতীনবাবু চলিয়া গেলেন। গাড়ী সঙ্গে করয়িা যোগনবাবু ইঁহার নিকট রহিলেন। যথাসময়ে মহাপ্রসাদাদি পাইয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রামান্তে বাবাজী মহাশয় যোগেনবাবুর গাড়ীতে চড়িয়া তাঁহাদের বাড়ীতে গমন করিলেন। বাড়ীতে উপস্থিত হইবামাত্র বাটীস্থ সকলে বিশেষ আগ্রহের সহিত ইঁহাকে একেবারে হরেকৃষ্ণের নিকট লইয়া গেলেন। ছেলেটী নিস্তব্ধভাবে শয়ন করিয়া আছে। যতীনবাবু বাবাজী মহাশয়ের চরণধূলি লইয়া উহার মস্তকে দিলেন। বাবাজী মহাশয় ছেলেটীর নিকট উপবেশনপূর্ব্বক বাম হস্ত উহার বুকের উপর দিয়া **জয় নিতাই** বলিয়া এক হুঙ্কার দিবামাত্র ছেলেটী চোখ মেলিয়া তাকাইল। সকলে দেখিয়া অবাক্। ভাল ভাল ডাক্তার ছয় সাত ঘণ্টায় যে জ্বরের কিছুই করিতে পারে নাই, ইঁহার একটী হুঙ্কারেই সেই জ্বর ছাড়িয়ে গেল। ছেলে চক্ষু মেলিয়া তাকাইল। বাবাজী মহাশয় একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"কি রে বাবা! খবর কি? ওঠ্" বলিয়া আলিঙ্গণ প্রদানপূর্ব্বক ছাড়িয়া দিবামাত্র ছেলেটী বেড়াইতে লাগিল।

জ্বর বা শরীরের কোনওরূপ গ্লানি কিছুমাত্র নাই। সুস্থশরীরে বেড়াইতে দেখিয়া যতীনবাবু বিস্মিতভাবে বলিলেন,—"আপনার আজ্ঞা তখন আমি নিজ বুদ্ধির দোষে পালন করিতে পারি নাই; এখন আদেশ করেন ত সমস্ত পায়রা ছাড়িয়া দিই?" বাবাজী মহাশয় একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"নিতাই চাঁদের ইচ্ছায় সম্প্রতি থাক্, আবার যখন তাঁহার ইচ্ছা হয় হইবে।" এই বলিয়া যোগেনবাবুকে বলিলেন,—"যস্মিন্ দেশে যদাচার, আজ একবার থিয়েটার দেখিতে হইবে।" শুনিবামাত্র যোগেনবাবু গাড়ীর ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।

ইতিপূর্বে একদিন শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশ চন্দ্র ঘোষ মহাশয় বাবাজী মহাশয়ের নিকট আসিয়াছিলেন। উঁহার শরীর অত্যন্ত খারাপ। এমন কি হাঁপানি কাসির প্রকোপে কথা বলিতে পর্য্যন্ত কষ্ট হয়। উঁহার গলায় অনেক রকমের মাদুলী ছিল। বাবাজী মহাশয় বলিলেন,—"বাবা! এই মাদুলীগুলি কিসের জন্য গলায় পরা হইয়াছে?"

গিরিশ। বাবা। হাঁপানি কাসির জন্য অনেক স্থান হইতে এইগুলি সংগ্রহ করা হইয়াছে।

বাবাজী। আচ্ছা উহাতে কোন উপকার হইয়াছে কি?

গিরিশ। কিছু আছে বৈ কি! প্রায় সময় বিছানায় শুইয়া থাকিতে হইত। এখন প্রায়ই সেরূপ হয় না। তবে রোগ যেমন প্রায় তেমনই আছে।

বাবাজী। আচ্ছা আপনি ঐগুলি জলে ফেলিয়া দিন, রোগের কথা **নিতাই চাঁদ** বুঝিবেন।

গিরিশবাবু বাবাজী মহাশয়কে বিশেষ ভক্তি-বিশ্বাস করেন; কিন্তু জানি না এই কথাটায় কেন যে সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলেন না! মাদুলী কয়েকটী গলা হইতে খুলিয়া পকেটে রাখিলেন। বাবাজী মহাশয় উঁহার

অন্তরের ভাব বুঝিয়াও অযাচিতভাবে আলিঙ্গনদানে উঁহাকে কৃতার্থ করিলেন। ইঁহার সুশীতল বক্ষস্পর্শ পাইয়াই যেন গিরিশবাবুর যন্ত্রণার উপশম হইল। হাঁপানির টান একেবারেই রহিল না—বেশ সুস্থভাবে আলাপাদি করিতে লাগিলেন। সেই দিন হইতেই গিরিশবাবুর অভিলাষ যে অন্ততঃ একদিনও সগণে বাবাজী মহাশয়কে থিয়েটার দেখান। এ কয়দিন আর সে আশা পূর্ণ হয় নাই। আজ শুভদিন উপস্থিত হইল। ক্ষণকাল পূর্বে বাবাজী মহাশয় থিয়েটার দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন; জানি না কাহার প্রেরণায় অনুমান পাঁচটার পর গিরিশবাবু দর্জ্জিপাড়ায় আসিয়া বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করিয়াই বলিলেন—"বাবা! আজ শ্রীচৈতন্যলীলা প্লে হইবে, অনুগ্রহ করিয়া একবার পদার্পণ করিলে ভাল হইত না?" বাবাজী মহাশয় একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"যস্মিন্ দেশে যদাচার", আচ্ছা নিতাই-এর ইচ্ছায় চেষ্টা করা যাইবে।" শুনিয়া গিরিশবাবু পরমানন্দিতচিত্তে দণ্ডবৎ প্রণামপূর্বক প্রস্থান করিলেন।

যথাসময়ে যোগেনবাবু গাড়ীর যোগাড় করিলে দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ প্রভৃতি কয়েকটী অন্তরঙ্গ ভক্ত সঙ্গে করিয়া বাবাজী মহাশয় সেই গাড়ীতে চড়িলেন। অপর সঙ্গিগণকে যোগেনবাবু পৃথক্ গাড়ী করিয়া দিলেন। থিয়েটার আরম্ভের সময় হইয়া গিয়াছে, তবুও গিরিশবাবু বাবাজী মহাশয়ের অপেক্ষা করিতেছিলেন। ইনি ঠিক বাবু-সাজে সজ্জিত হইয়া যেমন গিয়া উপস্থিত হইলেন, অমনি গিরিশবাবু প্রথম শ্রেণীর বসিবার স্থানে যথাযোগ্যভাবে সকলকে বসাইলেন।

এদিকে অভিনয় আরম্ভ হইল। আনন্দের অবধি নাই। অন্যান্য দিন যেরূপ আনন্দ হয়, আজ যেন তদপেক্ষা দ্বিগুণতর আনন্দ হইতে লাগিল। ভক্তসমাগমই যে ভগবান্ বা ভগবদ্গুণ-গানের অধিক বিকাশের কারণ;

ইহার অণুমাত্র সন্দেহ নাই। বাবাজী মহাশয় এক একবার আনন্দে বিভোর হইয়া যেমন এক একটী হুঙ্কার দিতেছেন, অমনি যেন আনন্দের উৎস ছুটিতেছে। যে ব্যক্তি যাহার সাজে সাজিয়া আসিতেছে, সেই যেন তদ্ভাবাবিষ্ট হইয়া বিভোর ভাবে কার্য্য করিতেছে। আর একটী আশ্চর্য্য—অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ আজ যেন তাহাদের ব্যবসার কথা ভুলিয়া গিয়াছে! সকলেই প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া স্বীয় স্বীয় কার্য্য করিতেছে। তাই আজ অন্যান্য দিন অপেক্ষা এক একটী গানে বা কথায় আনন্দও খুব প্রচুর পরিমাণে হইতেছে। সময়ও কিছু বেশী লাগিতেছে। মা যোগমায়ার কৃপায় এতক্ষণ বেশ চলিতেছিল; যেমন মাধাই কলসীর কানা হাতে করিয়া নিতাইকে মারিতে উদ্যত হইল, অমনি বাবাজী মহাশয় আবেশে গোঁ গোঁ শব্দ করিতে করিতে অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। চেন, ঘড়ি, জামা জুতা প্রভৃতি চারিদিকে বিশ্রস্ত হইয়া পড়িল। দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ মহাশয় শশব্যস্তে উঠিয়া যেমন ইঁহাকে ধরিবার মানসে স্পর্শ করিয়াছেন, অমনি তিনিও প্রেমাবিষ্ট ভাবে নৃত্য করিতে লাগিলেন। মহাহুলুস্থূল ব্যাপার! অতি বড় পাষণ্ড হইলেও যে একবার বাবাজী মহাশয়কে স্পর্শ করিতেছে, সেই প্রেমাবিষ্ট হইয়া নাচিতেছে। অভিনয়কারী ব্যক্তিগণও যেন কেমন একপ্রকার হইয়া গেলেন। সুতরাং সেদিন সেই পর্য্যন্ত হইয়াই অভিনয় বন্ধ হইল। অন্যান্য দর্শকবৃন্দ চলিয়া গেলে, গিরিশবাবু প্রভৃতি অনেক ভদ্র লোক বাবাজী মহাশয়ের দেহে সমকালীন নানারূপ সাত্ত্বিক বিকার প্রকাশ পাইতে দেখিয়া বিস্মিতভাবে ইঁহার সুস্থতার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন এবং সঙ্গিগণ বাবাজী মহাশয়ের শুশ্রূষাকল্পে নিযুক্ত হইলেন। সকলেই কাতরকণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে নাম করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ পরে ইনি কিঞ্চিৎ বাহ্য দশা প্রাপ্ত হইয়া সম্মুখে গিরিশবাবুকে দেখিবামাত্র উঁহাকে আলিঙ্গন দানে কৃতার্থ করতঃ বলিতে লাগিলেন "ধন্য নিতাই চাঁদের

কৃপা! প্রভুর লীলা যেমন মনোহারিণী তেমনি ভাবেই তাহার বিস্তার হইয়াছে। অদ্যাপিহ নিত্যলীলা প্রকট। অদ্যাপিহ সেই সমস্ত নিত্যপরিকরগণ নানারূপভাবে সেই সমস্ত লীলাকৌশল বিস্তাররূপে প্রকাশ করিতেছেন। নিতাই করুন—মহাপ্রভুর এই সুমধুর লীলাখেলা সাধারণের হৃদয়ঙ্গম হউক।" গিরিশবাবু করযোড়ে বলিলেন—"দেখুন, প্রথম প্রথম আমার মনে অভিমান ছিল যে, এই সমস্ত লীলা শ্রেণীবদ্ধরূপে আমিই রচনা করিয়াছি; কিন্তু আপনাদের কৃপা ও সঙ্গপ্রভাবে এখন দেখিতেছি যে, ইহার বিন্দুমাত্রও আমি বুঝি নাই বা আমার ধারণায় আইসে নাই—রচনা করা ত দূরের কথা। আমার জীবনের অনেক সময় নিজ-দোষে হারাইয়াছি। আমার নিজকৃত সে সব বিষয় লইয়া সমালোচনা করিতে গেলে আমি ত্রিজগৎ শূন্যময় দেখি। তাহা হইলে আমা হেন মহাপাপীর উদ্ধারের আর আশাই নাই। সেদিন আপনার মুখের কীর্ত্তন শুনিলাম—"যা গেছে যা গেছে যা, যা আছে সামাল তা, এখন সময় আছে ভাই।" সেই দিন হইতে আমার এ ভগ্ন প্রাণে কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হইয়াছে। আপনি কৃপা করুন; যাহা গিয়াছে সে ত গিয়াছে, অবশেষে যে সামান্য সময়টুকু বাকি আছে; সেইটুকু যেন আর বাজে কাজে বা বৃথা অভিমানে নষ্ট না করি। বয়স অধিক, শরীর অপটু; কিন্তু বাসনা যেন দিন দিন আরও অধিক বলবতী হইয়া আমাকে নাচাইতেছে। আজীবন এই বাসনার দাসত্ব করিলাম; কিন্তু এ কখনও প্রৌঢ়া বা বৃদ্ধা হইল না। এ যেন দিন দিন তরুণী হইতেছে।" বাবাজী মহাশয় গিরিশবাবুর মুখে অনুতাপের কথা শুনিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন। উঁহাকে আলিঙ্গন দানে কৃতার্থ করতঃ উপস্থিত সকলের নিকট বিদায় লইয়া যোগেনবাবুর বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

বাবাজী মহাশয় পরদিবস অতি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া ফনী এবং রাধাবিনোদকে বলিলেন,—"দ্যাখ্! তোরা দুইজনে দুই রাস্তা দিয়া সমানভাবে

দৌড়িয়া নিমতলা ঘাটে চলিয়া যা ত? আমরা আসিতেছি।” আজ্ঞা পাইবামাত্র উহারা দুইজনে গমন করিল। বেলা অনুমান সাড়ে ছয়টার সময় যোগেনবাবু প্রভৃতি অনেক ভদ্র লোকের সহিত বাবাজী মহাশয় গঙ্গাস্নানে গমন করিলেন। পরমানন্দে গঙ্গায় সাঁতার খেলিতেছেন; ফণী এবং রাধাবিনোদের প্রতি একেবারেই লক্ষ্য নাই, উহারা কিন্তু ইঁহার আজ্ঞার প্রতীক্ষায় ঘাটের উপর বসিয়া আছে এবং পরস্পর বলাবলি করিতেছে যে,—“বাবাজী মহাশয় কেনই বা আমাদিগকে অত সকালে দৌড়িয়া গঙ্গার ঘাটে আসিতে বলিলেন, কেনই বা আর কোনও কথা বলিতেছেন না, আমরা ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।” বলিয়া ইঁহার সম্মুখবর্ত্তী হইবামাত্র ইনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—“কি রে! তোরা রাস্তায় কি দেখিলি?” ফণী বলিল,—“আজ্ঞে! কি আর দেখিব? দুই একখানা গরুর গাড়ী এবং একটা মাড়োয়ারীদের মড়া দেখিলাম।” শুনিয়া আবার বাবাজী মহাশয় আপন মনে স্নান করিতে লাগিলেন। প্রায় আধ ঘন্টা যায়, আবার পূর্ব্ববৎ জিজ্ঞাসা করিলে উহারাও পূর্ব্ববৎ উত্তর দিল। তখন একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন—“ দেখিয়া আয় ত উহারা মড়া লইয়া কি করিতেছেন? উহাদিগকে মড়া পোড়াইতে নিষেধ কর্ গিয়া? ফণী প্রভৃতি গিয়া মাড়ওয়ারী দিগকে বলায় তাহারা বালক বোধে উহাদের কথা অগ্রাহ্য করিল। ইনি পুনর্ব্বার যোগেনবাবুকে পাঠাইলেন। যোগেনবাবুর কথায় উহারা কিঞ্চিৎ কাল অপেক্ষা করিতে লাগিল। ইত্যবসরে বাবাজী মহাশয় সাঁতার দিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। অনুমান কুড়ি বৎসর-বয়স্কা একটী সধবা স্ত্রীলোককে কাঠের উপর শয়ন করাইয়াছে; তখনও আগুন দেওয়া হয় নাই। যোগেনবাবু প্রভৃতির কথায় যদিও উহারা একটু ইতস্ততঃ করিতেছিল, কিন্তু বাবাজী মহাশয়কে দর্শন করিবামাত্র সকলে যেন কিরূপ হইয়া গেল। ইনি যেমন বলিয়াছেন,—“বাবা! ইস্কা নীচে উতারো,” মাড়ওয়ারীগণ ঠিক

মন্ত্র-মুগ্ধের ন্যায় স্ত্রীলোকটীকে নীচে নামাইলে ইনি পুনরায় বলিলেন,— "ওহি গঙ্গাযাত্রি! ইস্‌কা ঘরমে লে চল" বলামাত্র উহারা তাহাই করিল। তখন রামদাদাকে স্ত্রীলোকটীর মাথার কাছে এবং রাধাবিনোদ ও ফণীকে দুইপার্শ্বে বসিয়া নাম করিতে আদেশ করতঃ নিজে দুই হাতে স্ত্রীলোকটীর পায়ের দুইটী বৃদ্ধাঙ্গুলি ধরিয়া নাম করিতে লাগিলেন। চারদিক লোকে-লোকারণ্য। সকলেই উচ্চৈঃস্বরে "ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।" এই নাম করিতেছেন আর বিস্মিতভাবে এক-একবার বাবাজী মহাশয়ের মুখপানে এবং এক-একবার মৃত শবটীর প্রতি দৃষ্টি করিতেছেন। নিতাই চাঁদ কি যে খেলা খেলিবেন, কেহই অবগত নহেন; কিন্তু সকলের মনের ধারণা—কোন না কোন একটী অলৌকিক ঘটনা নিশ্চয়ই ঘটিবে। অনুমান আধ ঘন্টা পরে বাবাজী মহাশয় স্ত্রী-লোকটীর পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি ধরিয়া যেমন সজোরে **জয় নিত্যানন্দ** বলিয়া একটী ঝাঁকি দিলেন, অমনি স্ত্রীলোকটী চক্ষু মেলিল। **হরিধ্বনি জয়-ধ্বনিতে** চারিদিক মুখরিত হইল।

মাড়ওয়ারী কয়েকটীর মনে আনন্দ আর ধরে না! স্ত্রীলোকটী যেন বিস্মিতভাবে চারিদিকে তাকাইতে লাগিল। তখন বাবাজী মহাশয় বলিলেন,— "এসব কো জান্‌তে হো?" স্ত্রীলোকটী চোখের ভঙ্গিতে সম্মতিসূচক সঙ্কেত করিল। তখন মাড়ওয়ারীদিগের মধ্যে একজনকে একটু দুগ্ধ আনিতে বলিলেন। সে অতি দ্রুতগতিতে অনুমান একপোয়া দুগ্ধ আনিয়া বাবাজী মহাশয়ের আদেশে একটু একটু করিয়া স্ত্রীলোকটীর মুখে দিতে লাগিল। সেও ধীরে ধীরে উহা গলাধঃকরণ করিতে লাগিল। এই অভূতপূর্ব্ব অলৌকিক ঘটনা দর্শনে সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত—সকলেই স্ব-স্ব কার্য্য বিস্মৃত হইয়া চিত্র-পুত্তলিকার মত দাঁড়াইয়া আছেন, আর এক-একবার উচ্চকণ্ঠে **হরিবোল** ধ্বনি করিতেছেন। অনিচ্ছাবশতঃ যিনি বা যাইতেছেন, তিনিও রাস্তায় বলিয়া যাইতেছেন—

"কোথা হইতে এক সাধু আসিয়াছেন, তিনি চিতার উপর হইতে মড়া নামাইয়া বাঁচাইয়াছেন।" শুনিবামাত্র আরও লোকসংঘট্ট বেশী হইতে লাগিল। প্রায় দেড় ঘন্টাকাল বাবাজী মহাশয় এইরূপ খেলা খেলিয়া জানি না মনে মনে কি ভাবিলেন, একবার চারিদিকে তাকাইয়া স্ত্রীলোকটীর পায়র বৃদ্ধাঙ্গুলি ছাড়িয়া দিলেন। স্ত্রীলোকটীও ধীরে ধীরে নয়ন মুদ্রিত করিল। মাড়ওয়ারীগণ ইঁহার চরণ ধারণপূর্ব্বক স্ত্রীলোকটীকে বাঁচাইবার জন্য কাতর ভাবে প্রার্থনা করিতে লাগিলে ইনি বলিলেন,—"বাবা! **শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু** যে কার্য্য করেন নাই, সে কার্য্য করা আমাদিগের উচিত নয়। তিনি কি ইচ্ছা করিলে শ্রীবাসপণ্ডিতের ছেলেকে বাঁচাইতে পারিতেন না? তাহা তিনি করিলেন না, কারণ বিধির কলম রদ করিলে মর্য্যাদাহানি হয়; সুতরাং **নিতাই চাঁদের** তাহা অভিমত নহে। তবে নামের শক্তিতে যে মৃতদেহে প্রাণসঞ্চারহইতে পারে, **নিতাই চাঁদ** সকলকে তাহাই দেখাইলেন।" রামদাদাকে বলিলেন,— "রাম! ঘটনা দেখিয়া তোমার কি মনে হইল?" রামদাদা বলিলেন, "আমি কি বুঝিব? আপনাদের খেলা আপনারাই জানেন।" তখন ইনি একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "একমাত্র নামের শক্তি ভিন্ন ইহার মধ্যে অন্য কোনও খেলা নাই। নামের কাছে এ ত অতি সামান্য কার্য্য। অসাধ্য সাধন—এমন কি, নামীর পর্য্যন্ত যাহা অসাধ্য, নাম তাহা অতি অনায়াসে সম্পন্ন করিতে পারেন। আমরা যাহা মনে ধারণা করিতে পারি না, নামের আভাসে তাহা সম্পন্ন হইতে পারে। নাম সর্ব্বশক্তিমান, নামের সহিত নামী বর্ত্তমান, একমাত্র নামে বিশ্বাস হইলেই সমস্ত বস্তুতে বিশ্বাস হইবে। নামের কৃপা না হইলে প্রেমলাভ হইবে না বা ভাব রাজ্যে অগ্রসর হইতে পারিবে না, জীব প্রত্যক্ষ কোনও ফল না পাইলে দৃঢ় বিশ্বাস রাখিতে পারিবে না তাই **প্রভুর** এই সমস্ত খেলা। যদি নিজের হৃদয়ে বিশ্বাস না হয়,তবে কেবল কথায় কি লোকে বিশ্বাস করিতে পারে?" ইত্যাদি

নানারূপ উপদেশপূর্ণ বাক্য দ্বারা সকলের সন্তোষ বিধান করতঃ পুনর্ব্বার গঙ্গাস্নান করিয়া যোগেনবাবুর বাসায় আগমনপূর্ব্বক যথাসময়ে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করতঃ বিশ্রাম করিলেন।

সাতকড়ির জীবনদান।

কয়েকদিন যায়, একদিন পুলিনদাদা আসিয়া বাবাজী মহাশয়কে বলিলেন—"আজ্ঞে! দাদা বলিতেছেন যে, একদিন আমাদের বাড়ী অষ্টপ্রহর সংকীর্ত্তন করিলে ভাল হয় না কি?"

বাবাজী। এ ত আমার পরম সৌভাগ্য! বেশ ত, কালই অধিবাস হইয়া পরশ্ব তারিখ অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন হউক।

পুলিনদাদা বাবাজী মহাশয়ের আদেশ পাইয়া হৃষ্টচিত্তে তাঁহার জেষ্ঠ ভ্রাতা কুঞ্জবাবুকে সকল কথা বলিয়া তাঁহার আদেশে সমস্ত যোগাড় করিতে লাগিলেন। রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই বাড়ীর মধ্য হইতে পুলনদাদার নিকট খবর আসিল যে, হঠাৎ কুঞ্জবাবুর ছেলে সাতকড়ির প্লেগ হইয়াছে। পুলিনদাদা একবার সাতুকে দেখিতে গেলেন। গিয়া যাহা দেখিলেন, তাহা বলিবার ভাষা নাই। তখন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ভাবে ধীরে ধীরে দর্জ্জিপাড়ায় বাবাজী মহাশয়ের নিকট গমন করিলেন। পুলিনদাদাকে দেখিয়া ইনি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হে পুলিন! খবর কি?"

পুলিন। আজ্ঞে! আমি অধিবাসের সমস্ত যোগাড় করিতেছিলাম, হঠাৎ বাড়ীর মধ্য হইতে খবর আসিল যে, দাদার ছেলে সাতকড়ির প্লেগ হইয়াছে। শুনিয়া তাড়াতাড়ি গিয়া দেখি—অবস্থা খুবই খারাপ।

বাবাজী। ডাক্তার দেখিতেছে ত?

পুলিন। আজ্ঞে হাঁ! যেরূপ অবস্থা তাহাতে ডাক্তার যে কিছু করিতে পারিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস হয় না।

বাবাজী। তবে নাম বন্ধ থাক, অন্য কোনও সময় করা যাইবে।

পুলিনদাদা একটু বিষণ্ণ ভাবে বাবাজী মহাশয়ের মুখপানে তাকাইয়া রহিলেন। ইঁহার কথায় কি যে উত্তর দিবেন, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

বাবাজী মহাশয় উহার অবস্থা দেখিয়া বলিলেন—"আচ্ছা তোর কি ইচ্ছা বল্ দেখি?"

পুলিন। আজ্ঞে! আমার ইচ্ছা যে যখন নামের উদ্যোগ হইয়াছে, নামটী বন্ধ করা কোনমতেই সঙ্গত বোধ হয় না। তবে আপনার যাহা ইচ্ছা!

বাবাজী। তবে যা, যোগাড় কর্ গিয়া। মঙ্গলময় নাম সমস্ত মঙ্গল করিবেন।

পুলিনদাদা বাবাজী মহাশয়ের আজ্ঞানুসারে হৃষ্টচিত্তে বাড়ী গিয়া সমস্ত যোগাড় করিতে লাগিলেন। এদিকে যথাসময়ে বাবাজী মহাশয় সঙ্গিগণসহ কুঞ্জবাবুদের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইবামাত্র পুলিনদাদা ইহাকে সঙ্গে লইয়া সাতকড়ির নিকট গমন করিলেন। বাবাজী মহাশয়কে দেখিয়াই কুঞ্জবাবু অতিশয় ব্যাকুলভাবে বলিলেন—"বড়ই বিপদ উপস্থিত, এখন কি উপায় করা যায়? শুভকার্য্যে কেন যে এত বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হয় কি জানি! নিতাই চাঁদের কি ইচ্ছা তিনিই জানেন।

বাবাজী। মঙ্গলময় প্রভু কখনই মঙ্গল বই অমঙ্গল করেন না। তবে আমরা বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার উপর দোষারোপ করিয়া থাকি। ঐহিক জগতেই হউক আর পারত্রিক জগতেই হউক, অগ্রসর হইতে গেলে পরীক্ষা দিতেই হইবে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে কিরূপে তিনি অঙ্গীকার করিবেন?

কুঞ্জ। আমরা সামান্য জীব, এজাতীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভবপর কি?

বাবাজী। প্রভু মঙ্গলময় এই কথাটী সর্ব্বদার তরে মনে রাখিতে পারিলে আমাদের কোন বিপদ হইতে পারে না। বিপদ ত আসবেই। বিপদ না আসিলে পরীক্ষার স্থান কোথায়?

কুঞ্জ। আচ্ছা, এই আশু বিপদে কি করা যুক্তিসঙ্গত?

বাবাজী। অধিবাসের উদ্যোগ হইয়াছে কি?

পুলিন। আজ্ঞে! সমস্তই প্রস্তুত। লোকজনও অনেক উপস্থিত হইয়াছেন। এ অবস্থায় এই শুভকার্য্য বন্ধ করা কি উচিত হইবে?

কুঞ্জ। উচ্চ সংকীর্ত্তন করায় ডাক্তারদের মত হইবে কি? সাতুর অবস্থাও ত ক্রমেই খারাপ হইয়া আসিতেছে। প্রভু যে কি করিবেন, তিনিই জানেন।

বাবাজী। ভয় কি? আমার বিশ্বাস ও সমস্ত কেবল আমাদের মানসিক দৃঢ়তা পরীক্ষার জন্য নিতাইচাঁদের ভঙ্গি মাত্র। চঞ্চল হইবার কোন প্রয়োজন নাই। ডাক্তার কবিরাজের আশা ছাড়িয়া দিয়া নিতাই চাঁদের জিনিষ তাঁহার হাতে সমর্পণ করিয়া আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। অষ্টপ্রহরের অধিবাস আরম্ভ হউক। সকলে সেই মঙ্গলময় শুভকার্য্যে যোগদান করিয়া একমনে তাঁহাকে ডাকুন। তিনি যাহা ভাল বিবেচনা করেন করিবেন। সাতুর জন্য আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন।

এই বলিয়া নিজের হাতে এক খানা পীচের লাঠি ছিল ঐখানি সাতকড়ির কোলের কাছে বিছানার উপর রাখিয়া নীচে গমন করিলেন। 'সাতুর জন্য আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন' জানি না এই কথাটী বাবাজী মহাশয়ের মুখ হইতে কি ভাবে বাহির হইল এবং কি শক্তি সঞ্চার করিল। বালক-বৃদ্ধ

স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই প্রাণে যেন এক অপূর্ব্ব বল আনিয়া দিল। সকলেই একবাক্যে বলিতে লাগিলেন—"সাতুর জন্য আর কোন চিন্তা করিতে হইবে না, উহার ভার বাবাজী মহাশয় গ্রহণ করিয়াছেন। চল আমরা সকলে মঙ্গলময় নাম সংকীর্ত্তনে যোগ দিই।"

এদিকে বাবাজী মহাশয় অধিবাস কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। অপূর্ব্ব আনন্দ! অধিবাসকীর্ত্তনে যে এতাদৃশ আনন্দ হইতে পারে ইহা আমাদের ধারণা ছিল না। পুলিনদাদাদের বাহির বাড়ীতে অনেকটা স্থান; উহাদের চণ্ডীমণ্ডপের বড় দালানে কীর্ত্তন হইতেছে। বাহিরে এবং ভিতরে বহু লোকসমাগম হইয়াছে। সকলেই প্রেমানন্দ-সাগরে নিমগ্ন, কাহারই যেন বাহ্যস্মৃতি নাই। কীর্ত্তন সমাপ্তি করিয়া যেমন নাম ধরিলেন, অমনি সকলে নামে যোগ দিলেন। মনপ্রাণ মাতান অপূর্ব্ব নামের ধ্বনিতে দশদিক্ মুখরিত হইল। 'অধিবাস কীর্ত্তনে আনন্দ উপভোগ করিয়া সকলেই বলিতে লাগিলেন—"কালিকার অষ্টপ্রহর কীর্ত্তনে নিশ্চয়ই খুব আনন্দ হইবে। কারণ, অধিবাসে এরূপ আনন্দ আমরা আর কখনও অনুভব করি নাই।" রাত্রি অনুমান সাড়ে এগারটার সময় কীর্ত্তন শেষ করতঃ অন্যান্য সকলে স্বীয় স্বীয় স্থানে প্রস্থান করিলেন। ইঁহারাও মহাপ্রসাদ পাইয়া বিশ্রাম করিলেন।

পরদিবস বাবাজী মহাশয় অতি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনপূর্ব্বক নাম আরম্ভ করিলেন। "শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি"—যে কোন রাজ্যে অগ্রসর হইতে গেলেই পরীক্ষা তাহার সঙ্গে সঙ্গে। বলার সঙ্গে সঙ্গে নামানন্দ যেমন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, এদিকে সাতুর রোগের অবস্থাও ক্রমেই খারাপ হইতে লাগিল। খুব মাতামাতি কীর্ত্তন হইতেছে, বাবাজী মহাশয় খুব উদ্দণ্ড নৃত্য করিতেছেন। হঠাৎ সংকীর্ত্তন স্থান হইতে একেবারে সাতকড়ির নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। এতক্ষণ সকলেই খুব চিন্তিত ছিলেন; বাবাজী

মহাশয় আসিয়া সাতুর বুকের উপর বাম হস্ত অর্পণ করিয়া যেমন উহার নিকটে বসিলেন, অমনি সকলেই একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন—"আর কোন ভয় নাই।" এদিকে নানারূপ প্রকৃতির লোক নানাভাবের কথা বলিতে লাগিল। কেহ বা বলিতেছে—"এইরূপ চিৎকার ধ্বনিতে ছেলেটা পরমায়ু থাকিতে থাকিতে মরিয়া যাইবে।" কেহ বা বলিতেছে—"কুঞ্জবাবু এমন বুদ্ধিমান্ হইয়া এরূপ হুজুগে মাতিলেন কেন?" আবার কেহ বা বলিতেছে—"মহাপুরুষের শক্তিতে অসাধ্যও সাধন হইতে পারে, হয়ত ঐ নামের জোরেই ছেলেটা ভাল হইয়া যাইবে" ইত্যাদি যাহার যেরূপ মানসিক বৃত্তি সে সেইরূপ সমালোচনা করিতে লাগিল। বাবাজী মহাশয় এক একবার সংকীর্ত্তনের মধ্যে গিয়া কিছু সময় নৃত্য কীর্ত্তন করিয়া আবার সাতুর নিকট চলিয়া আসিতেছেন। সংকীর্ত্তনে অপূর্ব্ব আনন্দ হইতেছে। নাম যেন মূর্ত্তিমান হইয়াছেন। রাস্তা দিয়া যেই যাইতেছে, অতি বড় পাষণ্ড হইলেও নাম তাহাকে আকর্ষণ করিয়া সংকীর্ত্তনস্থানে আনিতেছেন।

এদিকে ক্রমে সাতকড়ির অবস্থা-পরিবর্তন হইতে লাগিল। দেখিয়া শুনিয়া অবিশ্বাসীরও বিশ্বাস জন্মিল—অভক্তেরও ভক্তি আসিল। ইতিপূর্ব্বে যাঁহারা পুলিনদাদাকে নানারূপ উপহাস করিতেছিলেন, তাঁহারাই এখন নামের অভাবনীয় প্রভাব, বাবাজী মহাশয়ের অপূর্ব্ব শক্তি এবং ইঁহাদের অকপট বিশ্বাস প্রভৃতির প্রশংসা করিতেছেন। পুলিনদাদার আনন্দ আর ধরে না। বেলা চারিটার সময় সাতু বেশ সকলের সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলিতে লাগিল। সন্ধ্যার সময় নিজে উঠিয়া বাহিরে প্রস্রাবাদি করিতে গেল। কেহ কিছু বলিলে বা ধরিতে গেলে স্পষ্টই বলিতে লাগিল—আমার ত কোনই অসুস্থতা নাই, আমি বেশ সুস্থ আছি। আমার জন্য আপনারা কোন আশঙ্কা করিবেন না। আপনারা সর্ব্বমঙ্গলময় নামের প্রতি লক্ষ্য করুন। এইরূপ পরমানন্দে

অলক্ষিতভাবে দিবারাত্র কাটিয়া গেল। পরদিবস সকলের অনিচ্ছাসত্ত্বেও নাম সমাপ্তি করিলেন। সাতকড়ি আসিয়া সংকীর্ত্তনস্থলে গড়াগড়ি দিল। বাবাজী মহাশয় পুলিনবাবু এবং কুঞ্জবাবুকে বলিলেন—"দেখ, আমার ইচ্ছা যে সাতকড়ি আমাদের সঙ্গে গঙ্গাস্নানে গমন করে।" কুঞ্জবাবু করযোড়ে বলিলেন—'সাতকড়ি ত আপনার; আপনি উহাকে যাহা বলিবেন ও অবিচারে তাহাই করিবে। আমাদের নিকট জিজ্ঞাসা করা অতিরিক্ত মাত্র।" তখন বাবাজী মহাশয় সাতুকে সঙ্গে লইয়া সগণে নাম করিতে করিতে গঙ্গাস্নানে গমন করিলেন। সাতকড়ি ইঁহার আদেশে গঙ্গায় বেশ ডুব দিয়া স্নান করিল। ইঁহারাও সকলে স্নানাদি করিয়া বাসায় প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক যথাসময় মহাপ্রসাদাদি পাইয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রামান্তে অপরাহ্ন সময় দর্জ্জিপাড়ায় গমন করিলেন।

অতীনদাদার অপরাধ ভঞ্জন বা পুনর্জীবন।

রসিকবাবুর বাগানে অবস্থানকালে একদিন অতীনদাদা, কুঞ্জবাবু প্রভৃতি চারি পাঁচজন ভদ্রলোক বাবাজী মহাশয়কে দর্শন করিতে আসিলেন। সেদিন কি কারণে তখনও বাবাজী মহাশয় শয়নে আছেন। কয়েকটি স্ত্রীলোক ইঁহার চরণসেবা এবং বাতাস করিতেছে। কয়েকটি পুরুষ ভক্ত বসিয়া ইঁহার সহিত নানারূপ তত্ত্বকথার আলোচনা করিতেছেন। অতীনদাদা প্রভৃতি উপস্থিত হইবামাত্র স্ত্রীলোক কয়েকটি ঘর হইতে বাহিরে আসিলেন। উঁহারা গিয়া বাবাজী মহাশয়কে দণ্ডবৎ প্রাণামাদি করিলে ইনি সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া বসিতে বলিলে সকলেই বসিলেন। অবিতর্কিতভাবে অতীনদাদার মনে একটু

'কিন্তু' হইয়াছে। 'কিন্তু'র কারণ—বাবাজী মহাশয়ের নিকট কয়েকটি স্ত্রীলোক বসিয়া থাকা। যদিও অতীনদাদা মনে মনে অনেক বিচার করিতে লাগিলেন যে, বাবাজী মহাশয়ের কোনওরূপ সংস্পর্শদোষ হইতে পারে না, তথাপি উঁহার মন পরিষ্কার হইল না। কিছুক্ষণ পরে বাবাজী মহাশয়ের আদেশক্রমে উঁহারা কলিকাতা অভিমুখে রওনা হইলেন।

অতীদাদার মনের সন্দেহটি কিন্তু বদ্ধমূল হইয়া গেল। কিছুদূর যাইতে না যাইতে উঁহার ভয়ানক জ্বর আসিল। সঙ্গে সঙ্গে এমন কম্প উপস্থিত হইল যে, আর বসিবার সাধ্য রহিল না; সুতরাং কুঞ্জবাবু প্রভৃতি একখানি ঠিকা গাড়ীতে করিয়া উঁহাকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিলেন। অতীনদাদার মনে দৃঢ় ধারণা হইল যে, শ্রীগুরুদেবের উপর অমূলক সন্দেহ করার দরুণই তাঁহার এই অসুখ হইয়াছে। অনেক ডাক্তার দেখান হইতেছে; কিন্তু জ্বর কিছুতেই কমিতেছে না, বরং দিন দিন বৃদ্ধিই পাইতেছে। অতীনদাদার পিতা এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজনগণ বড়ই ভাবিত হইলেন। কি করা যায়, কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছেন না। এ দিকে বাবাজী মহাশয় প্রায়ই বলেন যে, অতীন কেন আসে না? তবে কি তাহার কোনরূপ বিপদ হইল? সঙ্গিগণ ইহার মর্ম্ম কিছুই অবগত নহেন। তবে বাবাজী মহাশয়ের কথায় অনেকেই বলাবলি করিতে লাগিলেন যে, বোধ হয় অতীনদাদা কোনও বিপদে পড়িয়া ইঁহাকে ডাকিতেছেন। তাহা না হইলে, ইঁহার এত উৎকণ্ঠা হইবে কেন? চার পাঁচ দিন পরে যোগেন বাবুর বিশেষ আগ্রহে বাবাজী মহাশয় দর্জ্জিপাড়ায় উঁহার বাড়ী আগমন করিয়া নানা লীলাখেলাদি আচরণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু অতীনদাদার কথা আর মনে করিলেন না। পুলিন দাদাদের বাড়ী অষ্টপ্রহর উপলক্ষে কুঞ্জবাবুর ছেলেকে প্লেগ রোগ হইতে আরোগ্য করিয়া যেমন দর্জ্জিপাড়ায় আসিলেন, অমনি শুনিলেন যে, অতীনদাদার বাতশ্লেষ্মা বিকার হইয়াছে। বাঁচিবার আশা নাই-

ডাক্তারগণ জবাব দিয়াছেন। এতক্ষণ আছে কি না সন্দেহ। কারণ, উপর হইতে নীচে নামান হইয়াছে।

বেলা অনুমান আটটা। বাবাজী মহাশয় যেন একটু উৎকণ্ঠিতের ন্যায় রামদাদা, গিরীনদাদা এবং ফণী—এই কয়েকজনকে সঙ্গে লইয়া অতীনবাবুদের বাড়ী গমন করিলেন। সেদিন ইঁহার এক অভিনব বেশ। গায়ে একখানি কাঁথা, হাতে একটা পীচের লাঠি। ঢুলিতে ঢুলিতে অতীনদাদাদের বাড়ী উপস্থিত হইবামাত্রই অতীনদাদার পিতার সহিত দেখা হইল। উঁহাকে দেখিবামাত্র ইনি বলিলেন—তোমার ছেলেকে এখন বাঁচাও।”

অঃ পিতা। বাবা! আমি অনেক চেষ্টা করিয়াও কোন ফল পাই নাই। ভাল ভাল ডাক্তার দেখান হইল; কিন্তু কেহই জ্বর কমাইতে পারিল না। আজ দুই দিন হইল বিকার হইয়াছে। অবস্থা বড়ই শোচনীয়; কি করিব কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছি না।

বাবাজী। এ রোগে ডাক্তার কবিরাজ কিছুই করিতে পারিবে না বা তোমার কোন হাত নাই। বল, আজ হইতে অতীন আমার ত?

অঃ পিতা। আজ্ঞে হ্যাঁ, আজ হইতে অতীন আপনার।

বাবাজী। এখন আমি উহাকে যাহা ইচ্ছা করিতে পারি? মারিয়া ফেলি বা বাঁচাইয়া রাখি; ইহাতে তোমার কোনও কিছু বলিবার অধিকার নাই ত?

অঃ পিতা। আজ্ঞে, আপনার যাহা ইচ্ছা।

অতীনের পিতার নির্ভরতা দেখিয়া বাবাজী মহাশয় হৃষ্টচিত্তে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াই দেখেন যে, নীচের তলার বৈঠকখানায় একটি ঘরের গদির উপর অতীন উলঙ্গ ভাবে রোগের যন্ত্রনায় গড়াগড়ি দিতেছে। উহার আত্মীয়-স্বজন চারিদিকে বসিয়া হা হুতাশ করিতেছে। বাবাজী মহাশয় অতি দ্রুতগতি অতীনের নিকট গমনপূর্ব্বক উহাকে উপুড় করতঃ পিঠের উপর চড়িয়া পা হইতে মস্তক পর্য্যন্ত প্রস্রাব করিতে-করিতে নামিলেন। নামিয়াই ফণীকে আদেশ

করিলেন—"উহার শরীরে বেশ করিয়া শত ধৌত ঘৃত মালিশ কর।" ফণী তাহাই করিতে লাগিল। এ দিকে অতীনের পিতাকে বলিলেন,—"তোমাদের ঘরে পূজার সময়ের যে গঙ্গাজল তোলা আছে, উহা হইতে আট দশ কলসী গঙ্গাজল আন ত; ইহাকে স্নান করাইতে হইবে।" এই কথা শুনিয়া অপরাপর উপস্থিত লোকসকল বলাবলি করিতে লাগিল যে, যদি বা দুই চারি ঘণ্টা বাঁচিত। কিন্তু এই বাতশ্লেষ্মা বিকারে যেমন ঠাণ্ডা লাগিবে অমনি প্রাণ যাইবে ইত্যাদি। অতীনদাদার পিতা কিন্তু মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া বাবাজী মহাশয়ের ব্যাপার দর্শন করিতেছেন, আর অবিচারে ইঁহার আদেশ পালন করিতেছেন। উপর হইতে গঙ্গাজল আনা হইলে বাবাজী মহাশয় ফণীকে বলিলেন—"দেখ, উহাকে বসাইয়া বেশ করিয়া উহার মাথায় জল ঢাল ত!" ফণী তাহাই করিল। স্নানান্তে কাপড় পরাইয়া দেওয়া হইলে, বাবাজী মহাশয় উহাকে দৃঢ় আলিঙ্গনদানে কৃতার্থ করিয়া উহার রোগ শোক জ্বালা যন্ত্রণা দূর করতঃ জিজ্ঞাসা করিলেন—"অতীন! আজ হইতে তোর রোগ সারিয়া গেল ত?" অতীনদাদা হৃষ্টচিত্তে বলিলেন—"আজ্ঞে! আপনার কৃপায় সমস্ত রোগ দূর হইয়া গেল। এখন আমি বেশ সুস্থ ও সবল।"

বাবাজী। যাও, খুব সাবধানে থাকিও, মনে দৃঢ় বিশ্বাস রাখিও। বিশ্বাসই জীবনের মূল ভিত্তি। বিশ্বাসহীন সন্দিগ্ধ জীবন পাষাণবৎ জড় পদার্থ।

অতীন। একমাত্র আপনার কৃপাই আমার সম্বল। আমা হেন ঘোর নারকী অপরাধী অবিশ্বাসী জীবকে যখন অযাচিতভাবে কৃপা করিয়া জীবন দান করিয়াছেন, তখন এ জীবনে যাহা কিছু প্রয়োজন, বলপূর্ব্বক কেশে ধরিয়া করাইতে হইবে।

বাবাজী। নিতাইচাঁদ কর্ত্তা, তাঁহাকে স্মরণ রাখিও; কোনই বিপদ হইবে না। তবে আমি এখন চলিলাম।

অতীন। আজ্ঞে! আমিও আপনার সঙ্গে যাইব মনস্থ করিয়াছি।

বাবাজী। আজ বিশ্রাম কর, আগামী কল্য **বিরাট নগরসংকীর্ত্তন** বাহির হইবে। সেই কীর্ত্তনে গিয়া যোগ দিও।

এই বলিয়া গমনোদ্যত হইবেন, এই সময় অতীনদাদার পিতা এবং অন্যান্য যাহারা উপস্থিত ছিলেন, সকলেই ইঁহার চরণ ধারণপূর্ব্বক নানারূপ কাতরতাপূর্ণ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

অতীনদাদার পিতা বলিলেন—"আমার এমন কোনও ভাষা নাই, যাহা দ্বারা আমার মনের ভাব আপনাকে বুঝাইতে পারি। আপনি অন্তর্য্যামী মহাপুরুষ, সমস্তই অবগত আছেন; এই মাত্র বলিতে পারি আপনি যে কেবল অতীনেরই জীবনদাতা, তাহা নহে; আপনি আমাদের বংশের প্রাণদাতা এবং ত্রাণকর্তা। আজ আমরা আপনার শ্রীচরণ-কৃপায় হারাধন প্রাপ্ত হইলাম। আশীর্ব্বাদ করুন—যেন আপনার শ্রীচরণে রতি মতি থাকে। দুর্দ্দান্ত কলির পীড়নে যেন অবিশ্বাস না আসে।" সাশ্রুগদগদকণ্ঠে এইরূপ কত যে বলিতে লাগিলেন, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে?

বাবাজী মহাশয় বলিলেন—"বাবা! একের বোঝা অপরের উপর চাপাও কেন? মঙ্গলময় নিতাইচাঁদ সামান্য বৃক্ষ দ্বারা অসাধ্য সাধন করিতে পারেন। এ ত সামান্য কথা।" বলিয়া দর্জ্জিপাড়ায় যোগেন মিত্র মহাশয়ের বাড়িতে গমন করিলেন। যাইবার সময় অতীনদাদা বাবাজী মহাশয়কে বলিলেন—"আজ্ঞে কি খাইব? আমার বড়ই ক্ষুধা বোধ হইতেছে।" শুনিয়া বাবাজী মহাশয় বলিলেন—"আমি যোগেন মিত্রের বাড়ী হইতে অধরামৃত পাঠাইব, কেবল মাত্র তাহাই খাইয়া আজ থাকিবে।" এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন বেলা অনুমান চারিটার সময় শ্রীযুক্ত ব্রজবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের হাতে অধরামৃত পাঠাইয়া দিলেন; অতীনদাদা তাহাই খাইয়া সেদিন রহিলেন।

বাবাজী মহাশয় চলিয়া গেলে সকলে পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল,

"কি আশ্চর্য্য শক্তিশালী মহাপুরুষ! এমন মহাত্মা ত আমরা কখনও দেখি নাই। যাহার বাঁচিবার কোনও আশা ছিল না; এমন কি অল্প সময়ের মধ্যে প্রাণবিয়োগ সম্ভাবনায় যাহাকে উপর তলা হইতে নীচে আনা হইল, সেই লোককে কি না চকিতে আলিঙ্গনদানে সুস্থ সবল করিয়া দিলেন? কি অদ্ভুত ব্যাপার! ঔষধ প্রয়োগের মধ্যে দেখিলাম—বাতশ্লেষ্মা জ্বরবিকারগ্রস্ত রোগীকে শত ধৌত ঘৃত মাখাইয়া বহুদিনের তোলা বাসি ঠাণ্ডা আট দশ কলসী গঙ্গাজলে স্নান করান। আমরা তখন ভাবিলাম, ঐ ঠাণ্ডাজল স্পর্শমাত্র ইহার প্রাণ বাহির হইয়া যাইবে। কিন্তু প্রাণ বাহির হওয়া ত দূরের কথা—রোগী একেবারে সুস্থ শরীরে কি না তাঁহার সঙ্গে যাইবার জন্য ব্যস্ত? এরূপ শক্তিমান্ সাধুর দর্শন ত দূরের কথা, এরূপ অদ্ভুত ঘটনা আমরা কখনও শুনি নাই। এইরূপ মহাত্মার দর্শন পাইয়া আমরা নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি।"

কলিকাতায় বিরাট সংকীর্ত্তন।

এই ঘটনাটি সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বিহারীদাস বাবাজী মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল। তিনি লিখিয়াছেন ঃ—

একদিন গোবর্দ্ধন দাস আমাকে বলিল—"বিহারীদাদা! আগামী কল্য দর্জ্জিপাড়া হইতে বাবাজী মহাশয় বিরাট নগরসংকীর্ত্তন বাহির করিবেন; তুমি যাইবে কি?" আমি বলিলাম, "ভাই! কাল ত যাইবই, আমার বড়ই ইচ্ছা হইতেছে যে, আজই একবার বাবাজী মহাশয়কে দর্শন করিতে যাই।" আমার কথা শুনিয়া গোবর্দ্ধন অতি উৎসাহভরে বলিল—"বেশ কথা! চল, আমিও যাইব।" শুনিয়া আমার বড়ই আনন্দ হইল। দুইজনে রওনা হইয়া বেলা অনুমান চারটার সময় যোগেনবাবুর বাড়ি গিয়া দেখি বাবাজী মহাশয় শুইয়া আছেন। যোগেনবাবুকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন—"সকাল বেলা

অতীনবাবুর বাতশ্লেষ্মা জ্বরবিকার আরোগ্য করিয়া যেমন এস্থানে আসিয়া পৌঁছিলেন অমনি ভয়ানক জ্বর হইল।

আমি। আগামী কল্য না কি বিরাট নগরকীর্ত্তন বাহির হইবে আদেশ করিয়াছেন?

যোগেন। আদেশ ত করিয়াছেন; কিন্তু এইরূপ ভয়ানক জ্বর লইয়া কিরূপে যে কীর্ত্তন করিবেন, আমরা ত তাই ভাবিতেছি।

এইরূপ বলাবলি হইতেছে, এমন সময় বাবাজী মহাশয় পুলিনবাবু প্রভৃতি কয়েকজনকে আদেশ করিলেন—"দেখ, কল্য বিরাট নগর কীর্ত্তন বাহির হইবে, তোমরা গিয়া সমস্ত যোগাড় কর। সর্ব্বাগ্রে পুলিশ হইতে রাস্তার পাশ আনা চাই; দেখিও যেন সময়ে কোন গোলমাল না হয়।

পুলিন। আজ্ঞে! কোন্ কোন্ রাস্তার পাশ করিতে হইবে?

বাবাজী। বীডন স্ট্রীট, কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, হ্যারিসন রোড, গঙ্গার পুল হইয়া গঙ্গার ধার, নিমতলা স্ট্রীট ইত্যাদি।

পুলিন। আজ্ঞে! হ্যারিসন রোডের মধ্যে একটি মস্‌জিদ আছে, রাস্তার পাশ করিলেও মস্‌জিদের নিকট দিয়া কোনওরূপ বাজনা বা কীর্ত্তনাদি লইয়া যাইতে দেয় না সে স্থানে কি হইবে?

বাবাজী। সে বিচার করিবার ভার ত আর তোমার উপর দেওয়া হয় নাই। যাঁহার কার্য্য তিনি করিবেন। তোমাদের উপর যে ভার তোমরা তাই কর। শ্যামলাল গোস্বামী, বলাইচাঁদ গোস্বামী প্রভৃতি ছয়জন প্রভুসন্তান নিমন্ত্রণ করা চাই। উঁহাদিগকে বলিয়া দিবে—আগামী কল্য বেলা চারিটার সময় যেন অনুগ্রহ করিয়া যোগেনবাবুর বাড়ী আগমণ করেন। অন্যান্য ভক্তগণকে বিডন গার্ডেনে উপস্থিত থাকিতে বলিবে।

এই বলিয়া পুলিনদাদাকে বিদায় দিলেন। আমরা ইঁহার নিকট বসিয়া

আছি, ইনি শয়ন করিয়া আছেন। ভয়ানক জ্বর এবং এত শ্লেষ্মা উঠিতেছে যে, এক ঘণ্টার মধ্যে পীকদানী পরিপূর্ণ হইয়া যাইতেছে। কিন্তু ক্লান্তিবোধ নাই। সকলের সঙ্গে হাসিমুখে ভগবৎকথা বলিতেছেন। কেহ শরীরের অসুস্থতার কথা জিজ্ঞাসা করিলে উপহাস করিয়া সে কথা উপেক্ষা করিতেছেন। ইঁহার শরীরের অবস্থা দেখিয়া আমরা কিন্তু বেশ আনন্দ পাইতেছি না। প্রায় সকলেই কাল কি করিয়া যে নগর সংকীর্ত্তন হইবে, এই চিন্তায় চিন্তিত। রাত্র অনুমান আটটার সময় পুলিনদাদা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখনও ইনি পূর্ব্ববৎ শয়নেই আছেন। পুলিনদাদাকে দেখিবামাত্র বলিলেন, "আমি যাহা যাহা বলিয়াছি সমস্ত যোগাড় হইয়াছে?"

পুলিন। আজ্ঞে! সমস্তই প্রস্তুত; কিন্তু আপনার শারীরিক অবস্থা দর্শনে আমাদের মন বড়ই খারাপ হইতেছে। আমি বলি—কাল কীর্ত্তন বাহির না করিয়া দুইদিন পরে করিলে ভাল হইত না কি?

বাবাজী। তোমাদের কোন চিন্তার কারণ নাই! কোন বিশেষ কারণে আমার জ্বর হইয়াছে। কাল সব ভাল হইয়া যাইবে। তুমি তোমার দাদাকে বলিয়া প্রভুসন্তানগণের জন্য ছয় জোড়া বৃন্দাবনী কাপড় লইয়া কল্য সকালেই আসিবে।

বলিয়া সকলকে বিদায় দিলেন। আমরাও বাবাজী মহাশয়ের আদেশক্রমে বাড়ি ফিরিলাম।

পর দিবস সকাল বেলা পুলিন দাদা যথানির্দ্দিষ্টভাবে ছয় জোড়া বৃন্দাবনী কাপড় এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাবাজী মহাশয় পুলিন দাদার কার্য্যকৌশল দর্শনে বড়ই সুখী হইয়া বলিলেন— "অপরাপর ফুলের মালা প্রভৃতি যাহা যাহা আবশ্যক সমস্ত যোগাড় করা হইয়াছে ত?"

পুলিন। আজ্ঞে! জিনিষ পত্রের জন্য কোন চিন্তা নাই; তবে আপনার যেরূপ শরীর ইহাতে কি হইবে?

বাবাজী। দেখ, নিতাইচাঁদের কার্য্য সংকীর্ত্তন বাহির করা, তিনি নিশ্চয়ই করিবেন; এ পুতুলকে যদি নাচাইতে ইচ্ছা না করেন সে পৃথক্ কথা। সে জন্য আমাদের ভাবিবার কোনই প্রয়োজন নাই। ভগবান্ অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন যে—"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গো হস্ত্বকর্ম্মণি॥' নিতাই কার্য্য করিতে আদেশ বা শক্তি দিয়াছেন, কার্য্য করিয়া যাও; ফলাফল তিনিই জানেন।

পুলিন দাদা আর কিছুই না বলিয়া চলিয়া গেলেন। বেলা অনুমান চারিটার সময়ে আমরা অনেকে বাবাজী মহাশয়ের দর্শন মানসে যাইয়া দেখি যে, তখনও বাবাজী মহাশয় শুইয়া আছেন। আমি অতীনদাদা এবং অন্য কয়েক জন, বাবাজী মহাশয়ের নিকট যাইবামাত্র ইনি উঠিয়া বসিলেন। ইঁহার দেহে তখনও খুব জ্বর আছে। অতীনদাদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"অতীন! কেমন আছ?"

অতীন। আজ্ঞে! গত কল্য আপনার শ্রীচরণ দর্শন পাওয়া অবধি আর আমার কোন অসুখ নাই। বেশ সুস্থ শরীরে আহারাদি করিয়া আপনাদের দর্শনে হাঁটিয়া আসিলাম।

বাবাজী। নিতাইচাঁদের কৃপার জয় দাও। বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কয়টা বাজিয়াছে?" একজন বলিল—"আজ্ঞে! চারিটা বাজিয়াছে।" শুনিয়া রামদাদাকে বলিলেন—"রাম! নাম আরম্ভ কর ত।" আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া রামদাদা নাম ধরিয়া যোগেনবাবুর বাড়ীর সম্মুখে রাস্তায় দাঁড়াইলেন। বাবাজী মহাশয় তখনও বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন। অনেক ভক্তবৃন্দ মনে মনে ভাবিতেছেন—হয় ত বাবাজী মহাশয় কীর্ত্তনে বাহির হইবেন না। ক্ষণকাল পরে কি জানি কি

ভাবিয়া **জয় নিতাই** বলিয়া হুঙ্কার করতঃ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। উপস্থিত ভক্তবৃন্দের প্রাণে যেন তড়িৎ-প্রবাহের ন্যায় আনন্দ-শক্তি সঞ্চারিত হইল। সকলেই সমস্বরে **হরিবোল** ধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

এদিকে বাবাজী মহাশয় ফণীকে আদেশ করিলেন—"হ্যাঁরে ফণী! শ্রীধাম নবদ্বীপ হইতে যে গুরুদেবের প্রসাদী ডোর কৌপিন বহির্ব্বাস আসিয়াছে তাহা এবং পীচের লাঠিখানা লইয়া আয় ত?"

ফণী আদেশ অনুরূপ ডোর কৌপীন বহির্ব্বাস আনিয়া দিলে বাবাজী মহাশয় উহা পরিধানপূর্ব্বক মাথায় একখানি খুব ময়লা ছেঁড়া ন্যাকড়া এবং পূর্ব্বে যে বাম পদের হাঁটুর নীচে মাংস তুলিয়া ফেলিয়াছিলেন, সেই চিহ্নিত স্থানে একখানি ন্যাক্ড়া বাঁধিয়া লাঠিখানা হাতে লইয়া কীর্ত্তনের মধ্যে আগমণ করতঃ "প্রকট অপ্রকট লীলার দুই ত বিধান। প্রকট লীলায় করেন প্রভু নিজে নৃত্য গান। অপ্রকটে নামরূপে সাক্ষাৎ ভগবান্। কীর্ত্তন বিহারীরূপে সদা বর্ত্তমান।।" ইত্যাদি বন্দনা শেষ করিয়া "**আবার বল হরিনাম, আবার বল**" এই নাম ধরিলেন। ছয়জন প্রভুসন্তান নূতন বৃন্দাবনী বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক এক একখানি খুন্তি হাতে করিয়া কীর্ত্তনের অগ্রে অগ্রে গমন করিতেছেন। তৎপশ্চাতে বহু নিশানধারী ব্যক্তিগণ যাইতেছেন অপূর্ব্ব দৃশ্য! রাস্তার উভয় পার্শ্বে বিন্দুমাত্র স্থান নাই, চারিদিকে লোকে লোকারণ্য। বাবাজী মহাশয় সগণে নৃত্য ও কীর্ত্তন করিতে করিতে গিয়া বিডন গার্ডেনে উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্ব হইতেই বহু ভক্ত সংকীর্ত্তনের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। বাবাজী মহাশয়ের দর্শন পাইয়াই হরিধ্বনি করিতে করিতে সকলে আসিয়া সংকীর্ত্তনে যোগ দিলেন। দেখিতে দেখিতে চারিদিক হইতে বহু কীর্ত্তনের দল খোল করতাল যোগে নাম করিতে করিতে আসিয়া সংকীর্ত্তনের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল।

প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় বাগানে বেড়াইতেছিলেন।

সংকীর্ত্তন ধ্বনি শ্রবণে যেমন নিকট আসিলেন, অমনি বাবাজী মহাশয় উঁহাকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিলেন। প্রভুপাদের শরীর অসুস্থ থাকার দরুণ সংকীর্ত্তনের সঙ্গে যাইতে পারিলেন না। বাবাজী মহাশয় আবিষ্টভাবে পদ ধরিলেন—

বাঁধ রে বাঁধ কোমর সাজ রে যুদ্ধেতে।
শাসিব হরি নামে, নাশিব রাধা প্রেমে,
আছে যত অসুর জগতে॥
এবে অস্ত্র না ধরিব, প্রাণে কারেও না মারিব,
(আমার প্রভু নিত্যানন্দ বলে) হৃদয় শোধিব সবার প্রেমেতে॥
কলিরাজ যদি আসে, মাতাব নিতাই রসে,
ঘুরাব দেশ-বিদেশে তাহারে।
বিবেক বৈরাগ্য দিব, কলির দোষ না রাখিব,
নাম প্রেম বিলাইবে জগতে॥
(নিতাই দাসের অনুদাস হ'য়ে)
কাল কলি দমন হ'ল, নবগ্রহের দোষ গেল,
রাহু কেতু স্থির হল, নাম শুনে সবার মুখেতে
শনৈশ্চর হরি বলে, সূর্য্য নাচে বাহু তুলে,
ধন্য রে এই কলিকালে গৌরশশী জগতে॥
চিত্ত সন্দ তম গেল, মায়া পরাজয় হ'ল
বাহু তুলে ভাই হরি বল, মায়া গেল মায়া পুরেতে॥
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়, গুণত্রয় করি লয়
প্রেমের উদয়ে হৃদয়, মাতে রাধা ভাবেতে॥
দেব দেবী দেবত্ব ছাড়ি, হ'ল সব নরনারী,
(অভিমানে প্রেম মিলে না বলে)
ভজিয়ে গৌরহরি, সবাই চলে ব্রজেতে॥

ভুক্তি মুক্তি তুচ্ছ করি, সবে বলে গৌরহরি,
চাঁদ নিতাইয়ের পদ স্মরি, মগ্ন সবাই প্রেমেতে॥
আশ্রম সহ বর্ণ চারি, বালক বৃদ্ধ পুরুষ নারী,
সবাই প্রেমের অধিকারী, গৌরহরি বল ভাই মুখেতে॥
ম্লেচ্ছ যবন পশু পাখী, স্থাবর জঙ্গম নামে সুখী,
জগতে আর নাইক বাকি, নিতাই চাঁদের কৃপাতে॥
কি পাষণ্ড কিবা ভণ্ড, কি সুধীর কি দুর্দ্দণ্ড,
এড়াইতে যমদণ্ড, গৌরহরি বলে মুখেতে।।
হেলায় শ্রদ্ধায় নিলে নাম, পুরে ভাই মনস্কাম,
শুনেছ কি এমন নাম, আর কোন যুগে জগতে॥
স্বভাবের শোভা বলি, দন্তে দুই বাহু তুলি,
আর কতকাল হরি ভুলি, রবি রে ভাই ভ্রমেতে॥
সৃষ্টি কর্ত্তা ভগবান্, শক্তি দিয়ে জীব চালান,
শক্তি হ'লে অন্তর্দ্ধান, চৈতন্য নাই দেহেতে॥
হেন প্রভু পাশোরিয়ে, মায়ার দাসত্ব ল'য়ে;
দিবানিশি বিভোর হ'য়ে মত্ত সদা কামেতে॥
কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, ভক্তি, করিতে নাহিক শক্তি,
করিলেও ভুক্তি মুক্তি, স্পর্শ না পায় প্রেমেতে॥
কর্ম্মফলে গতাগতি, স্বর্গ অপবর্গ প্রাপ্তি,
জ্ঞানে অঙ্গকান্তি-প্রাপ্তি নির্ব্বাণ হয় জ্যোতিতে॥
যোগে ষড় চক্র ভেদে, কুণ্ডলিনী শক্তি যোগে,
জীব-আত্মা সহস্রারে, মিলায় পরমাত্মাতে॥
দেব বিধি অনুসারে, ভক্তি যাজন ক'রলে পরে,
শুদ্ধ ভক্তি লাভ ক'রে, (পায়) ঈশ্বর নিষ্ঠা মনেতে॥

চৌষট্টি অঙ্গেতে, নবধা ভক্তির পথে,
ভজিলে সে নন্দসুতে, স্বরূপ জাগে মনেতে॥
সৎ-চিৎ-আনন্দময়, কৃষ্ণের স্বরূপ হয়,
স্বরূপ-শক্তি প্রকাশ পায়, মধুর বৃন্দাবনেতে॥
অন্য পথে পাওয়া ভার, সাধ্য সাধনের পার,
স্বরূপ-শক্তি বিনে আর, কেহ না পায় জগতে॥
তাই হরি ব্রজ ছাড়ি, নবদ্বীপে অবতারি,
নাম ধরি গৌরহরি, চাঁদ নিতাইয়ের সঙ্গেতে॥
অযাচকে যেচে দেয়, (বলে) কে নিবি কে নিবি আয়,
মার খেয়ে প্রেম বিলায়, এমন কে আছে আর জগতে॥
যুগোচিত নাম ধর্ম্ম, নাম লইতে প্রেম মর্ম্ম,
প্রভুর সহিত কি সম্বন্ধ, জানায়ে দেয় নামেতে॥
সম্বন্ধ হইলে পরে, মন চলে ব্রজপুরে,
ভাবাবেশে রস ভরে, সেবা পাবে ব্রজেতে॥
পর-রসে হ'লে গতি, যুগলে হইবে মতি,
গোপী ভাবে দেহ স্মৃতি, যুগল-সেবায় কুঞ্জেতে॥
সাধনে ভাবিবে যাহা, সিদ্ধ দেহে পাবে তাহা,
আর কেন আহা আহা, কর রুচি নামেতে॥
নিতাই গৌর রাধে শ্যাম, হরে কৃষ্ণ হরে রাম,
উচ্চৈঃস্বরে ক'রে গান, ডুবে যাও ভাই ভাবেতে॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে,
হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে মুখেতে॥
শ্রীরাধা গোবিন্দ ভজিলে আনন্দ,
পূর্ণ পূর্ণ পূর্ণানন্দ, নাহি ইহার পরেতে॥

অদ্বয়-ব্রহ্ম-তত্ত্বসার, পরমাত্মার সুবিচার,
ভগবানের সারাৎসার, পাবি রে ভাই ব্রজেতে॥
রাধা-রাধারমণ-চরণ, সঙরিয়ে বলে চরণ,
নিতাই গৌর করি স্মরণ, চরণ দেও মোর শিরেতে॥
যদি আমায় চরণ দিবে, দাস নাম সার্থক হবে,
ভক্তি-শক্তির উদয় হবে, সেবা পাব কুঞ্জেতে (গোপীভাবে)॥

খুব মাতামাতি কীর্ত্তন—কাহারই বাহ্যস্মৃতি নাই। অতিবড় পাষণ্ডও কীর্ত্তনের মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র উদ্দণ্ড নৃত্য করিতেছে এবং দুইটী চোখের জলে মুখ বুক ভাসাইতেছে। লোকে লোকারণ্য! রাস্তায় গাড়ী ঘোড়া বা ট্রাম কিছুই চলিবার সাধ্য নাই, সমস্ত বন্ধ। কি যে এক অপূর্ব্ব মনপ্রাণমাতান গগনভেদী নামের ধ্বনি উত্থিত হইয়াছে, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিবার সাধ্য নাই। দোকানী পসারী সব দোকান পসার বন্ধ করিয়া নামে যোগ দিতে লাগিল। মুটে মোট মাথায় করিয়াই কীর্ত্তনে নাচিতেছে। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! যে যে অবস্থায় আছে, সে সেই অবস্থায় থাকিয়াই সংকীর্ত্তনের তালে তালে গা হাত পা দোলাইয়া দোলাইয়া প্রেমানন্দ উপভোগ করিতেছে। সংকীর্ত্তন ক্রমে বিডন স্ট্রীট, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট প্রভৃতি পার হইয়া ঠন্‌ঠনে মা সিদ্ধেশ্বরীর সম্মুখে উপস্থিত হইল। মা সিদ্ধেশ্বরীকে দর্শন করিয়াই বাবাজী মহাশয় কেমন একপ্রকার হইয়া গেলেন। প্রেমাবেশে ভূমিতে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। দুইটী চোখের জলে বুক ভাসিয়া যাইতেছে। চারিদিকে সহস্র সহস্র লোক, কিন্তু কেহই ইঁহাকে ধরিতে বা স্থির করিতে পারিতেছেন না। অনবরত ঠিক কুলাল চক্রের ন্যায় রাস্তার এ পাশ হইতে ও পাশ পর্য্যন্ত গড়াগড়ি দিতেছেন। বহুক্ষণ পরে কৌশলী ভক্তগণ ক্রমে ভিতরের জায়গা সংকীর্ণ করিয়া নানারূপ শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে একটু বাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া

পূর্ব্ববৎ নাম করিতে করিতে হ্যারিসন রোড দিয়া গঙ্গাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

হঠাৎ একটী লোক আসিয়া বাবাজী মহাশয়কে বলিল—"আজ্ঞে! সম্মুখে একটী মস্‌জিদ আছে, ও স্থান দিয়া কোনওরূপ গান কীর্ত্তন কিম্বা বাদ্যবাজনা লইয়া যাইতে দেয় না। প্রায় সর্ব্বদাই সে স্থানে অনেক মুসলমান দাঁড়াইয়া থাকে। যদি কেহ জোরপূর্ব্বক গমন করিতে চায়, তবে তাহাদের সহিত ভয়ানক লড়াই হইয়া থাকে।" শুনিবামাত্র বাবাজী মহাশয় বলিলেন—"নিতাইএর ইচ্ছায় তোমরা নাম বন্ধ না করিয়া চলিয়া যাও, তাঁহার কার্য্য তিনি. করিবেন" বলিয়া নিজে সংকীর্ত্তন-দল পরিত্যাগ পূর্ব্বক দৌড়াইয়া মস্‌জিদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া প্রথম একেবারে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করতঃ মস্‌জিদের প্রধান সেবাইত একটী প্রাচীন মোল্লার সহিত কোরাণ সরিপের কয়েকটী কথা অর্থাৎ কোনও ধর্ম্মের প্রতি দ্বেষভাব প্রকাশ করা যে কোন শাস্ত্রে নাই এবং হজরৎ মহম্মদের আচরণে বা উপদেশে পাওয়া যায় না—মুসলমানদিগের শাস্ত্র হইতে এই কয়েকটী কথা লইয়া মোল্লার সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। অন্যান্য মুসলমানগণ ঐ সমস্ত কথা শুনিয়া বিস্মিতভাবে বাবাজী মহাশয়ের প্রতি লক্ষ্য করিতে লাগিল। এ দিকে বহুজন-সমাকীর্ণ বিরাট সংকীর্ত্তন-সম্প্রদায় দশদিক্ কম্পিত করিতে করিতে মস্‌জিদের নিকট দিয়া চলিয়া গেল। কেহই কোন বাধা জন্মাইল না দেখিয়া দর্শকবৃন্দ অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বাবাজী মহাশয়ের শক্তির প্রশংসা করিতে লাগিলেন। সংকীর্ত্তনদল কিছু দূর গমন করিলে বাবাজী মহাশয় পূর্ব্ববৎ মস্‌জিদে প্রণাম পূর্ব্বক সকলের নিকট বিদায় চাহিলে, মুসলমানগণ অতিশয় প্রীতিভরে বাবাজী মহাশয়কে সেলাম করিলেন, ইনিও সকলকে সেলাম করিয়া নাচিতে নাচিতে গমন করিলেন। মোল্লা সাহেব এবং অন্যান্য মুসলমানগণ বাবাজী মহাশয়ের

অলৌকিক শক্তি-প্রভাব, সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়তা এবং নিরভিমানতা লইয়া সমালোচনা করিতে লাগিলেন।

এ দিকে সংকীর্ত্তন একেবারে গঙ্গার ধারে পুলের নিকট জগন্নাথ ঘাটে গিয়া উপস্থিত হইল। রাস্তার ঘাটে এবং পুলের উপর তিলার্দ্ধ স্থান নাই। লোকসকল যেন উন্মত্ত হইয়াছে। ধূলি-ধূসরিত এবং ঘর্ম্মাক্ত-কলেবরে কে কোথায় পড়িতেছে, কে কাহাকে ধরিতেছে, কিছুই ঠিক নাই।

বাবাজী মহাশয় বিভোরভাবে নৃত্য করিতেছিলেন, হঠাৎ কি মনে হইল—এক লম্ফে গঙ্গার জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। গঙ্গায় তখন পূর্ণ জোয়ার, ঘাট কানায় কানায় জলে পরিপূর্ণ। বাবাজী মহাশয় আবিষ্টভাবে আকণ্ঠ জলে নিমগ্ন করিয়া ঘাটের এপাশ হইতে ওপাশ যাইতেছেন, আর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এক একটী পয়ার পাঠ করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিতেছেন। সে এক অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা! আমরা বহুদিন বহু লোকের নিকট শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ব্যাখ্যা শুনিয়াছি—এমন কি বাবাজী মহাশয়ের মুখেও অনেকবার শুনিয়াছি; কিন্তু আজিকার এ ব্যাখ্যা যেন একেবারে নূতন এবং সর্ব্বচিত্তাকর্ষক। একটী বর্ণও যাঁহার কর্ণগোচর হইতেছে, তিনি বুঝুন চাই নাই বুঝুন; কিন্তু চিত্রপুত্তলীর ন্যায় দাঁড়াইয়া শুনিতেছেন। চারিদিক লোকে লোকারণ্য, কিন্তু নীরব এবং নিশ্চল। আবালবৃদ্ধযুবা স্ত্রী-পুরুষ সকলেই বিস্মিতভাবে বাবাজী মহাশয়ের মুখপানে তাকাইয়া আছেন। ইনিও নিরপেক্ষভাবে প্রাণ খুলিয়া উচ্চৈঃস্বরে নিতাই গৌরাঙ্গ তত্ত্ব এবং নিজ পূর্ব্বজন্মে কে ছিলেন ইত্যাদি তত্ত্ব সকল বলিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ এরূপভাবে কাটিয়া যায় দেখিয়া সঙ্গিগণ বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন—ভাবিলেন কি করা যায়। ঐরূপ তত্ত্বকথা বলিতে বলিতে যদি সাঁতার দিয়া গঙ্গার মধ্যে যান, তবে ত আর আমাদের ধরিবার সাধ্য থাকিবে না; সুতরাং এই সময় যাহা হয় বিধান

করিতে হইবে। হঠাৎ বিজয়দাদা এক লম্ফে গঙ্গায় নামিয়া বাবাজী মহাশয়কে উঠাইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বিজয়দাদা এমন ভাবে ইঁহার সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইতেছেন যে, ইনি না উঠিলেও অধিক জলে যাইতে পারিবেন না। ইচ্ছাময় কিছুক্ষণ থাকিয়া তীরে উঠিলেন। সঙ্গিগণ আর্দ্র ডোর কৌপীন বহির্ব্বাস গ্রহণ করিয়া নূতন ডোর কৌপীন দিলেন। ইনিও একটু মৃদু হাসিয়া ডোর কৌপীন পরিধানপূর্ব্বক নাম ধরিলেন।

এই সময় একটী ভদ্রলোক এক বস্তা বাতাসা লইয়া করযোড়ে বলিতে লাগিলেন—"বাবা! আমি বড় সাধ করিয়া এই বাতাসা কয়খানি আনিয়াছি। আমার মনের অভিলাষ যে, আপনি নিজ হাতে ছড়াইয়া দেন।" বাবাজী মহাশয় আনন্দচিত্তে সেই বাতাসায় হরির লুট দিতে লাগিলেন। সংকীর্ত্তন ক্রমে ঘাট ছাড়িয়া গঙ্গার ধারে ধারে উত্তর দিকে যাইতে লাগিল। হঠাৎ একটী লোক আসিয়া বলিল—"আজ্ঞে! একজন উকিলবাবু আবিষ্টভাবে রাস্তার পার্শ্বস্থ পোর্ট কমিশনারের রেললাইনের মধ্যে নৃত্য করিতেছেন। তাঁহার কিঞ্চিৎ মাত্র হুঁস নাই।" শুনিয়া বাবাজী মহাশয় একটী ভক্তকে আদেশ করিলেন উঁহাকে সংকীর্ত্তনের মধ্যে লইয়া আইস।" আদেশানুযায়ী আমরা কয়েকজনে বাবুটীকে ধরিয়া আনিলাম। ইনি হাওড়া কোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র দত্ত। সংকীর্ত্তনের মধ্যে আসিয়াও তিনি পূর্ব্ববৎ নৃত্য করিতে লাগিলেন। ক্রমে নিমতলা ষ্ট্রীটে মা আনন্দময়ীর সম্মুখে কিছুক্ষণ কীর্ত্তন করতঃ পুনরায় বিডনষ্ট্রীটে আসিলেন। রাত্রি প্রায় ৯টা, রাস্তার উভয়পার্শ্বেই থিয়েটার ঘরে খুব আলো জ্বলিতেছে। বারাঙ্গনাগণ লম্পট পুরুষদিগের সহিত রাস্তায় দাঁড়াইয়া নানারূপ হাস্য পরিহাস করিতেছিল। উহাদের উপর বাবাজী মহাশয়ের দৃষ্টি পড়িবা মাত্র ইনি সাশ্রুগদগদকণ্ঠে করুণস্বরে **গৌর হরি বোল** বলিয়া উহাদের দিকে **হরির লুট** ছড়াইয়া দিতে লাগিলেন। জানি না, নামের শক্তি, কি বাবাজী

মহাশয়ের ইচ্ছাশক্তি প্রভাবে উহারা স্ব স্ব আমোদ প্রমোদ পরিত্যাগ করিয়া **গৌরহরি বোল** বলিতে বলিতে ঐ বাতাসা কুড়াইতে লাগিল। কেহ বা অঝোর নয়নে ঝরিয়া কাঁদিতেছে; আবার কেহ কেহ বা সাশ্রুগদগদকণ্ঠে বলিতেছে "ধন্য মহাপুরুষ! আহা ইঁহাকে দেখিবামাত্র আমাদিগের ন্যায় মহাপাপিগণের হৃদয়েও যেন ভক্তিভাবের উদয় হয়। আহা মরি! এমন প্রাণমাতান গগনভেদী মধুর কণ্ঠধ্বনি ত আমরা আর কখনও শুনি নাই' ইত্যাদি। এরূপভাবে পাষণ্ড, ভণ্ড, চোর, লম্পট প্রভৃতি মহা মহাপাতকীদিগের হৃদয়েও প্রেমভক্তির বীজ প্রদানে দয়া প্রকাশপূর্ব্বক অনুমান রাত্র দশটার সময় দর্জ্জিপাড়া নয়ানচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীটে যোগেনমিত্রের বাড়ী গিয়া কীর্ত্তন সমাপ্তি করিলেন। যোগেনবাবু সগণে বাবাজী মহাশয়কে এবং উপস্থিত ভক্তগণকে নানারূপ সেবা শুশ্রূষা ও আদর অভ্যর্থনা দ্বারা পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন। যথাসময়ে সকলে মহাপ্রসাদ পাইয়া বিশ্রাম করিলেন এবং অন্যান্য ভক্তগণ নিজ নিজ বাসায় প্রস্থান করিলেন।

কয়েকটী লীলা।

যোগেনবাবুর বৈঠকখানায় অনেক রকম চিত্রপট আছে, উহার মধ্যে একখানি নরকের চিত্রও ছিল। জানি না, ইতিপূর্ব্বে ঐ চিত্রপটখানির উপর বাবাজী মহাশয়ের দৃষ্টি পতিত হইয়াছে কি না। আজ যেন কি ভাবে উহার উপর নজর পড়িল। যোগেনবাবুকে বলিলেন—"যোগেন! ঐ চিত্রপটখানি একবার খুলিয়া আনত।" যোগেনবাবু শশব্যস্তে চিত্রপটখানি খুলিয়া ইঁহার হাতে দিবামাত্র ইনি ঠিক বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন—"ধন্য কলি যুগের অশেষ পাপের পাপী, দুর্ব্বল কলিহত জীবগণের

উদ্ধারের জন্য পরমদয়াল পতিতপাবন নিতাই-গৌরাঙ্গের অবতার! ইহাতেও যদি এত জীব নরকে যায়, তবে আর জীব উদ্ধার হইল কৈ? নামাভাসে মুক্তি হয়, এ কথাই বা কিরূপে বুঝিব?" শ্রীহরিদাস ঠাকুর বলিয়াছেন—'স্থাবর দেহ পর্য্যন্ত নামের ধ্বনিতে মুক্তি পাইবে। আর কেন?" বলিয়া ঐ চিত্রপটখানি মধ্যস্থলে বসাইয়া "ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।" খোল করতাল যোগে এই নাম করিয়া চারিদিক পরিক্রমা করিতে লাগিলেন, আর কাতর প্রাণে নিতাইচাঁদকে এরূপ ভাবে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন যে, শুনিয়া পাষাণ পর্যন্ত দ্রবীভূত হয়। উপস্থিত ভক্তগণ সকলেই রোদন পরায়ণ; সকলেই একবাক্যে বলিতেছেন—"আহা মরি কি করুণা! দেখ দেখ চিত্রপটখানির কি রূপ অবস্থা হইয়াছে।" বাস্তবিকই চিত্রপটখানির তাৎকালিক অবস্থা দেখিয়া সকলেই মোহিত। অঙ্কিত মূর্ত্তিগুলির দিকে চাহিলেই বোধ হয়—যেন তাহারা স্বকৃত কর্ম্মের জন্য কাতর প্রাণে প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে। প্রভু যেন মুক্তকণ্ঠে উহাদিগকে অভয় প্রদান-পূর্ব্বক উহাদিগের গন্তব্য স্থানে প্রেরণ করিতেছেন।

বহুক্ষণ কীর্ত্তনের পর বাবাজী মহাশয় **জয় নিত্যানন্দ রাম** বলিয়া চিত্রপটখানি বক্ষে ধারণ করতঃ যোগেনবাবুকে বলিলেন—"দেখ, নিতাই চাঁদের কৃপায় ইহারা উদ্ধার হইয়া গেল। সকলেই ইহাদিগকে প্রণাম কর।" বলিবামাত্র সকলেই বিশেষ ভক্তিসহকারে বাবাজী মহাশয়কে এবং ঐ চিত্রপটখানিকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। যোগেনবাবু তখন সাশ্রুগদগদকণ্ঠে বলিলেন—"বাবা! আমার কি গতি হইবে? আমার বাড়ির চিত্রপটস্থ নরকের জীবগণ পর্য্যন্ত উদ্ধার হইয়া গেল। আপনার শ্রীমুখে পাষাণ গলান মনপ্রাণ মাতান ভুবনমঙ্গল নাম শ্রবণ করিয়া ঘোর পাষণ্ডের পর্য্যন্ত হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া গেল, কিন্তু আমি যে নরকের কীট তাহই রহিলাম। আমার পাষাণ হৃদয় দ্রবিল না,

মনপ্রাণ মাতিল না, এত দেখিয়া শুনিয়াও প্রাণে ভয়ের সঞ্চার হইল না। কৃতপাপের জন্য একদিনও ব্যাকুল-প্রাণে আপনার শ্রীচরণে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে পারিলাম না। পরকালের গতির বিষয় চিন্তা করিয়া একদিনও চোখে একবিন্দু জল আসিল না। প্রভু! আমার কি উপায় হইবে একবার আদেশ করুন।" বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। বাবাজী মহাশয় উঁহাকে উঠাইয়া দৃঢ় আলিঙ্গন দানে কৃতার্থ করতঃ বলিলেন—"ভয় কি"? বাবু! পরম দয়াল নিতাই-গৌরাঙ্গ-অবতারে কেহই বাকি থাকিবে না। তাঁহারা কাহারই বাসনা অপূর্ব রাখিবেন না। নাম কর। তাঁহাদের অঙ্গীকৃত জীবের কি কখনও দুর্গতি হইতে পারে?"

যোগেন। নাম করিতে পারিলে ত তাঁহারা দয়া করিবেন! আমি যে ঘোর অবিশ্বাসী, নামে রুচি মাত্রই নাই; আমাকে উদ্ধার করিবার জন্য আপনি অযাচিত ভাবে কতই না কৃপা করিতেছেন; কিন্তু আমার কিছুতেই কিছু হইতেছে না। নাম করিতে আরম্ভ করিব মনে হইলেই যেন আলস্য এবং নানারূপ বাজে চিন্তা আসিয়া মনের মধ্যে উদয় হয়। এরূপভাবে নাম করাও যা না করাও তাই।

বাবাজী। দেখ নাম সম্বন্ধে কোনো বিচার করিবার দরকার নাই, একাগ্রতা আসুক আর নাই আসুক, শ্রীগুরুদেব নাম করিতে আদেশ করিয়াছেন, নাম করিয়া যাও; ভাল মন্দ বিচার গুরুদেবেরই হাতে।

যোগেন। আগে একাগ্রতা এবং রুচি জন্মিলে তবে ত নাম করিবার দরকার! কারণ অনেকের মুখে শুনা যায় যে যদি একাগ্রতা সহকারে রুচিপূর্ব্বক নাম করা না হয়, তবে যে নাম করিয়া কোনও লাভ নাই।

বাবাজী। বেশ কথা! যাঁহারা এই সিদ্ধান্ত করেন, তাঁহাদিগকে আমি জিজ্ঞাসা করি যে এই ঘোর কলিযুগে আমাদের ন্যায় দুর্ব্বল, মায়ামুগ্ধ ও চঞ্চলচিত্ত

জীবগণের একাগ্রতা জন্মাইবার একমাত্র নাম ভিন্ন অন্য কোনও উপায় কেহ স্থির করিতে পারিয়াছেন কি? পরমদয়াল পতিতপাবন, কলিযুগের একমাত্র ত্রাণকারী, শ্রীমন্মহাপ্রভুর যুক্তিপূর্ণ এই সিদ্ধান্ত বোধ হয় একবাক্যে সকলেই স্বীকার করিবেন। তিনি বলিয়াছেন—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যাথা।"
হর্ষে প্রভু কহে শুন স্বরূপ রামরায়।
নাম সংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়।।
নাম সংকীর্ত্তন হইতে সর্ব্বপাপ নাশ!
সর্ব্ব শুভোদয় কৃষ্ণে পরম উল্লাস।।
সংকীর্ত্তন হইতে পাপ সংসার নাশন
চিত্তশুদ্ধী সর্ব্ব ভক্তি সাধন উদ্‌গম।।
কৃষ্ণ প্রেমোদ্‌গম প্রেমামৃত আস্বাদন।
কৃষ্ণ প্রাপ্তি সেবামৃত-সমুদ্রে মজ্জন।।
খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
কাল দেশ নিয়ম নাই সর্ব্ব সিদ্ধি হয়।।

এ কথা তোমাদিগকে নিতাইচাঁদ এ নরাধমকে উপলক্ষ্য করিয়া অনেকবার বলিয়াছেন। তাই বলি, মনে দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া রাখ যে—যেমন পিত্ত-দূষিত জিহ্বায় মিশ্রির সরবৎ তিক্ত লাগে; কিন্তু আবার সেই সরবৎ খাইতে খাইতেই যেমন পিত্তের দোষ দূর হইয়া যায় এবং সেই সরবৎই খুব মিষ্টি লাগে, সেইরূপ নাম করিতে করিতেই সর্ব্বানর্থ নাশ হইয়া নামে রুচি এবং একাগ্রতা জন্মিবে।

যোগেন। আচ্ছা, নামের নিকট অপরাধ হইলে কিসে খণ্ডন হয়?

বাবাজী। শাস্ত্র বলেন—"ভূমৌ স্খলিতপাদানাং ভূমিরেবাবলম্বনম্। ত্বয়ি জাতাপরাধানাং ত্বমেব শরণং প্রভো॥" যাঁহার কাছে অপরাধ, একমাত্র তাঁহার কৃপা ভিন্ন উহার খণ্ডন হইতে পারে না। নামাপরাধ খণ্ডন করিতে হইলে অবিরত নাম করা চাই।

এইরূপ ভাবে নানাবিধ উপদেশ দানে সকলের মানসিক সন্দেহ ভঞ্জন করিতেছেন, এই সময় আনটুনী বাগানের শ্রীযুক্ত বাবু তিনকড়ি নন্দী মহাশয় আসিয়া রাত্রে তাঁহার বাড়ী সংকীর্ত্তন করিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলে, বাবাজী মহাশয় সানন্দে স্বীকার করিলেন। সঙ্গিগণের মধ্যে কেহ কেহ—কাল বিরাট সংকীর্ত্তনে ইঁহার অনেক পরিশ্রম হইয়াছে এবং শরীরও ভাল ছিল না, একারণ আজ রাত্রে বিশ্রাম হউক, এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে গেলে, ইনি তাহাতে বিরক্তি প্রকাশ করিয়া হৃষ্টচিত্তে তিনকড়িবাবুর বাড়ীর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। সন্ধ্যা হইতে না হইতে সেখান হইতে গাড়ী আসিল গাড়ীতে উঠিয়া যথাসময়ে উঁহাদের বাড়ীতে পৌছিয়াই সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। সংকীর্ত্তনে খুব আনন্দ হইতে লাগিল। অনেক ভদ্রলোক নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। রাত্র প্রায় এগারটা পর্য্যন্ত সকলেই নীরব ও নিশ্চলভাবে সংকীর্ত্তন শুনিয়া পরমানন্দিত হইলেন। যথাসময়ে কীর্ত্তন সমাপ্তি করিয়া মহাপ্রসাদ গ্রহণ পূর্ব্বক সদলে দর্জ্জিপাড়ায় আগমন করিলেন।

পরদিবস প্রাতে ইণ্টালী কাঁঠালবাগানের শ্রীযুক্তহরিদাস বাবাজী মহাশয় আসিয়া তাঁহার বাড়ী যাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করায়, বাবাজী মহাশয় স্বীকৃত হইয়া পরদিন ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। হরিদাস বাবাজীও পরদিবস ভোরেই গাড়ীর ব্যবস্থা করিয়া সকলকে নিজ বাড়ী লইয়া গেলেন। জানি না, ইতিপূর্ব্বে আর কখনও বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে হরিদাদার দেখা শুনা ছিল কি না। আজ কিন্তু দেখা হইবামাত্র সগোষ্ঠী হরিদাদা ইঁহার শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ

করিলেন। বাবাজী মহাশয়ও যেন কতকালের পরিচিতের ন্যায় উঁহার সহিত ব্যবহার করিতে লাগিলেন। হরিদাদা পদকীর্ত্তন এবং খোল বাজনায় বড়ই পটু। অতি সুমধুর কণ্ঠে যখন শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা, প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা এবং প্রেমানন্দ দাস ঠাকুরের মনঃশিক্ষা প্রভৃতি কীর্ত্তন করেন, তখন মনে হয়—যেন পাষাণও দ্রবীভূত হয়। অতি বড় পাষণ্ডও হরিদাদার সংকীর্ত্তন শুনিয়া চোখের জলে বুক ভাসাইয়া দেয়।

বাবাজী মহাশয় স্নানাদি করিয়া সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। সে এক অপূর্ব্ব আনন্দ! বহু বহু শিক্ষিত ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন; কিন্তু এমন কেহই নাই—যিনি কাঁদিয়া অধীর না হইতেছেন। বহুক্ষণ কীর্ত্তনের পর অধিক বেলা হওয়ায় ভক্তগণের প্রার্থনা অনুসারে কীর্ত্তন সমাপ্তি করিয়া মহাপ্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিলেন। সন্ধ্যার পরে আবার সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। কিছুক্ষণ কীর্ত্তন করিয়া হরিদাদাকে বলিলেন—"হরিদাস! তুমি ত বেশ কীর্ত্তন কর। একটী পদ গাও ত" আজ্ঞা পাইয়া হরিদাদা প্রেমানন্দ ভরে পদ ধরিলেন—

একই গৌর-প্রেয়সী নারী। অন্য নায়িকারে কহিছে ঠারি॥
অনেক অদত্তা-তনয়া ঘরে। কেমন ওদন রোচয়ে তোরে॥
মতি কুলবতী তনয়া বড়। (গৌর) বিশ্বম্ভর-সনে সম্বন্ধ কর॥
কুল শীল, গুণ অসীম রূপ। বিদ্যা বিদগ্ধ রসিক ভূপ॥
কন্যা দেহ তারে এসব জানি তোমার তনয়া হইবে রাণী॥
ভাব রত্নহার দিবেক নাথ। রাগ পদ্মরাগ মণির সাথ॥
অশ্রু, কম্প, স্বেদ, পুলক, হাসি। পরাবে সাত্ত্বিক মুকুতা রাশি॥
কৃষ্ণ গুণময় কুণ্ডল দিবে। কীর্ত্তন কঙ্কন ভূষণ হবে॥
হরিনামামৃত খাইতে পাবে। আদর চন্দন ভগতে দিবে॥

করুণ বসন গৌর দিলে। মলিন না হবে কোনই কালে॥
চৌষট্টি মহান্ত গোপাল বার। এসব কুটুম্ব হইবে তোর॥
অদ্বৈত নিতাই মাধব-সুত। শ্রীবাস প্রভৃতি এ পঞ্চ তত্ত্ব॥
এরা সব আপন করিয়া লবে। শ্রীগুরুবৈষ্ণব মিলিবে ঘরে॥
অষ্ট সিদ্ধি নব নিধি যে আছে। ভুক্তি মুক্তি পড়ি রহিবে নাছে॥
কৃষ্ণানন্দ কহে শুন গো মাই। ইহার অধিক সম্বন্ধ নাই॥

প্রায় দেড় ঘণ্টা কাল আবিষ্ট ভাবে এই পদটী কীর্ত্তন করিলেন। বাবাজী মহাশয় এক একবার মধুর নৃত্য করিতেছেন, আর চোখের জলে মুখ বুক ভাসিয়া যাইতেছে। আনন্দের আর অবধি নাই। হরিদাদার অভাবনীয় এক একটী আখর স্ফূর্তি পাইতেছে, আর উপস্থিত ভক্তগণ যেন আনন্দ-সাগরে ভাসমান হইতেছেন। এইরূপে পরমানন্দে সে রাত্রি কাটিয়া গেল।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়াই হরিদাদা বাবাজী মহাশয়ের শ্রীচরণ ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"দেখুন, আমি দীক্ষা মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছি; কিন্তু আমার প্রাণে বড়ই অভিলাষ জন্মিয়াছে যে, আপনার নিকট শিক্ষা গ্রহণ করি। নিতাই গৌরাঙ্গ মন্ত্র আমি পাই নাই। আপনি কৃপা করিয়া এই সমস্ত প্রদান পূর্ব্বক আমার সংসার-বন্ধন মোচন করুন। আমি উপাসনা সম্বন্ধে কিছুই জানি না। আজ হইতে আমি সগোষ্ঠী আপনার হইলাম। আপনি দয়া করিয়া আমাদের মানব-জীবনের কর্ত্তব্য আদেশ করুন এবং যাহাতে আপনার আদেশ অনুযায়ী চলিতে পারি, সেইরূপ শক্তি প্রদান করুন। আজ পর্য্যন্ত আমার মানসিক অভাব দূর করিবার লোক পাই নাই; কিন্তু আপনার দর্শন পাইবামাত্রই আমার সমস্ত অভাব দূর হইয়া হৃদয়ে পূর্ণ শান্তি লাভ করিলাম।" ইত্যাদি কত যে কাতরোক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কে তাহা নির্ণয় করিবে? বাবাজী মহাশয় জলদ গম্ভীর স্বরে 'নিতাই চাঁদের ইচ্ছা' বলিয়া স্নান আহ্নিক শেষ করতঃ

কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। খুব মাতামাতি কীর্ত্তন হইতে লাগিল। সকলেই বিভোর, কীর্ত্তন প্রভাবে সকলেই যেন গৌরাঙ্গলীলা প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে লাগিলেন। বাবাজী মহাশয় এই শুভ মুহূর্তে হরিদাদার মনোভিলাষ পূর্ণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতা ইন্‌ষ্টিটিউসনের শিক্ষক শ্রীযুক্ত অপরাপ্রসাদ পাল প্রভৃতি অনেকের মন্ত্র হইল। সকলেই প্রেমানন্দে বিভোর হইলেন। ইঁহারাও যথাসময়ে সংকীর্ত্তন সমাপ্ত করিয়া মহাপ্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিলেন।

এইরূপ পরমানন্দে কাঁটালবাগানে হরিদাদার বাড়ীতে তিনদিন বাস করিলেন। হরিদাদার ইচ্ছা যে, আরও কয়েক দিন সগণে বাবাজী মহাশয়কে বাড়ীতে রাখিয়া এই অপ্রাকৃত চিন্ময় আনন্দ উপভোগ করেন। কিন্তু বাবাজী মহাশয়ের সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অমত। ইঁহার স্বাভাবিক বৃত্তি এই যে, যে স্থানে কোনরূপ প্রতিষ্ঠার গন্ধ উপস্থিত হইবে, তৎক্ষণাৎ সে স্থান পরিত্যাগ করা চাই আজও তাহাই হইল। হরিদাদা যতই অনুরোধ করিতেছেন, বাবাজী মহাশয় ততই একটা না একটা ওজর আপত্তি করিয়া পাশ কাটাইতেছেন। হঠাৎ খেলাচ্চন্দ্র ইন্‌ষ্টিটিউসনের হেড্‌মাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু সুরেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বাড়ীতে সংকীর্ত্তন করিবার জন্য তিনি বিশেষ অনুরোধ করিলে, বাবাজী মহাশয় স্বীকৃত হইয়া সেই দিনই সন্ধ্যার পর তাঁহার বাড়ীতে সংকীর্ত্তন করিতে গমন করিলেন। সুরেশবাবু একজন সুপণ্ডিত এবং বিখ্যাত লোক; সুতরাং বহু শিক্ষিত লোক উপস্থিত হইয়াছে। বাবাজী মহাশয় উপস্থিত হইয়াই কীর্ত্তন ধরিলেন।

আজিকার কীর্ত্তন কোনও লীলা বা ভক্তি সম্বন্ধ লইয়া নয়; আজ কেবল তত্ত্ববিচার, ষড়্‌দর্শনের সহিত ইংরেজী দর্শনের ঐক্যমত সম্পাদন। কোনও দর্শনই যে নিরীশ্বরবাদী নহেন, এইটি শাস্ত্র এবং যুক্তি অনুসারে সুর তাল

সহযোগে কীর্ত্তনের মধ্যে সকলকে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। উপস্থিত ইংরাজী শিক্ষিত ভদ্রলোক সকল এই অশ্রুতপূর্ব্ব সংকীর্ত্তন শুনিয়া একেবারে বিস্মিত হইয়া গেলেন। সংকীর্ত্তনের মধ্যে যে এইরূপ সরল ভাষায় প্রশ্নোত্তর উত্থাপন পূর্ব্বক দার্শনিক তত্ত্ব সকল সুমীমাংসিত হইতে পারে, ইতিপূর্বে ইঁহারা কেহই ইহা ধারণা করিতে পারেন নাই। এমন কি, সংকীর্ত্তন আরম্ভের পূর্ব্বে কাহারও কাহারও ধারণা ছিল যে, বৈরাগী বৈষ্ণবদিকের কীর্ত্তন হয়ত দান, মান, মাথুর প্রভৃতির লীলাকথা লইয়া, উহা আবার শুনিব কি? কিন্তু ইঁহার কীর্ত্তন শুনিয়া তাঁহারা একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। বহুক্ষণ কীর্ত্তনের পর কীর্ত্তন সমাপ্তি করিয়া যেমন বাবাজী মহাশয় বসিলেন, অমনি একটি ভদ্রলোক বলিলেন—"আজ্ঞে! আমার একটি কথা জিজ্ঞাস্য ছিল, যদি আপনি অনুমতি করেন ত বলিতে পারি।"

বাবাজী। স্বচ্ছন্দে বল বাবা! কোনই আপত্তি নাই।

ভদ্রলোক। আচ্ছা কীর্ত্তনে আপনি বলিলেন—"কোন দর্শনই নিরীশ্বরবাদী নহে"—এই কথাটি আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম না। বহুদিন, হইতে আমরা শুনিয়া আসিতেছি যে, ছয়টি দর্শনের মধ্যে কোনটি শব্দবাদী, কোনটি পরিণামবাদী, কোনটি নিরাকারবাদী, কোনটি বা প্রকৃতিপুরুষবাদী, এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মত ছয় জনে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু আপনি বলিলেন—"সকলেরই এক মত এবং সকলেই ঈশ্বরবাদী। তাই আমার মনে বড়ই সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে।

বাবাজী। আচ্ছা বাবা! ন্যায়, বেদান্ত, সাংখ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতি ছয়টি শাস্ত্রকে দর্শন শাস্ত্র বলিয়া তোমরা স্বীকার কর ত?

ভদ্রলোক। আজ্ঞে হ্যাঁ, তাহা স্বীকার করি বই কি?

বাবাজী। তবেই বুঝিয়া দেখ বাবা! দর্শন শব্দের ধাতুপ্রত্যয়গত অর্থ হইল—

"দৃশ্যতে ভগবৎস্বরূপং যেন তৎ দর্শনম্।" এই দর্শন শব্দটি বিশেষ্য। যখন ইহা শাস্ত্রের বিশেষণ হইবে, তখন —"দৃশ্যতে নিশ্চীয়তে অনুমীয়তে বা ভগবৎস্বরূপ যেন তৎ।" আর যখন ইন্দ্রিগত হইবে, তখন—"দৃশ্যতে প্রত্যক্ষীক্রিয়তে যেন তৎ।" ছয়টি দর্শনের অর্থ ছয়টি পন্থা। যেমন দূরতরস্থ কোনও বস্তুর সান্নিধ্য লাভ করিতে হইলে—নৌকা, রেল, পাল্কী, ঘোড়াগাড়ি, ব্যোমযান প্রভৃতি নানা উপায় অবলম্বনে গমন করা যায়। কিন্তু গন্তব্যস্থান বা লক্ষস্থান এক; তদ্রূপ যে যে পথই অবলম্বন করুন না কেন, গন্তব্যস্থান বা লক্ষ্যস্থান একমাত্র ভগবান্।

শিক্ষিত ভদ্রলোকগণ দর্শন শব্দের যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা শুনিয়া বড়ই সুখী হইলেন এবং সকলেই একবাক্যে বলিতে লাগিলেন—"আজ আমরা আপনার মুখে কীর্ত্তন শুনিয়া যে কতদূর আনন্দিত হইলাম, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা অসাধ্য। অতি কঠিন দার্শনিক গুরুতর বিষয়গুলির এমন প্রাঞ্জল ভাষায় যুক্তিপূর্ণ মীমাংসা আমরা আজ পর্য্যন্ত আর কখনও শুনি নাই বা শুনিব বলিয়াও মনে হয় না। আপনি কৃপা করুন—যেন আপনার মুখে যাহা যাহা শুনিলাম, সেই সমস্ত হৃদয়ে ধারণ করিতে পারি।

শুনিয়া বাবাজী মহাশয় বলিলেন,—"বাবা! আমাকে বলা বৃথা; আমি যন্ত্রবিশেষ, পরম দয়াল নিতাইচাঁদ যন্ত্রী। তিনি যখন যে রাগিণী, যে তাল মান বাজাইতে ইচ্ছা করিতেছেন, তাহাই বাজিতেছে। যখন তিনি ইচ্ছা না করেন, আমার একটি বর্ণও উচ্চারণ করিবার সাধ্য থাকে না। যদি বাক্যগুলি তোমাদের হৃদয়গ্রাহী বা মানসিক সন্দেহ ভঞ্জনকারী হইয়া থাকে, তবে নিতাইচাঁদকে জানাও এবং কায়মনোবাক্যে তাঁহাকে ধন্যবাদ দাও।" শুনিয়া সকলেই বলিলেন—"আজ্ঞে! সে কথা আপনি বলিতে পারেন। আমরা ত দেখি—আপনিই আমাদের মনের ভাব অবগত হইয়া তদনুযায়ী উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক

আমাদিগকে কৃতার্থ করিলেন।” ইত্যাদি নানারূপ কথোপকথনে বহুক্ষণ কাটিয়া গেল। যথাসময়ে মহাপ্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক সকলে বিশ্রাম করিলেন।

পরদিন ফড়িয়াপুকুর নিবাসী শ্রীযুক্ত তারাচাঁদবাবু তাঁহার নিজ বাড়ীতে সংকীর্ত্তন করিবার জন্য সদলে বাবাজী মহাশয়কে লইয়া গেলেন। তারাচাঁদবাবু নিজে একজন মহাত্মা। শুনা যায় যে, তিনি যখন আবিষ্ট হন, তখন তাঁহার সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা হইয়া থাকে। সে স্থানে উপস্থিত হইয়াই সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। সংকীর্ত্তনে বাবাজী মহাশয়ের আবেশ হইল। আবেশে অনেকরূপ তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া পরে হরিদাদাকে একটি গান করিতে আদেশ করিলে, হরিদাদা পদ ধরিলেন—

ও মন কি করে বরণ কুল।
কোন কুলে কেন, জনম না হউক, কেবল ভকতি মূল॥
কপি-কুলে ধন্য, বীর হনুমান, শ্রীরাম ভকতরাজ।
রাক্ষস হইয়া, বিভীষণ বৈসে, ঈশ্বর সভার মাঝ॥
দৈত্যের ঔরসে, প্রহ্লাদ জনমি, ভারতে রাখিলা যশ।
স্ফটিক-স্তম্ভেতে প্রকট নরহরি' হইয়া যাহার বশ॥
চণ্ডাল হইয়া, মিতালী করিল, গুহক-চণ্ডাল-বরে।
বল না কি কুল, বিদুরের ছিল, খাইল যাহার ঘরে॥
দেখ না কিবা সাধন করিল, গোকুলে গোপের নারী।
জানিহ সর্ব্বথা, না হয় অন্যথা, সে হরি, যে ভজে তারি॥
শ্রীকৃষ্ণ ভজনে, সবে অধিকারী, কুলের গরব নাই।
কহে প্রেমানন্দ, যে করে গরব, নিতান্ত মুরুখ ভাই॥

গানটিতে প্রায় দেড়ঘণ্টা পরমানন্দে কাটিয়া গেল। উপস্থিত আবাল-বৃদ্ধযুবা স্ত্রীপুরুষ সকলেই গান শ্রবণে বিমুগ্ধ হইলেন। শ্রীশ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে আন্তরিক

শ্রদ্ধাভক্তি বা বিশ্বাস থাকিলে অতি অল্প দিনের মধ্যেও যে শ্রীগুরুদেবের চিত্তবৃত্তি বা মানসিক বৃত্তি অবগত হইতে পারা যায়, ইহার সাক্ষাৎ দৃষ্টান্ত হরিদাদা। হরিদাদা আজ কয়দিন মাত্র মন্ত্রগ্রহণ পূর্ব্বক শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার মধ্যেই বিশেষ অন্তরঙ্গ হইয়া পড়িলেন। যখন তখনই হরিদাদাকে বাবাজী মহাশয় গান করিতে বলিবামাত্র তিনি এমন একটি গান করেন যে, উহা বাবাজী মহাশয়ের চিত্তাকর্ষক হইয়া থাকে। ইঁহার তাৎকালিক মনোভাবানুযায়ী কথাগুলি গানের পদে প্রকাশ হইবামাত্রই ইনি হৃষ্টচিত্তে ভাগ্যবান্ হরিদাদাকে আলিঙ্গনদানে কৃতার্থ করিতে লাগিলেন। হরিদাদা গান ও খোল বাজনায় বিশেষ পারদর্শী; সুতরাং বাবাজীমহাশয় প্রায়ই বলেন যে, হরিদাস এবং রামদাস একসঙ্গে থাকিয়া নাম কীর্ত্তন করিলে জগতে একটি বিশুদ্ধ মাধুর্য্য ভাবের বিকাশ হইবে সন্দেহ নাই। ক্রমে সংকীর্ত্তন সমাপ্তি করিয়া তারাচাঁদবাবুর সহিত পরস্পর প্রেমালিঙ্গনে পরিতৃপ্ত হইয়া উহার বিশেষ আগ্রহ ও যত্নে মহাপ্রসাদ গ্রহণ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিলেন। তারাচাঁদ বাবুর বিশেষ ইচ্ছা যে, বাবাজী মহাশয় সেদিন সগণে উঁহার বাড়ীতেই অবস্থান করেন; কিন্তু বাবাজী মহাশয়ের আর যেন শহরের মধ্যে বাস করিতে তত ভাল লাগিল না। বহুলোকের আগ্রহাতিশয় থাকিলেও, মিষ্ট বাক্যে সকলের মনস্তুষ্টি বিধান করতঃ সগণে কাশীপুর শ্রীরসিকবাবুর বাগানে গমন করিলেন। সাধু মহাত্মাগণ প্রতিষ্ঠাকে বড়ই ভয় করিয়া থাকেন—বিশেষতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ী মহাত্মাগণের ত কথাই নাই। তাঁহারা বলেন—"অভিমানং সুরাপানং, গৌরবং শুদ্ধরৌরবম্। প্রতিষ্ঠা শূকরীবিষ্ঠা, ত্রয়ং ত্যক্ত্বা হরিং ভজেৎ।।" প্রভু কিন্তু পরীক্ষা করিতে কাহাকেও ছাড়েন না। যে ব্যক্তি প্রতিষ্ঠার ভয়ে দূরে লুক্কায়িত থাকিতে ইচ্ছা করেন, ভগবদিচ্ছায় প্রতিষ্ঠাও নানারূপ কৌশলে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া থাকে। বাবাজী মহাশয় প্রতিষ্ঠার হাত হইতে মুক্তি পাইবার মানসে নিজে পাগল

সাজিয়া কতই কি না স্বতন্ত্রতার ভান দেখাইতে লাগিলেন; কিন্তু বস্ত্রাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-মিশ্রিত লীলা খেলা সব প্রকাশ হইয়া পড়িতে লাগিল দেখিয়াই, যেন একটু চিন্তান্বিত ভাবে চার পাঁচ দিন কাটাইলেন। হঠাৎ একদিন সঙ্গিগণকে বলিলেন—দেখ, বহুদিন একস্থানে থাকা কোনও মতে যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না। কিছুদিন একটু ভ্রমণ করা প্রয়োজন হইয়াছে।" ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় পাইকপাড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত হীরালালবাবু তাঁহার বাড়ীতে সংকীর্ত্তন করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ করিতে লাগিলে, বাবাজী মহাশয় শীঘ্রই রসিকবাবুর বাগান পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাইকপাড়া হীরালালবাবুর বাড়ীতে গমন করিলেন।

যথাসময়ে সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। লোকে লোকারণ্য। যাত্রা, থিয়েটার, রসকীর্ত্তন বা নামসংকীর্ত্তনাদি অনেকেই শুনিয়াছেন; কিন্তু নূতন ধরণের কীর্ত্তন শ্রবণে এবং মহাপুরুষের ভাবপ্রেমমাখান ব্যবহারে পাইকপাড়ানিবাসী আপামর সাধারণ বিমুগ্ধ হইলেন। হীরালালবাবুর ভক্তি ব্যাকুলতায়ই হউক অথবা মহাপুরুষের শক্তিপ্রভাবেই হউক, সংকীর্ত্তনে অপার আনন্দ হইতে লাগিল। সকলেই প্রেমোন্মত্তভাবে নৃত্য করিতে লাগিলেন, কাহারই বাহ্যস্মৃতি নাই। আগন্তুক ভক্তগণ প্রথমে দাঁড়াইয়া কীর্ত্তন শুনিতেছিলেন, হঠাৎ চুম্বকাকৃষ্ট লৌহের ন্যায় সংকীর্ত্তনের মধ্যস্থলে গিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। অতি বড় পাষণ্ডের কর্ণেও যেমন একবার নামের ধ্বনি প্রবেশ করিতেছে—অমনি সে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আসিয়া কীর্ত্তনে যোগ দিতে লাগিল। এইরূপে বহুক্ষণ কীর্ত্তন হইতে লাগিল। আজকার কীর্ত্তন এত ভাল লাগিয়াছে যে, কাহারই ছাড়িবার মন হইতেছে না। তথাপি ভক্তগণের শ্রম অবগত হইয়াই যেন সকলের অনিচ্ছাসত্ত্বেও সংকীর্ত্তন সমাপ্ত করিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রামান্তে মহাপ্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক সেই স্থানেই অবস্থান করিলেন।

বহুদিন পূর্ব্ব হইতে রায় বাহাদূর শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়

তাঁহার বাগানে কিছুদিন অবস্থান করিবার জন্য বাবাজী মহাশয়কে বিশেষ অনুরোধ করিতেছেন। তিনি সর্বদাই বলেন—"গুরুদেব! আপনার নিজস্থান ছাড়িয়া অপর জায়গায় থাকিবার প্রয়োজন কি? সে ত আমার বাগান নহে—সে আপনারই বাগান, আপনি ইচ্ছামত ব্যবহার করিবেন।" জানি না, ইচ্ছাময়ের কি অভিপ্রায়! রায় বাহাদুর বলিবা মাত্রই ইনি একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"বাবা! সে ত আমার নিজ স্থান, যখন ইচ্ছা হইবে যাইব।"

পরদিবস প্রভাতে উঠিয়া রওনা হইবেন, কিন্তু হীরালালবাবু কিছুতেই ছাড়িলেন না; সুতরাং মধ্যাহ্নে হীরালালবাবুর বাড়ীতে মহাপ্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক বেলা অনুমান তিনটার সময় নাম করিতে করিতে রওনা হইয়া রায় বাহাদুরের বাগানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বাগানবাড়ীতে রক্ষক প্রহরিগণ সমস্তই নূতন; সুতরাং প্রথমে তাহারা ইঁহাদিগকে বাবুর হুকুমের অপেক্ষা করিয়া নিষেধ করতঃ বলিল—"আজ্ঞে! আমরা চাকর, বাবুর হুকুম না হইলে কি করিয়া কি করি? আপনারা একটু অপেক্ষা করুন, আমরা এই মুহূর্ত্তেই তাঁহাকে সংবাদ দিই" বলিয়া একজন রায় বাহাদুরকে সংবাদ দিতে গেল। এদিকে বাবাজী মহাশয় রান্নাবাড়ীতে প্রবেশ করিয়া সঙ্গিগণকে বিশ্রাম করিতে আদেশ করতঃ নিজে বাগানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সে রাত্রে কোনরূপ আহারাদির ব্যবস্থা করিতে নিষেধ করিলেন।

পরদিন প্রভাত হইতে না হইতেই প্রসন্নবাবুর কনিষ্ঠ পৌত্র কয়েকজন ধীবরকে সঙ্গে লইয়া বাগানের পার্শ্বস্থ খালে মাছ ধরিবার জন্য আসিলেন। অবশ্য তিনি জানেন না যে, বাবাজী মহাশয় বাগানে আসিয়াছেন। জেলেরা জাল লইয়া জলে নামিয়াছে, এই সময় একজন লোক বাবাজী মহাশয়কে গিয়া বলিল—"আজ্ঞে! জেলেরা মাছ ধরিতে আসিয়াছে, নিষেধ করিব কি? বাবাজী মহাশয় বলিলেন—"দেখ, উহারা ব্যাধ, উহারা কি কাহারও সদুপদেশ গ্রাহ্য

করে? আচ্ছা, ভাবিবার কোনই প্রয়োজন নাই; যদি নিতাই চাঁদের কৃপায় তোমাদের মনে হিংসাবৃত্তি না থাকে, তবে তোমরা বাগানে থাকা পর্য্যন্ত কখনই জীবহিংসা হইবে না। কারণ শাস্ত্রে বলিয়াছেন—"অহিংসাপ্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ সর্ব্ববৈরত্যাগ।।" সে বলিল—"আজ্ঞে! খালের এপার ওপার ঘেরা জাল টানিতে আরম্ভ করিয়াছে, উহাতে কি কোনও একটি প্রাণী বাদ পড়িতে পারে?" বাবাজী মহাশয় একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"আচ্ছা, নিতাইচাঁদ কি খেলা খেলান একবার দেখাই যাক্ না কেন" বলিয়া সেই খালের নিকট গিয়া বসিলেন।

এ দিকে জেলেরা খালের এপাশ হইতে ওপাশ পর্য্যন্ত জাল টানিয়া গেল; কিন্তু একটি মাছও জালে পড়িল না দেখিয়া কেহ কেহ বলিতে লাগিল—"এতে মাছ নাই, মিছামিছি পরিশ্রম করিলে কি হইবে চল যাওয়া যাক।" অন্যান্য সকলে বলিল—"এখানে মাছ নাই এ অসম্ভব কথা! বেশ মনোযোগের সহিত আর একবার টান দিয়া দেখা যাক্।' বলিয়া আবার জাল নামাইল দুই চারি হাত যাইতে না যাইতেই মৎস্যগণ প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়া চতুর্দ্দিকে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক ধীবরগণের আশার সঞ্চার করিতে লাগিল। ধীবরগণ পরমানন্দিত চিত্তে জাল টানিয়া তীরে উঠাইয়া দেখে একটি মৎস্যও জালে নাই। সকলেই বিস্মিত ভাবে পরস্পর, বলাবলি করিতে লাগিল—"এ কি আশ্চর্য্যের বিষয়! এত মাছ থাকিতে একটিও ধরা পড়িল না। কি উপায় করা যায়? এতটা পরিশ্রম বৃথা হইবে?" উহাদের মধ্যে নানারূপ বাদ-প্রতিবাদ চলিতে লাগিল। কেহ বলিল, জালের নীচে ফাঁক ছিল, সমস্ত মৎস্য নীচে দিয়া পলাইয়াছে। কেহ বা বলিল, এক পার্শ্বে কিঞ্চিৎ ফাঁক ছিল উহা দিয়া সমস্ত মৎস্য চলিয়া গিয়াছে। ইত্যাদি ভাবে সকলেই নিজ নিজ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে লাগিল; কিন্তু ইহার ভিতরে যে কোনওরূপ ঐশ্বরিক ব্যাপার বা

মহাপুরুষের শক্তিপ্রভাব রহিয়াছে, অনুভবহীন হিংসাবৃত্তিপরায়ণ ব্যক্তিগণ তাহার কিঞ্চিৎ মাত্রও অনুভব করিতে পারিল না। বরঞ্চ বিপরীত ভাবে জেদ করিয়া পুনর্ব্বার জাল নামাইল। বাবাজী মহাশয় উঠিয়া রান্নাবাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করতঃ সঙ্গিগণকে সেস্থান হইতে রওনা হইবার উদ্যোগ করিতে বলিলেন। এদিকে বেলা অনুমান সাড়ে ৮টার সময় জেলেরা জাল তুলিয়া দেখে—মাছ ত উঠেই নাই, অধিকন্তু জালের অনেক স্থান ছিন্নভিন্ন হইয়াছে। সকলেই ক্ষুব্ধচিত্তে "আজিকার যাত্রা ভাল নয়, অকারণ পরিশ্রান্ত এবং ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইল" ইত্যাদি অনুতাপসূচক বাক্য প্রয়োগ করিতে করিতে চলিয়া গেল। ইঁহারাও নাম করিতে করিতে সেস্থান হইতে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী গমন করিলেন।

বেলা অতিরিক্ত হইয়াছে, সঙ্গে মহাপ্রভুর চিত্রপট রহিয়াছে। কোথায় রাখা হইবে বা ভোগ দেওয়া হইবে, সঙ্গিগণ এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, হঠাৎ বাবাজী মহাশয় বলিলেন—"দেখ, মা অন্নপূর্ণার ঐ মন্দিরে মহাপ্রভুকে রাখ এবং পৃথক ভাবে ভোগ রান্না করাইয়া মহাপ্রভুর ভোগের ব্যবস্থা করা হউক্।" প্রথমতঃ মায়ের সেবকগণ একটু আপত্তি করিলেন; কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর মূর্ত্তি দর্শন করিয়া এবং বাবাজী মহাশয়ের মুখে নানারূপ কথাবার্ত্তা শুনিয়া উঁহাদের মন নরম হইল। বিশেষ সতর্কতার সহিত বিশুদ্ধ ভাবে মহাপ্রভুর উদ্দেশ্যে রান্না করিয়া তাঁহাকে ভোগ দেওয়া হইল। এদিকে ইঁহারা স্নানাহ্নিকাদি শেষ করতঃ মহাপ্রভুর মহাপ্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিলেন।

সেদিন মায়ের বাড়ীতেই থাকা হইল। সন্ধ্যা আরতির পর বাবাজী মহাশয় নামকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। অপূর্ব্ব আনন্দ! শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকসকল সমকালীন পরমানন্দ লাভ করিতে লাগিলেন। সকলেই পরস্পর বলাবলি করিতেছেন—"আমরা কত পাঠ, সংকীর্ত্তন, বক্তৃতা

প্রভৃতি শুনিয়াছি, কিন্তু সংকীর্ত্তনে এরূপ সমন্বয় আর কখনও শুনি নাই। প্রত্যেক কথাটিই শাস্ত্র, যুক্তি এবং সিদ্ধান্ত-সম্বলিত মীমাংসা পরিপূর্ণ।" কেহ বা বলিতেছেন—"ভাই! নামের কথা ত দূরে-আমার বিশ্বাস, যে একবার ঐ সিদ্ধ মহাত্মার মুর্ত্তিখানির দর্শন পায়, তাহার হৃদয়ে সমস্ত পাপ তাপ অশান্তি দূরে যায় এবং সে পরম শান্তি-সাগরে নিমগ্ন হয়।" কেহ বলিতেছেন—"ভাই! কেবল দর্শনেই যে কৃতার্থলাভ হইবে, এমন কোন কথা নাই। কারণ, সাক্ষাৎ ভগবান্ বা তাঁহার পরিকরগণ যুগে যুগে অবতার গ্রহণ পূর্ব্বক অসুরাদি বিনাশ, ধর্ম্ম সংস্থাপন এবং নাম প্রেম বিতরণ প্রভৃতি করিয়া থাকেন। ঐ সময় আপামর সাধারণ সকলেই উহাদিগকে প্রত্যক্ষ ভাবে দর্শন স্পর্শন করিয়া থাকেন, কিন্তু যাহার প্রতি কৃপাকটাক্ষ হয়, তিনিই কৃতার্থতা লাভ করেন অন্যান্য ব্যক্তির সেরূপ হইতে পারে কি? তাই বলি মহতের কৃপাই মূল।" ইত্যাদি যাঁহার যেরূপ মনের ধারণা তিনি সেইরূপ বলিতেছেন। যথাসময়ে সংকীর্ত্তন সমাপ্তি করতঃ মহাপ্রভুকে কিছু মিষ্টি ও জলখাবার ভোগ দিয়া সেই প্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক সকলে বিশ্রাম করিলেন।

পরদিবস প্রাতে দক্ষিণেশ্বর হইতে কুঠিঘাট গমন করিলেন। কুটিঘাটায় উপস্থিত হইয়াই সকলের মন হইল যে কয়েক দিন এই স্থানে অবস্থান করিলে ভাল হয়; সুতরাং একটি বাড়ি ভাড়া করা প্রয়োজন। যদি বাবাজী মহাশয়ের আদেশ হয় ত সেইরূপ চেষ্টা করা যাউক, বলিয়া ইহাকে জিজ্ঞাসা করায় ইনি একটু মৃদু হাসিয়া সকলের প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন। একটি বাড়ি ভাড়া করা হইল। সকলেই বিশেষ উদ্যোগের সহিত ঠাকুরের ভোগ রান্নার যোগাড় করিতে লাগিলেন। বাবাজী মহাশয় বাহিরের ঘরে বসিয়া আছেন। বাসার নিকটবর্ত্তী একটি দোকানীকে ভোগের দ্রব্যের বিষয় জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল—"আজ্ঞে! এ স্থানে কাঠ ব্যতীত আর সমস্তই পাওয়া যাইবে।" বাবাজী

মহাশয় বাহিরের ঘরে বসিয়া সমস্ত শুনিতেছেন। ইত্যবসরে গ্রামবাসী একটি সাধারণ লোক সেই রাস্তা দিয়া যাইতেছিল; ইনি তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন—"বাবা! কাঠ কোথায় পাওয়া যায় তুমি জান কি?" লোকটি ইহাকে প্রণাম করিয়া বলিল—"আজ্ঞে! এখান হইতে একটু দূরে গেলে পাওয়া যায়।" শুনিয়া ইনি একজনকে একটি টাকা ঐ লোকটিকে দিতে বলিয়া বলিলেন—"বাবা! তুমি এই টাকাটি নিয়া কিছু কাঠ আনিয়া দাও ত?" লোকটি একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া টাকাটি গ্রহণপূর্ব্বক চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ যায় লোকটি আসিতেছে না দেখিয়া সঙ্গীগণ বলিতে লাগিলেন, "আজ্ঞে! কোথাকার অপরিচিত লোককে টাকা দেওয়া হইল, সে কি আর আসিবে? গরীব মানুষ, সে হয়ত টাকাটি লইয়া নিজের সংসার খরচ করিয়াছে।" বাবাজী মহাশয় একটু ব্যঙ্গভাবে বলিলেন—"আপনারা অর্ন্তয্যামী বৈষ্ণব, সকলের অন্তরের খবর জানিতে পারেন। আমার ত আর সে ক্ষমতা হয় নাই যে আমি লোক চিনিব। যাহা হউক, আপনাদের উপার্জ্জিত অর্থ নষ্ট হইল এই দুঃখ।" সকলেই ইহার কথায় বিশেষ লজ্জিত হইলেন।

ইত্যবসরে সেই লোকটি অপর আর একটি লোকের সঙ্গে উভয়ে কাঠের বোঝা মাথায় করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। আসতে একটু বিলম্ব হইয়াছে বলিয়া লোকটি খুব দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলে, বাবাজী মহাশয় "সমস্ত নিতাইচাঁদের ইচ্ছা" এই বলিয়া উহাকে প্রবোধ দিয়া কিঞ্চিৎ অর্থ লইবার জন্য বলিলে, সে করযোড়ে বলিল—"আজ্ঞে আমার পরম সৌভাগ্য যে, আপনাদের সেবার কিঞ্চিৎ আনুকূল্য করিতে পারিলাম। তাহাতে আবার পয়সার কথা বলিয়া দাসকে এত বিড়ম্বনা করিবেন না।" বলিয়া দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক চলিয়া গেল। তখন বাবাজী মহাশয় সঙ্গিগণকে বলিলেন—"কি রকম ভবিষ্যৎবেত্তা অন্তর্য্যামী প্রভুপাদগণ! কাঠ আসিল? এত সংকীর্ণ বুদ্ধি

লইয়া ভগবৎরাজ্যে বাস করা চলে কি? আচ্ছা বল দেখি, এই এক সঙ্গে তোমরা যতগুলি লোক আছ, তোমাদিগকে যদি প্রথম সাক্ষাৎ সময় অপরিচিত সুতরাং অবিশ্বাসী বোধে পরিত্যাগ করা হইত, তবে কি তোমরা এত অদ্বিতীয় বিশ্বাসের পাত্র হইতে পারিতে? আবার ভাবিয়া দেখ, এই যে টাকাটা উহাকে দিওয়া হইয়াছিল ঐ টাকা কি আমার বা তোমাদের উপর্জ্জিত সম্পত্তি? এতগুলি লোক একত্র অবস্থান করিতেছ, তোমাদের প্রয়োজনীয় ব্যাপার নির্ব্বাহের জন্য পরম দয়াল নিতাইচাঁদ তোমাদের নিকট যাহা উপস্থিত করিতেছেন, ইহার স্বত্বাধিকারী তোমরা নও, এটা স্থির ভাবে বোঝা দরকার। তাঁহার দত্ত বস্তুর কর্ত্তা বা মালিক তিনি। তাঁহার বস্তু দ্বারা তিনি যদি অপর কোন ব্যক্তির অভাব মোচন করিবার ইচ্ছা করেন, সে বিষয়ে তোমার আমার বাধা দিবার কোন অধিকার আছে কি? এরূপ কুৎসিত বুদ্ধি পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা কর। নতুবা প্রেমময়ের প্রেমরাজ্যে অগ্রসর হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। ভাবিয়া দেখা, এই দুই প্রহর বেলায় সূর্য্যের প্রখর উত্তাপে কত কষ্ট সহ্য করিয়া যে লোকটী তোমাদের উপকারের জন্য নিঃস্বার্থভাবে নিজে মাথায় বহিয়া এক টাকায় প্রায় দুই টাকার কাঠ আনিয়া দিল, তোমরা কিনা তাহার বিমিনয়ে তাহাকে চোর সাব্যস্ত করিয়া কতকগুলি অযথা বাক্য প্রয়োগ করিলে? তুমি আমি কিছুনা বুঝিতে পারি; কিন্তু অন্তর্য্যামী প্রভুত সকলের অন্তরের ভাব অবগত আছেন! তাঁহার সংসারে বাস করিয়া এত সন্দিগ্ধচিত্ত হইলে চলিবে কেন?" ইত্যাদি নানারূপ উপদেশপূর্ণ ভর্ৎসনা-বাক্যে সঙ্গিগণকে শিক্ষা প্রদানপূর্ব্বক মহাপ্রভুর ভোগরান্নার যোগাড় করিতে বলিয়া স্নানাদি করিতে গমন করিলেন। যথাসময়ে ঠাকুরের ভোগ রান্না হইতে লাগিল। এদিকে বাবাজী মহাশয় স্নানাদি করিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। মধ্যাহ্নকীর্ত্তন প্রায়ই একত্র বসিয়া সম্পন্ন হয়। আজ তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াই

এক লম্ফে উঠিয়া সুমধুর নৃত্য করিতে লাগিলেন। যেন আনন্দের পাথার বহিয়া যাইতে লাগিল। অসময়ে অপূর্ব্ব মনপ্রাণমাতান গগনভেদী সংকীর্ত্তনধ্বনি শ্রবণে চতুর্দ্দিক্ হইতে অনেক লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রায় দুই ঘণ্টা কাল খুব মাতামাতি কীর্ত্তন হইল। কীর্ত্তনান্তে যথাসময়ে মহাপ্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিলেন।

এইরূপে দুই তিন দিন যায়, একদিন সঙ্গিগণকে ডাকিয়া বলিলেন—"দেখ, তোমরা এই স্থানে থাক, আমি দুই চার দিন একটু বেড়াইয়া আসি।" উহারা প্রথমে সঙ্গে যাইবার জন্য বিশেষ জেদ করিতে লাগিল, ইনি মিষ্ট বাক্যে সকলকে প্রবোধ দিয়া, কৈলাসচন্দ্র সেন, সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং ফণী এই তিনজনকে সঙ্গে লইয়া গুরপ যাত্রা করিলেন। বহুদিন পূর্ব্বে একবার গুরপে প্রায় মাসাবধি কাল বাস করিয়া গিয়াছেন; সুতরাং বহুলোকের নিকট ইনি সুপরিচিত। রাস্তায় ইহার দর্শন পাইবামাত্র অনেকে তাহাদের বাড়ী লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ আগ্রহ করায় ইনি হাসিমুখে সকলকে আশ্বস্ত করতঃ হীরালালবাবুর বাড়ীতে গিয়া সেদিনকার মত বিশ্রাম করিলেন। হীরালালবাবুর পরিজনবর্গ পরমানন্দের সহিত নানাবিধ দ্রব্যে ঠাকুরের ভোগ লাগাইয়া ইহাদের সেবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। ইতিপূর্ব্বে বাবাজী মহাশয় যখন গুরপে আসিয়াছিলেন, তখন হইতে কুলিনগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত রসিক বাবুর বিশেষ আগ্রহ যে; একবার বাবাজী মহাশয়কে তাঁহার নিজ বাড়ীতে লইয়া যান। কিন্তু এত দিন আর সে সুযোগ ঘটিয়া উঠে নাই, এবার বিশেষ আগ্রহ করায় তিনি চারি দিন গুরপে থাকিয়া কুলীন গ্রামে রসিকবাবুর বাড়ী গমন করিলেন। রসিকবাবুর আন্তরিক ভক্তি এবং যত্নাগ্রহে সকলেই বিমোহিত হইলেন। একদিন অপরাহ্নে রসিক বাবু মনে মনে ভাবিতেছেন যে, যদি বাবাজী মহাশয় সদলে আসিতেন, তবে ইহার শ্রীমুখের কীর্ত্তন শুনিয়া মনের সাধ মিটাইতাম। কতদিনে

যে আমার সে আশা পূর্ণ হইবে, বাঞ্ছাকল্পতরু প্রভুই জানেন। এইরূপ মনে মনে ভাবিতেছেন, এদিকে বাবাজী মহাশয় ফণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“তোমাদের সঙ্গে করতাল আনিয়াছ কি?” ফণী বলিল—“আজ্ঞে! দুই যোড়া আনা হইয়াছে।” বলিয়া বাহির করিলে, ইনি একটু মৃদু হাসিয়া নাম আরম্ভ করিলেন। রসিকবাবু স্থানান্তরে বসিয়া একটু ভাবিতেছিলেন, হঠাৎ নামের ধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র প্রফুল্ল হৃদয়ে বাবাজী মহাশয়ের নিকট আসিয়া দেখেন—ইনি কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছেন। রসিকবাবুর প্রাণে আনন্দ আর ধরে না। এক পার্শ্বে বসিয়া কীর্ত্তন শুনিতেছেন, আর অঝোর নয়নে ঝুরিতেছেন। কীর্ত্তনের আকর্ষণে চারিদিক হইতে অনেক লোক আসিয়া কীর্ত্তনে যোগ দিতে লাগিল। ইচ্ছাময়ের কি ইচ্ছা, তিনিই জানেন। খোল নাই বা সঙ্গিগণ সঙ্গে না থাকায় কীর্ত্তনের যে কোনওরূপ অঙ্গহানি বা আনন্দের ব্যাঘাত, তাহা কিছুই হইল না। কুলীনগ্রামবাসী আবালবৃদ্ধ স্ত্রীপুরুষ সকলেই বিভোর ভাবে কীর্ত্তন শুনিতেছেন, আর পরস্পর বলাবলি করিতেছেন যে, “কোনওরূপ বাজনা নাই বা তিনটি বই সঙ্গী সঙ্গে নাই, তাহাতেই এত আনন্দ! না জানি সমস্ত যোগাযোগ থাকিলে আরও কত আনন্দ হইত। আহা মরি কি মনপ্রাণমাতান কণ্ঠধ্বনি। কিবা পদের মাধুরী। অশ্রু, কম্প, পুলক প্রভৃতি যেন ইহার দেহের ভূষণ স্বরূপ হইয়াছে। এমন অপূর্ব্ব প্রেম ত আমরা আর কখনও দেখি নাই” ইত্যাদি যাহার যেরূপ ধারণা, সে সেইরূপ সমালোচনা করিতে লাগিল।

যথাসময়ে সংকীর্ত্তন সমাপ্তি করিলে পর, রসিকবাবু গিয়া বাবাজী মহাশয়ের শ্রীচরণে দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্ব্বক নিজ-মনের সঙ্কল্প এবং অন্তর্য্যামিত্ব শক্তিপ্রভাবে নিজের সমস্ত বাসনা পূর্ণ করার দরুণ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে লাগিলেন। ইনি কিন্তু প্রতিষ্ঠার ভয়ে সমস্ত ভার একমাত্র নিতাইচাঁদের উপর ন্যস্ত করতঃ নিজে খালাস পাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রসিকবাবু তখন করযোড়ে

গদগদকণ্ঠে বলিলেন—"আজ্ঞে! আপনি যাহাই বলুন না কেন, আপনি আশীর্বাদ করুন, আমার মনে যে ধারণা জন্মিয়াছে তাহা যেন স্থায়ী থাকে। আর একটি প্রার্থনা—যদি আজ্ঞা হয়, তবে সঙ্গীগণকে আনাইয়া সদলে কিছুদিন এই স্থানে এ ভক্তিহীন পাষণ্ডদিগকে একটু সংশোধন করিয়া দয়াময় নামের সার্থকতা সম্পাদন করুন।" বাবাজী মহাশয় বলিলেন—"এ যাত্রা শ্রীধাম নবদ্বীপ হইয়া পুরী যাইবার জন্য মনে বড় ইচ্ছা হইয়াছে। নিতাইচাঁদ করেন ত পুনরায় সকলকে লইয়া একবার আসা যাইবে, সম্প্রতি থাক্।" রসিকবাবু আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না। অন্ততঃ এই অবস্থাতেই আর কয়েকদিন থাকিবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অনুরোধে অগত্যা আরও দুইদিন কুলীনগ্রামে থাকিয়া সকলকে আবার আসিবার আশায় আশান্বিত করিয়া সেই স্থান হইতে রওনা হইয়া সাতগাছিয়া শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল গোস্বামী মহাশয়ের বাড়ি গমন করিলেন।

শ্রীগুরুদেবের শুভাগমনে কুঞ্জদাদা গোষ্ঠী সহিতে একে বারে আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন। বাবাজী মহাশয় বলিলেন—"কুঞ্জ! চল সর্ব্বাগ্রে তোমাদের শ্রীমদনগোপাল জীউকে দর্শন করাও; তারপর অন্যান্য ব্যবস্থা।" কুঞ্জদাদা শশব্যস্তে ইহাদিগকে সঙ্গে লইয়া শ্রীমদনগোপাল জীউর দর্শন করাইলেন। বাবাজী মহাশয় মদনগোপাল জীউর সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম এবং নানাবিধ প্রার্থনা করতঃ যথাসময়ে মহাপ্রসাদ গ্রহণ পূর্ব্বক কিঞ্চিত বিশ্রাম করিলেন। এইরূপে সেইদিন গেল। পরদিবস প্রাতে উঠিয়াই কুঞ্জদাদাকে বলিলেন—"দেখ, কুঞ্জ! জানি না শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শনের জন্য মন বড়ই উৎকণ্ঠিত হইয়াছে। চল একবার মহাপ্রভুর দর্শনে যাওয়া যাক্।"

কুঞ্জ। আজ্ঞে! দুই একদিন এস্থানে বিশ্রাম করিয়া গেলে ভাল হইত নাকি?

বাবাজী। নিতাইচাঁদের ইচ্ছায় কালনা হইতে আসিয়া পরে যাহা হয় হইবে।

এই বলিয়া নাম করিতে করিতে রওনা হইলেন। যথাসময়ে কালনা শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাড়ী উপস্থিত হইয়া শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গের সম্মুখে বহুক্ষণ নৃত্য কীর্ত্তন করতঃ সেস্থান হইতে রওনা হইবেন, এই সময় মহাপ্রভুর সেবাইত গোস্বামী মহাশয় মহাপ্রসাদ পাইবার জন্য বিশেষ জেদ করিতে লাগিলে মধ্যাহ্নে মহাপ্রভুর মহাপ্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক সিদ্ধ ভগবান দাস বাবাজী মহাশয়ের সমাধি দর্শন করিতে গমন করিলেন।

নাম করিতে করিতে সমাধিস্থানে উপস্থিত হইয়াই বাবাজী মহাশয়ের মনে কি ভাব হইল, ইনিই জানেন—ঠিক বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। ভাবুকের প্রাণের অবস্থা, সেই ভাবের ভাবুক না হইলে কে বুঝিবে? প্রায় আধঘণ্টা ইনি ঠিক সমান ভাবে রোদন করিতেছেন। উপস্থিত লোক সকল চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় ইহার দিকে লক্ষ্য করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন! ক্ষণকাল পরে ইনি একেবারে সাষ্টঙ্গে ভূমিতে পতিত হইলেন। অশ্রু, কম্প, পুলক প্রভৃতি সাত্ত্বিক বিকারগণ ইঁহার শরীর বিকাশ পাইতে লাগিল—আনন্দোফুল্ল হৃদয়ে উঠিয়া বসিলেন। ইত্যবসরে শ্রীযুক্ত বিষ্ণুদাস বাবাজী মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইবামাত্র বাবাজী মহাশয় উহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। তিনি ইঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া ঠাকুরের নাট মন্দিরে গিয়া উভয়ে নানারূপ ইষ্টগোষ্ঠী করিতে লাগিলেন। সে রাত্রে নামব্রহ্মের বাড়ীতেই সকলের অবস্থান হইল। বিষ্ণুদাস বাবাজী মহাশয় কিছুদিন নামব্রহ্মের বাড়ীতে থাকিবার জন্য ইঁহাকে বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিলেন, ইনি সময়ান্তরে আসিবার অঙ্গীকার করতঃ এ যাত্রা বিদায় প্রার্থনা করিলে, অগত্যা সে-বেলা মহাপ্রসাদ পাইবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। মহাত্মার অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া মধ্যাহ্নে নামব্রহ্মের মহাপ্রসাদ গ্রহণ পূর্ব্বক অপরাহ্নে পুনর্ব্বার সাতগাছিয়ায় প্রত্যাগমন করিলেন। তথায় একদিন থাকিয়া নৌকাযোগে শ্রীধান নবদ্বীপ গমন করিলেন।

শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ দর্শন পাইবামাত্র দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। শ্রীগুরুদেবও প্রিয় শিষ্যকে বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক শান্তিসাগরে নিমগ্ন হইলেন। কিছুক্ষণ নানাবিধ কুশল প্রশ্ন রূপ ইষ্টগোষ্ঠী করিয়া শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞানুসারে গঙ্গাস্নানাদি সমাপন করতঃ মহাপ্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক বিশ্রাম করিলেন।

বাবাজী মহাশয় নবদ্বীপে আগমন করিয়াছেন শুনিয়া, বহুলোক আনন্দোৎফুল্ল হৃদয়ে ইঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন। ইনিও সকলের সহিত নানাবিধ ভগবৎপ্রসঙ্গ দ্বারা সকলের সংশয় ছেদন করিতে লাগিলেন। নবদ্বীপ-নিবাসী শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় মহাশয়ের জেষ্ঠ্য পুত্র শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস রায় মহাশয় আসিয়া বলিলেন—"দাদা! শ্রীগৌরাঙ্গদেবের ত অনেক রকম ভাবের লীলা দেখা যায়। যাঁহারা ব্রজের বিশুদ্ধ মাধুর্য্য ভাবের উপাসক, তাঁহাদের পক্ষে কোন্ লীলাটি বিশেষ ভাবে আস্বাদ্য বা হিতকর, এইটি আমাকে বিশদভাবে বুঝাইয়া দিতে হইবে।"

বাবাজী। ভাই! এই বাবা রহিয়াছেন, কর্ত্তা বাবাজী মহাশয় রহিয়াছেন, ইঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, ইঁহারা বুঝাইয়া দিবেন।

ধর্ম্মদাস। আমি সকলকেই জিজ্ঞাসা করিতেছি। অনুগ্রহ পূর্ব্বক যিনি হউন, আমার মনের সংশয় দূর করিয়া দিন।

কর্ত্তা বাবাজী। বাবা; তুমিই বেশ করিয়া উঁহাকে বুঝাইয়া দাও, আমরা সকলেই শুনিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করি।

বাবাজী। বাবা! নিতাই গৌরাঙ্গ সর্ব্বতত্ত্বময়। এমন কোনও ভাব হইতে পারে না যাহা শ্রীগৌরাঙ্গের নাই; তবে অবশ্য ভাবের তারতম্য আছে বটে। "ভাবনিধি শ্রীগৌরাঙ্গের ভাবের শাবল্য। সব ভাব হইতে রাধা ভাবের প্রাবল্য।।" যাঁহারা নিজ সিদ্ধ দেহে গোপীভাব আরোপ করিয়া রাধাগোবিন্দ-লীলায় প্রবেশ করিতে বসিয়াছেন, তাঁহারা যদি শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে রাধারাণী

মনে না করেন, তাঁহাদের লীলায় প্রবেশ করা বিশেষ কষ্টকর হইবে না কি? তিনি নিজে ভক্ত ভাব অঙ্গীকার করিয়া জগতের আদর্শ হইয়াছিলেন। পূর্ব্বলীলা অপেক্ষা উত্তর লীলার মাধুর্য্যাধিক্য, একথা স্বীকার করিতে হইবে।

ধর্ম্মদাস। কথাটী আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম না, একটু ভাল করিয়া বলিতে হইবে।

বাবাজী। শ্রীগৌরাঙ্গদেব শ্রীধাম নবদ্বীপে অবস্থানকালে যে ভাব আস্বাদন করিতে পারেন নাই, অর্থাৎ নবদ্বীপস্থ অনেক ভক্ত তাঁহাকে যে চোখে দেখিত বা যে ভাবে আস্বাদন করিত, সেইটী তাঁহার নিজের অভিপ্রেত না হওয়ার দরুণই তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নীলাচলে গম্ভীরায় অবস্থান পূর্ব্বক স্বরূপ দামোদর এবং রামানন্দ রায়কে সঙ্গে করিয়া একান্তে নিজ ভাব আস্বাদন করিয়াছেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পরবর্ত্তী লীলাসকলই ভক্তগণের বিশেষ প্রীতিকর এবং আস্বাদ্য।

'মহাপ্রভুর সন্ন্যাস' এই কথাটী ইঁহার গুরুদেব এবং কর্ত্তা বাবাজী মহাশয়ের তত প্রীতিকর বোধ হইল না।

কর্ত্তা বাবাজী মহাশয় বলিলেন—"দেখ বাবা! রসরাজ শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস কথাটী ভবিতে বা বলিতে তোমাদের কষ্ট বোধ হয় না কি? আমরা কিন্তু সন্ন্যাস-টন্ন্যাস মানি না। আমাদের নাগরেন্দ্র চূড়ামণি রসময় গৌর কিশোরের—

ধবল পাটের যোড় পরেছে, রাঙ্গা রাঙ্গা পাড় দিয়েছে,
চরণ উপর দুলে যেছে কোঁচা।
বাঁক-মল সোনার নূপুর, বেজে যেছে মধুর মধুর
রূপ দেখিতে ভুবন মূরছা।।
দীঘল দীঘল চাঁচর চুল, তায় গুঁজেছে চাঁপার ফুল,
কুঁদ-মালতীর মালা বেড়া ঝোঁটা।
চন্দন মাখা গোরা গায়, বাহু দোলায়ে চলে যায়,
কপাল মাঝে ভুবন মোহন ফোঁটা।।

বাহুর হেলন দোলন দেখি, হাতির শুণ্ড কিসে লিখি,
নয়ান বয়ান যেন কুঁদে কোঁদা।
মধুর মধুর কয় গো কথা, শ্রবণ মনের ঘুচায় ব্যথা,
চাঁদে যেন উগারয়ে সুধা।।

এইরূপ ছাড়া অন্য রূপ আমরা মানি না বা স্বীকার করি না।

বাবাজী। বাবা! যদি আমার অপরাধ গ্রহণ না করেন, তবে আমি দুই একটী কথা বলিতে ইচ্ছা করি।

কর্ত্তা বাবাজী। সে কী বাবা! ভগবৎলীলা-প্রসঙ্গ গুরু শিষ্যে বাদানুবাদ করিয়া বুঝাই প্রয়োজন। ইহাতে কি অপরাধ হইতে পারে?

বাবাজী। শ্রীগৌরাঙ্গ-অবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য—নিজেকে আস্বাদন করা। যথা—শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কিদৃশো বানয়ৈবাস্বাদ্যো। যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ। সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ।।" অর্থাৎ শ্রীরাধিকার প্রণয়-মহিমা কিরূপ, শ্রীরাধিকা যে প্রেম দ্বারা আমার মাধুর্য্যাতিশয় আস্বাদন করেন, সেই মাধুর্য্যটী কিরূপ এবং আমাকে উপভোগ করিয়া শ্রীরাধিকা যে সুখানুভব করেন, সেই সুখটীই বা কিরূপ, এই তিনটী বাঞ্ছা শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে উদয় হওয়াতে দেখিলেন যে, শ্রীরাধিকার ভাব অঙ্গীকার না করিলে আমার এই বাঞ্ছা পূরণ হইতে পারে না। কারণ—

"বিষয় জাতীয় সুখ আমার আস্বাদ।
আমা হইতে কোটিগুণ আশ্রয়ের আহ্লাদ।।
কভু যদি এই প্রেমার হইয়ে আশ্রয়।
তবে এই প্রেমানন্দের অনুভব হয়।।"

তাই শ্রীরাধিকার ভাব এবং কান্তির দ্বারা সুবলিত অর্থাৎ মণ্ডিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ

চন্দ্র শচীগর্ভে অবতীর্ণ হইয়াছেন। নিজে নাগরভাব অবলম্বন করিয়া নাগরীগণের সঙ্গে যাবতীয় রস আস্বাদন করা, ইহা ত শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিক ভাব। ইহার জন্য অন্য অবতার গ্রহণের প্রয়োজন ছিল কি? যখন শ্রীরাধিকার ভাব অঙ্গীকার করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে আস্বাদন করাই শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য হইল, তখন আমরা যদি তাঁহাকে সেই ভাবে না ভজি বা না ভাবি, তবে আমাদের সেই ভজনে তাঁহার সুখ হইতে পারে কি? আপনি আর একটী কথা বলিলেন—শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস মানি না"; আমি যদি একজনকে সর্ব্বতোভাবে ভক্তি করি এবং তাঁহার কয়েকটী ব্যবহার মানি আর কয়েকটী বাদ দিই, তবে তাহাকে সম্পূর্ণ ভাবে মানা হয় কি? যদি শ্রীগৌরাঙ্গকে মানিতে হয়, তবে তাঁহার বাল্য চপলতা, পৌগণ্ডের ঔদ্ধত্য, কৈশোরের বিদ্যামদগর্ব এবং যৌবনের নিষ্ঠুর ব্যবহার বা সন্ন্যাস সমস্তই মানিতে হয়। আংশিক বাদ দিলে তাঁহকে মানা হয় কি? শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের অত পরিকর রহিয়াছেন, তন্মধ্যে কেবল স্বরূপ দামোদর এবং রায় রামানন্দকে তিনি কেন অত ভালবাসিলেন? গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীকেই বা কেন গোপীনাথের সেবা দিয়ে টোটায় স্থান করিয়া দিয়াছিলেন? অবশ্য এ-কথায় কেহ যেন মনে না করেন যে, আমি শ্রীগৌরাঙ্গ-পরিকরগণের মধ্যে অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গ নির্দ্দেশ করিতেছি। আমাদের পক্ষে সকলেই পূজ্য। শ্রীমন্মহাপ্রভুর দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে দেখা যায় যে, তিনি যে ভাব ভালবাসিতেন-যাহা দ্বারা সেই ভাবের সাহায্য পাইলেন, তাহাকেই তিনি অন্তরঙ্গ মনে করিলেন। স্বরূপ দামোদর এবং রায় রামানন্দ এই দুই জনে কখনই মহাপ্রভুকে শ্রীরাধারাণী ভিন্ন অন্য কোনও ভাবে দেখেন নাই; সুতরাং মহাপ্রভু নিজ মনোভাব ব্যক্ত না করিলেও তাঁহারা জানিতে পারিয়া তদনুযায়ী গান, শ্লোক বা কথা দ্বারা মহাপ্রভুর তৃপ্তিসাধন করিতেন।

কর্ত্তা বাবাজী। তুমি যাহাই বল বাবা, সন্ন্যাসের কথা মনে হইলে আমাদের

প্রাণে কখনও ধৈর্য্য থাকে না। আমরা সেই চাঁচর কেশ মুড়ান গৈরিক বসনধারী কাঙ্গাল বেশ কখনই দেখিতে পারিব না।

বাবাজী। সে পৃথক্ কথা, লীলা ত সকলই নিত্য। ভাবুক সাধকের পক্ষে নবদ্বীপ লীলাও নিত্য, নীলাচল লীলাও নিত্য। যাঁহার যেটী প্রিয়, তিনি সেইটী লইয়া উপাসনা করুন, তাহাতে কাহারও আপত্তি হইতে পারে না। তবে কোন একটী লীলা মানি না; একথায় একটু বৈষম্য দোষ ঘটে। ভগবানের অনেক রূপ, অনেক নাম, অনেক ধাম এবং অনেক বেশ। যাঁহার যে নাম, যে বেশ, যে ধাম বা যে রূপ ভাল লাগিবে বা আনন্দপ্রদ হইবে; তিনি সেইটী লইয়া উপাসনা করিবেন—ইহাতে কোন আপত্তি হইতে পারে কি? তবে অদ্বেষ্টা হওয়া চাই। অর্থাৎ আমি যেটী ভজি, আমার পক্ষে সেইটীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; কিন্তু তাই বলিয়া অপরে যেটী ভজে, সেইটী যে সকল অপেক্ষা নিকৃষ্ট বা আমি মানিব না, ইহা কি সঙ্গত হয়?

ধর্ম্মদাস। উভয় লীলাই নিত্য, একথাটী আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম না। একটী লোকের দুইটী অবস্থাই কি সর্বদা বর্ত্তমান থাকিতে পারে?

বাবাজী। এইটাই ভগবৎ-লীলামাধুর্য্য বা ভগবানের ভগবত্তা যে, তিনি যখন যে স্থানে যে লীলাটী করিবেন, সেইটীই নিত্য; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই; আর একটী কথা—যাঁহারা সন্ন্যাস মানিতে চান না, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি যদি কেহ রসময় নাগরেন্দ্র চূড়ামণি গৌরকে কৃষ্ণচৈতন্য বলিয়া সম্বোধন করেন, তবে তিনি সাড়া দিবেন না কি?

কর্ত্তা বাবাজী। তা কেন দিবেন না? তিনি ত দূরের কথা—আমরাও ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম অস্বীকার করি না, কারণ আমাদের ত ঐ নামই ইষ্ট মন্ত্র।

বাবাজী। তবে ত আপনারা সন্ন্যাসীকেই উপাসনা করেন। কারণ, রসময় গৌরাঙ্গসুন্দরের ত আর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম নহে? শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম উচ্চারণ

করিবা মাত্র শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাসের মূর্ত্তি উপস্থিত হইবেন। যেমন কেশীমথন, কংসনিসূদন, মথুরানাথ বলিলে তত্তৎ কারণযুক্ত তৎকালোচিত রূপাবয়ব-বিশিষ্ট কৃষ্ণকে বুঝাইবে, সেই রূপ সার্ব্বভৌম-ত্রাণকর্ত্তা বলিলে ষড়্‌ভূজ গৌরাঙ্গ প্রকাশানন্দ সংশোধক বলিলে তেজঃপুঞ্জ-বিশিষ্ট সন্ন্যাসী স্বরূপ, নদীয়াবিহারী গৌরকিশোর বলিলে নটবর গৌরসুন্দর, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলিলে মুণ্ডিত মস্তক গৈরিকবসনধারী নীলাচল-বিহারী গৌরাঙ্গকে বুঝাইবে না কি?

ইত্যাদি নানারূপ ভগবৎপ্রসঙ্গে অনেক সময় অতিবাহিত হইল। যথাকালে সকলে স্নানাদি নিত্যকৃত্য শেষ করতঃ মহাপ্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক বিশ্রাম করিলেন।

পরদিবস বেলা অনুমান আটটার সময় সঙ্গিগণ-সঙ্গে গঙ্গাস্নান করিবার মানসে বড়াল ঘাটে নামিলেন। কিছুক্ষণ নানারূপ জলকেলি করিয়া হঠাৎ ডুব্ দিলেন। প্রায় দশ মিনিট যায় কোনই সাড়া শব্দ নাই, সঙ্গিগণ বড়ই ব্যাকুলিত চিত্তে ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কেহ বা জলে ডুব দিয়া, কেহ বা সাঁতারিয়া, কেহ বা তীরে উঠিয়া চারিদিকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কেহই কোনরূপে কৃতকার্য্য হইতে না পারায় অগত্যা দ্রুতগতি আশ্রমে গিয়া পরম গুরুদেব বৃদ্ধ বাবাজী মহাশয়ের নিকট আমূল বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে, তিনি একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"হ্যাঁরে! ভয় নাই, ও যাদুকরের বেটা। তোদের পরীক্ষা করিবার জন্য ডুব দিয়া ষ্টীমার ঘাটের দিকে যাইতেছে, তোরা স্টীমার ঘাটে গেলেই উহাকে দেখিতে পাইবি।" সঙ্গিগণ এই কথা শুনিয়া দ্রুত স্টীমার ঘাটের দিকে ছুটিলেন। স্টীমার ঘাটে পঁহুছিয়া অনুমান দশ মিনিট কাল চারিদিকে অন্বেষণ করিতেছেন, এই সময় বাবাজী মহাসয় হঠাৎ জলের মধ্য হইতে উঠিলেন। সঙ্গিগণ মৃতদেহে প্রাণ পাইবার ন্যায় ব্যাকুল ভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে জলে ঝাঁপ দিয়া ইঁহাকে ধরিলেন। ইনিও সস্নেহে একে একে সকলকে আলিঙ্গন দানে উহাদের মনোদুঃখ নিবারণ পূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা

করিলেন—"আমি যে এখানে আসিয়াছি, একথা তোদের কে বলিল?" সঙ্গিগণ বলিলেন,—কে আর বলিবে? আমরা অনেকক্ষণ জলে খুঁজিয়া যখন আপনাকে পাইলাম না, তখন অগত্যা গিয়া দাদা মহাশয়ের নিকট সমস্ত কথা বলাতে তিনি একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন—'হ্যাঁরে, ভয় নাই! ও যাদুকরের বেটা, তোদের পরীক্ষা করিবার জন্য ডুব দিয়া ষ্টীমার ঘাটের দিকে যাইতেছে, তোরা ষ্টীমার ঘাটে গেলেই তাহাকে দেখিতে পাইবি।' তাই আমরা তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিয়া এস্থানে আসিলাম।

বাবাজী। হ্যাঁরে পাগল! এ সমস্ত পাগলামির কথা কি তাঁহাকে বলিতে আছে?

সঙ্গীগণ। না বলিয়া কি করি? আমরা হতাশ হইয়া পড়িলাম। আপনি যে এতদূর নিষ্ঠুরতা করিবেন, আমরা ত তাহা স্বপ্নেও জানিতে পারি নাই।

বাবাজী। নারে! এ কোনও নিষ্ঠুরতা নয়, ডুব দিয়াই মনে হইল, দেখা যাক্ ডুব দিয়া কতদূর যাওয়া যায়। তাই এইখানে আসিলাম। তোরা এত উৎকণ্ঠিত হইলি কেন? আমি যথাসময়ে আশ্রমে যাইতাম।

সঙ্গিগণ। তাই বলিয়া কি মানুষ এতক্ষণ নিশ্চেষ্ট ভাবে থাকিতে পারে?

বাবাজী। আচ্ছা বেশ! ভাল করিয়াছ।

বলিতে বলিতে তীরে উঠিয়া আশ্রমে আগমন করিলেন। এইরূপ ভাবে শ্রীধাম নবদ্বীপে পাঁচ ছয় দিন থাকিয়া শ্রীগুরুদেবের নিকট বিদায় গ্রহণ-পূর্ব্বক পুনরায় কুঠিঘাটায় প্রত্যাগমন করিলেন।

সঙ্গিগণের মনে আজ আনন্দ আর ধরে না! অনেক দিন পরে বাবাজী মহাশয় আসিয়াছেন। সকলেই প্রাণের আবেগে ইঁহার নিকটে গিয়া নানারূপ সুখদুঃখের কথা বলিয়া প্রাণের আবেগ মিটাইতেছেন। বাবাজী মহাশয়ও সস্নেহ বাক্যে সকলের উপর বিশেষ প্রীতি দেখাইয়া সকলকে সান্ত্বনা দিতেছেন। কয়েক দিন

যায়। একদিন অপরাহ্ন সময় একটী ভদ্রলোক আসিয়া বাবাজী মহাশয়কে বলিলেন—"আজ্ঞে! আমাদের এইখানে বারোয়ারী কালীপূজা হয়। একবার দর্শন করিতে যাইবেন কি?

বাবাজী। বেশ ত বাবা! চল।

বলিয়া সঙ্গিগণকে বলিলেন—"খোল করতাল লইয়া চল ত, মাকে একটু নাম শুনাইয়া আসি।"

শুনিয়া সকলেই পরম উৎসাহভরে নাম করিতে করিতে বারোয়ারী তলায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। বহুলোক সমাগম হইয়াছে, নামও খুব জোরে হইতেছে। সকলেই আত্মহারা ভাবে নৃত্য করিতেছে, আর হাতে তালি দিয়া "ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।" এই নাম করিতেছে। বাবাজী মহাশয় নৃত্য করিতে করিতে মায়ের মুখেরপানে তাকাইয়া পদ ধরিলেন ঃ—

কেউ কি দেখেছ ভাই প্রেম মূর্ত্তিমন্ত।
প্রেমের স্বরূপ আমার প্রভু নিত্যানন্দ।।
কেউ কি দেখেছ ভাই ভাব মূর্ত্তিমন্ত।
ভাবের স্বরূপ আমার প্রভু গৌরচন্দ্র।।
কেউ কি দেখেছ ভাই জ্ঞান মূর্ত্তিমন্ত।
জ্ঞানের স্বরূপ আমার শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র।।
কেউ কি দেখেছ ভাই রস মূর্ত্তিমন্ত।
রসের স্বরূপ আমার গদাধর চন্দ্র।।
কেউ কি দেখেছ ভাই ভক্তি মূর্ত্তিমন্ত।
ভক্তির স্বরূপ আমার শ্রীশ্রীনিবাস চন্দ্র।।

ইত্যাদি কত কত পদ যে মুখে মুখে রচনা করিয়া গাহিতে লাগিলেন, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? আনন্দের পাথার বহিয়া যাইতে লাগিল। বারোয়ারী

কালীমায়ের সম্মুখে করি যাত্রা বা খ্যামটা ছাড়া কখনও নামকীর্ত্তন হইয়াছে কেহ শুনেন নাই। রণরঙ্গিণী মা আনন্দময়ী নিতাইগৌর-গুণ শ্রবণে আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া আজ যেন প্রেম-তরঙ্গিণী হইলেন। যে লোকের মুখে কখনও হরেকৃষ্ণ, গোবিন্দ, নিতাইগৌর নাম শুনা যায় নাই, সেও আজ "নিতাই গৌর রাধেশ্যাম" বলিয়া নৃত্য করিতেছে। সংকীর্ত্তনে কাম ও প্রেমের অবস্থা এবং উভয়ের পার্থক্য অতি বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করিতেছেন শুনিয়া, উপস্থিত ব্যক্তিগণ পরমানন্দিত চিত্তে পরস্পর বলাবলি করিতেছেন—"আমরা বহুদিন বহুস্থানে নামকীর্ত্তন, ভাগবতপাঠ প্রভৃতি শুনিয়াছি; কিন্তু কাম আর প্রেমের এরূপ বিশেষত্ব স্পষ্টভাবে কেহই বুঝাইয়া দিতে পারেন নাই। আজ এই মহাপুরুষের কৃপায় আমরা কাম ও প্রেমের স্বরূপতঃ পার্থক্য হৃদয়ে ধারণা করিতে পারি আর নাই পারি, কিন্তু শ্রবণ করিয়া মন প্রাণের তৃপ্তি সাধন করিলাম। আমাদের কি দুর্দ্দৈব যে, এতদিন এমন মহাপুরুষের এস্থানে আসা যাওয়া সত্ত্বেও আমরা ইঁহার মাহাত্ম্য বুঝিতে পারি নাই!" কেহ বলিতেছেন—"ভাই। মহাপুরুষের কৃপা না হইলে কি মহাপুরুষ চেনা যায়? ইত্যাদি যাহার প্রাণে যেরূপ উদয় হইতেছে, তিনিও সেইরূপ সমালোচনা করিতেছেন। এ দিকে বাবাজী মহাশয় মা কালীর সম্মুখে বহুক্ষণ এইরূপ ভাবে উদ্দণ্ড কীর্ত্তন নর্ত্তন করিয়া যথাসময়ে সংকীর্ত্তন সমাপ্তি করিয়া মাকে দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্ব্বক বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

একদিন বেলা অনুমান চারিটার সময় টাকীর জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্রনাথ মুন্‌সী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জানি না, ইতিপূর্ব্বে বাবাজী মহাশয়ের সহিত উহার পরিচয় আদি ছিল কি না; কিন্তু সাক্ষাৎ মাত্রই যেন কতকালের পরিচিত ব্যাক্তির ন্যায় পরস্পর আলাপ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। যতীনবাবু বাবাজী মহাশয়কে কাকা সম্বোধন করিতে লাগিলেন। বাবাজী মহাশয় যতই দৈন্য প্রকাশ করিতেছেন, যতীনবাবু ততই সঙ্কুচিত ভাবে বলিতেছেন, "কাকা! আপনি

মহাপুরুষ, আমা হেন সংসারবদ্ধ মায়ামুগ্ধ পশুতুল্য নরাধমকে একটু কৃপা করুন—যাহাতে নানারূপ বাধাবিঘ্নের মধ্যেও আপনাদের শ্রীচরণ স্মরণ রাখিতে পারি। **'প্রভু মঙ্গলময়'** এই কথাটি সর্ব্বদা যেন হৃদয়ে ধারণা করিয়া রাখিতে পারি। ইত্যাদি নানারূপ ইষ্টগোষ্ঠী করিয়া বাসায় প্রত্যাগমন করিলেন। যতীনবাবু এই দিন হইতেই বাবাজী মহাশয়ের প্রতি অন্তঃকরণের সহিত ভক্তিভাব দেখাইতে লাগিলেন। একবার সদল বলে বাবাজী মহাশয়কে টাকী লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। বাবাজী মহাশয় বলিলেন,—"বাবা! নিতাইচাঁদকে জানান। তাঁহার ইচ্ছা হইলে দাসের যাইতে আপত্তি কি? দাসের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের সম্পূর্ণ ভার তাঁহার উপর। তিনি যেরূপ ভাবে নাচাইতে ইচ্ছা করেন, ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় জীবকে সেইরূপ ভাবে নাচিতে হইলেই হইবে।"

কয়েকদিন যায়, একদিন কি খেয়াল হইল—বেলা অনুমান নয়টার সময় সঙ্গিগণকে নাম করিবার আদেশ দিলেন। সকলে নামকীর্ত্তন আরম্ভ করিলে ইনি ফণী এবং রাধাবিনোদকে ভেক দিয়া কীর্ত্তন সহ উহাদিগকে ভিক্ষায় পাঠাইয়া দিলেন। নিজে একাকী অতি গম্ভীরভাবে বসিয়া আছেন। বেলা প্রায় সাড়ে দশটার সময় সংকীর্ত্তন ফিরিয়া আসিল। সে এক অপূর্ব্ব ভাব। সকলেরই চোখে জল, অঙ্গে পুলক, মুখে হা হুতাশ, সকলেই নৃত্যপরায়ণ। সংকীর্ত্তন আসিবামাত্রই বাবাজী মহাশয় সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ করতঃ ভিক্ষার ঝোলা গ্রহণপূর্ব্বক নৃত্য করিতে লাগিলেন। কাহারও বাহ্যস্মৃতি নাই—সকলেই বিভোর কিছুক্ষণ নৃত্য করিতে করিতে বাবাজী মহাশয় ভাবাবিষ্ট হইয়া অচৈতন্য ভাবে ভূমিতলে পতিত হইলে; সঙ্গিগণ ইঁহাকে ঘেরিয়া উচ্চৈঃস্বরে নাম করিতে লাগিলেন। অশ্রু-কম্প-পুলক প্রভৃতি সাত্ত্বিক বিকারগণ সমকালীন ইঁহার দেহকে অধিকার করিল। বিস্ফারিত নয়নযুগল হইতে এরূপভাবে দরদরিত ধারে অশ্রু ঝরিতেছে যে, দেখিয়া অতি বড় পাষণ্ডেরও হৃদয় প্রেমে বিগলিত হইয়া যাইতেছে।

সর্ব্বাঙ্গে পুলকাবলী বিভূষিত। 'বিকম্পিত অধরোষ্ঠ ফুলাইয়া ফুলাইয়া রোদন করিতেছেন। ঐ অবস্থায় যে একবার ইঁহাকে স্পর্শ করিতেছে, সেও প্রেমাবেশে বিভোর হইয়া নৃত্য করিতে করিতে ভূমিতলে পতিত হইতেছে। কৈলাশবাবু বাবাজী মহাশয়কে সুস্থ করিতে গিয়া ইঁহাকে স্পর্শ করিবামাত্র উঠিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ পরে বাবাজী মহাশয় কিঞ্চিৎ স্থিরতা লাভ করিয়া সকলকে সান্ত্বনা করতঃ নাম সমাপ্ত করিলেন।

শ্রীধাম পুরী প্রত্যাবর্ত্তন।

ইতিপূর্ব্বে শ্রীধাম পুরী ঝাঁজপীটা মঠে শ্রীললিতা দাসীকে বাবাজী মহাশয় নিজ হস্তের লেখা একখানি পত্র-দ্বারা ঠাকুর-সেবা এবং বৈষ্ণব-সেবার নিয়ম করিয়া দিয়েছেন যে, "ঠাকুর-মন্দিরে দিবারাত্র অবিরামভাবে একটি ঘৃত-প্রদীপ জ্বলিবে। ঠাকুরদের ভোগে একমাত্র দেশী গুড় ভিন্ন অন্য কোন মিষ্টি লাগিবে না। মঠের মধ্যে কোনরূপ তৈল প্রবেশ করিবে না। দেশ্‌লাইএর আগুনে কোন কার্য্য হইবে না বা আশ্রমে দেশ্‌লাই রাখিবে না। সন্ধ্যার পরে কেহ মঠের বাহির হইবে না। তামাক গাঁজা প্রভৃতি কোনরূপ মাদক দ্রব্য মঠের কেহ ব্যবহার করিতে পারিবে না বা মঠের মধ্যে প্রবেশ করিবে না। একবেলা ঠাকুরের রান্না হইবে এবং বৈকাল শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের যে মহাপ্রসাদ আসে, ঐ মহাপ্রসাদ শ্রীগণেশ মহাপাত্র এবং গদাধর রথকে পূরণ করিয়া দিয়া যাহা উদ্বৃত্ত হয়, উহাই সকলে মাধুকরী করিবে। মঠে ত্রিসন্ধ্যা নামসংকীর্ত্তন করিবে। তোমরা ব্যতীত দুই মূর্ত্তি দ্বারা শ্রীজগন্নাথের মন্দিরে কীর্ত্তন রক্ষা করিবে। ঘৃতপক্ক ছাড়া তৈলপক্ক কোন দ্রব্যে ঠাকুরের ভোগ হইবে না।"

ইত্যাদি। আজ আবার একখানি পত্র লিখিলেন—“যথানিয়মে আশ্রমের সেবা কার্য্য চলিতেছে কিনা, পত্রপাঠমাত্র জানাইবে।” পত্রোত্তরে পুরী হইতে সংবাদ আসিল—“আপনার কৃপায় আপনার আদেশানুরূপ সেবাকার্য্য চলিতেছে! পুরীবাসী আপামর সাধারণ আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিবার জন্য বড়ই উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন; অতএব একবার শ্রীধামে আগমন করিয়া সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে, আজ্ঞা হউক্।” পত্রখানি পাইবামাত্রই বাবাজী মহাশয় পুরী রওনা হইবার জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কলিকাতা অঞ্চলের ভক্তবৃন্দ আরও কয়েকদিন কলিকাতায় থাকিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেও ইনি আর অপেক্ষা না করিয়া সদলবলে শ্রীধাম পুরী রওনা হইলেন। সঙ্গে একখানি মহাপ্রভুর অয়েল পেন্টিং চিত্রপট রহিয়াছে। বেলা অনুমান সাড়ে আটটার সময় সকলে পুরী ঝাঁজপীটা মঠে আসিয়া পৌঁছিলেন।

করুণাময় প্রভুর অপূর্ব্ব ভঙ্গি! আজ তিনদিন হইল শ্রীজগন্নাথদেবের সেবার বন্দোবস্তের জন্য একটি সাহেব ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার যত্নে আজ বেলা দশটার সময় শ্রীজগন্নাথদেবের সকাল ধূপ (প্রথম ভোগ) হইল। পুরীবাসী লোকের মনে আনন্দ আর ধরে না। এদিকে বাবাজী মহাশয়ের আগমনবার্ত্তা পাইয়া বলরাম বাবু, নগেনবাবু, ভুবন সাউ প্রভৃতি ভক্তগণ ব্যগ্রচিত্তে আসিয়া ইঁহার চরণে দণ্ডবৎ প্রমাণপূর্ব্বক ইহার শারীরিক কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ইনিও প্রেমালিঙ্গন দানে উঁহাদের সকলের বিরহ-যন্ত্রণা বিদূরিত করতঃ শ্রীধামের কুশল এবং ধামেশ্বর শ্রীজগন্নাথদেবের কুশল প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। বলরামবাবু হৃষ্টচিত্তে বলিলেন—“আজ্ঞে বড়ই শুভ সংবাদ, আজ তিন দিন হইতে শ্রীজগন্নাথদেবের সেবার সুশৃঙ্খলতার জন্য একটি সাহেব ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার চেষ্টা এবং জগন্নাথদেবের ইচ্ছায় আজ দশটার সময় জগন্নাথের সকাল ধূপ হইয়াছে। যদি আজ্ঞা হয়,

কিঞ্চিৎ মহাপ্রসাদ আনাই।" বাবাজী মহাশয় অতিশয় আনন্দিত হইয়া গদগদকণ্ঠে বলিলেন—"বলরাম! বড়ই শুভ সংবাদ দিলে। এত দিন পরে শ্রীজগন্নাথদেব কৃপা করিয়া গ্রহগণকে একটু দূরে সরাইয়াছেন।"

বলরাম। আজ্ঞে! আপনি পূর্ব্বে যাহা যাহা বলিয়াছেন, সমস্তই আমরা প্রত্যক্ষ দেখিলাম। আপনার আদেশে কণার্কতীর্থে নবগ্রহ পূজাদি সমাপন করিয়া পুরী আসিবা মাত্রই শুনি যে, গভর্ণমেন্ট হইতে শ্রীজগন্নাথের সেবার জন্য একজন ম্যানেজার নিযুক্ত হইবার প্রস্তাব হইতেছে; কেবল রাজার মতামত সাফেক্ষ। তৎপর দশ পনের দিন পরে শুনি যে, সমস্তই ঠিক হইয়া গিয়াছে, শীঘ্রই ম্যানেজার আসিবেন। মনে মনে আপনার কথার সহিত মিল করিয়া দেখিলাম, ঠিক একই কথা। সাহেব ম্যানেজার নিযুক্ত হইবেন, এই কথা শুনিয়া প্রথমে সকলেই ভীত হইয়াছিলেন; কিন্তু ইহার ব্যবহার বা ধর্ম্মভাব দেখিয়া সকলেই পরমানন্দিত।

বাবাজী মহাশয় বলরামবাবুর কথায় বড়ই সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—"নিতাই এর ইচ্ছায় বড়ই সুখের বিষয়। যাও, মহাপ্রসাদ লইয়া আইস। শ্রীমন্মহাপ্রভু আগমন করিয়াছেন তাঁহাকে সমর্পণ করিতে হইবে।" বলরাম আজ্ঞা পাইবামাত্র দ্রুতগতি শ্রীজগন্নাথের মন্দিরে গমনপূর্ব্বক নানাবিধ মহাপ্রসাদ লইয়া আসিলে, বাবাজী মহাশয় সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্ব্বক মহাপ্রসাদের বন্দনা করতঃ একজনকে বলিলেন—"দেখ, ঐ পঙ্গত-ঘরে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে বসাইয়া বেশ পারশ করিয়া মহাপ্রসাদ সেবা করাও ত।" তিনিও ইহার আজ্ঞানুসারে কার্য্য করিতে লাগিলেন। ওদিকে ভোগ হইতে লাগিল, এদিকে প্রেমদাদা একটু বিস্মিতভাবে বাবাজী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আজ্ঞে! যিনি পূর্ণ পূর্ণতম সাক্ষাৎ ভগবান্, নারায়ণাদি যাঁহার অংশকলা, তাঁহাকে অপরের নৈবেদ্য বস্তু কিরূপে সমর্পণ হইতে পারে? আমি এই ব্যাপারের মূল মর্ম্মত ত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

বাবাজী। অতি সুন্দর কথা। সকলে মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর। পূর্ব্বে অনেকবার তোমরা শুনিয়াছ যে, 'লীলা' এবং 'তত্ত্ব' দুইটি পৃথক বস্তু। লীলা এবং তত্ত্ব একত্রে মিশ্রিত করিতে গেলেই বিপদ। তাহাতেই উপাসনা-বিভ্রাট উপস্থিত হয়। তত্ত্বে গোস্বামিপাদগণ শ্রীমন্মহাপ্রভু সম্বন্ধে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে—"সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীরাধিকার ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার করিয়া শ্রীধাম নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।" এখন ব্রজেন্দ্রনন্দনের যদি তত্ত্ব ধরিতে চাও, তবে শাস্ত্র বলিবেন—"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম।' ইত্যাদি ভুরি ভুরি প্রমাণ রহিয়াছে। তবে দেখ, শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ পূর্ণতম সাক্ষাৎ ভগবান্; তদভিন্নত্ব- হেতু শ্রীগৌরাঙ্গও পূর্ণ পূর্ণতম সাক্ষাৎ ভগবান্। ভগবানের জন্ম, কর্ম্ম, উপনয়ন, বিবাহ, সন্ন্যাস প্রভৃতি অসম্ভব। কারণ তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ, নিষ্ক্রিয়, নির্লিপ্ত, গুণাতীত, নির্ব্বিকার পুরুষ। মায়াশক্তি তাহা হইতে দূরে অবস্থিত। সুতরাং লীলাশক্তি লজ্জিতভাবে অন্তরালে লুক্কায়িত রহিয়াছেন। এই অবস্থাতে যুগ যুগান্তর ধ্যান করিলেও তিনি "অবাঙ্মনসোগোচরঃ" তিনি নিজে বলিয়াছেন—"ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।" অর্জ্জুন বলিয়াছেন—'ন হি তে ভগবান্ ব্যক্তিং খিদুর্দেবা ন দানবাঃ' অন্যত্র— "অনেকবাহূদরবক্তনেত্রং পশ্যামিত্বাংসর্ব্বতোহনন্তরূপম্ নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ।' অনন্তদেব সহস্র মুখে বর্ণনা করিয়াও যাঁহার ঐশ্বর্য্য বা তত্ত্বের এক কণা প্রকাশ করিতে পারিলেন না, তাঁহাকে জীব কিরূপে ধারণা করিবে? কাজেই তাঁহাকে অপরের নৈবেদ্য দেওয়া ত দূরের কথা, ব্যাপ্যরূপে তাঁহার ধ্যান পূজাই অসম্ভব। এই সমস্ত কারণে ভগবান্ জীবের প্রতি সদয় হইয়া ইচ্ছা-শক্তিকে অঙ্গীকার করতঃ নিজ বিভুত্ব শক্তিকে নিজ অভ্যন্তরে আচ্ছাদন পূর্ব্বক লীলা-শক্তির অধীনতা স্বীকার করেন। এই অবস্থাতে লীলাশক্তি যেমন যেমন ভাবে ঐ লালাময়বিগ্রহকে নাচাইতে ইচ্ছা

করিবেন, তিনি ঠিক মন্ত্র-মুগ্ধের ন্যায় সেই সেইভাবে নাচিয়া বেড়াইবেন। এই লীলাশক্তির সহিত বিভূত্ব-শক্তির সংমিশ্রণে লীলাময়ের অন্তরে আঘাত লাগে। ব্রজলীলায় গোষ্ঠ হইতে প্রত্যাগমনকালীন ব্রহ্মার স্তবাদিই এ বিষয়ে প্রমাণ। এই লীলাময় লীলাশক্তির বশতাপন্ন হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন "বিহরে প্রাকৃতো যথা।" অন্যত্র—"মাতা মোরে পুত্রভাবে করয়ে বন্ধন। সখা শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ। প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভৎসন। বেদস্তুতি হৈতে সেই হরে মোর মন।।" আমাদের যাবতীয় খেলা-ধূলা এই লীলাময় বিগ্রহ লইয়া। শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজে শ্রীজগন্নাথ দর্শন ও মহাপ্রসাদ সেবন করিয়াছেন। নবদ্বীপে অবস্থান কালে নিজ-হস্তে শালগ্রাম সেবা করিয়াতদধরামৃত গ্রহণ করিয়াছেন। মর্য্যাদা-পুরুষোত্তম সমস্ত দেব-দেবীর মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। "ধর্ম্মসংস্থাপক প্রভু স্থাপেন সর্ব্ব ধর্ম্ম। লোক শিক্ষা হেতু কভু না লঙ্ঘেন কর্ম্ম।।" লীলাময় পুরুষকে ঐশ্বর্য্য মিশ্রিত তত্ত্বের মধ্য দিয়া দেখিতে গেলে, সম্বন্ধ রাজ্যে ভাবের উপাসকগণের প্রাণে আতঙ্ক উপস্থিত হইয়া উপাসনার ব্যাঘাত জন্মে না কি? শচীমাতা বা তদ্ভাবভাবুক কোনও ব্যক্তিকে যদি—'যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপস্য তনুভাঃ। য আত্মান্তর্য্যামী পুরুষ ইতি সোহস্যাংশবিভবঃ।।" এই কথাটি বুঝাইয়া দেওয়া হয়, তবে কি তিনি আর গৌরাঙ্গের অঙ্গে ধূলা বা মুখকমলমলিন দেখিয়া উঁহাকে ক্রোড়ে ধারণপূর্ব্বক নয়ন-জলে অভিষিক্ত করিতে পারেন? না তৎজাতীয় ভাব প্রেমের বিকাশ হয়? না তাড়ন ভর্ৎসনাদি সম্ভবে?

প্রেমদাদা। বেশ কথা। কেহ না হয় বলিল। কিন্তু যখন বৃন্দাবনে গোবর্দ্ধন ধারণ, পুতনা, অঘাসুর, বকাসুর প্রভৃতি নিধন করিলেন বা নবদ্বীপে সাত প্রহরিয়া ভাব, মহাভাবাবেশ প্রভৃতি হইল, তখন কি সেগুলি যশোমতী বা শচীমাতা প্রভৃতি কেহ দর্শন করেন নাই বা অনুভব করেন নাই?

বাবাজী। এটিই পূর্ণ মাধুর্য্যের বিকাশ। "দেখিলেও নাহি মানে কেবালার রীত। ঐশ্বর্য্য-শিথিল-প্রেমে নহে মোর প্রীত।।' গোস্বামিগণ সে বিষয়ে ত স্পষ্টই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। "বিষ্ণু-দ্বারে করেন কৃষ্ণ অসুর সংহার।" যোগমায়া ব্রজগোপীগণের প্রেম পরীক্ষার জন্য বহু ঐশ্বর্য্য দেখাইয়াছেন; কিন্তু উঁহারা কিছুতেই বিচলিতা হন নাই। বালক অবস্থায় কৃষ্ণের মুখের মধ্যে চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়া যশোমতী দেবী বিস্মিত না হইয়া গ্রহবৈগুণ্য বা কোন অপদেবতার আশ্রয় জ্ঞানে নানারূপে শান্তি স্বস্ত্যয়ন করাইলেন। গোপীগণ কৃষ্ণকে পূতনা প্রভৃতি স্ত্রী-হত্যা এবং বৃষাসুর প্রভৃতি গো-হত্যা দোষে দূষিত করিয়া তীর্থপর্যটন ও তীর্থস্নানরূপ প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিলে কৃষ্ণ যোগমায়ার আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক সর্ব্বতীর্থগণের আহ্বান করিবামাত্র সমস্ত তীর্থ মূর্ত্তিমান্ হইয়া অধিষ্ঠান করিলেন। এসমস্তই গোপীগণ স্বচক্ষে দেখিলেন, কিন্তু তথাপি যোগমায়ার কৃপা ভিন্ন কৃষ্ণে কোনওরূপ ঐশ্বর্য্যভাব উহাদের কাহারই প্রাণে আসে নাই। এই জন্যই দ্বারকা ও মথুরা হইতে বৃন্দাবন লীলার আধিক্য প্রকাশ করিয়াছেন; শ্রীমন্মহাপ্রভু সম্বন্ধে শ্রীকবিরাজ গোস্বামী প্রভৃতি ত কোনও তত্ত্বের আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই বা প্রয়োজনও হয় নাই। তাঁহাদের যত কিছু তত্ত্ব-আলোচনা ব্রজেন্দ্রনন্দন লইয়া। যেমন ব্রজেন্দ্রনন্দন পূর্ণ পূর্ণতম ভগবান্ সাব্যস্ত হইলেন, অমনি একটি কথাতে সিদ্ধান্ত করিয়া দিলেন যে—"ব্রজেন্দ্রনন্দন যেই, শচীসূত হইল সেই।" ইত্যাদি। সেই কৃষ্ণচন্দ্রকে যাঁহারা সখ্য, বাৎসল্য, মধুর ভাবে উপাসনা করেন, তাঁহারা নারায়ণের প্রসাদ, গোপেশ্বর বা কত্যায়নীর প্রসাদ অকাতরে কৃষ্ণকে সমর্পণ করিতেছেন। উহাতে তাঁহাদের হৃদয়ে কিঞ্চিন্মাত্র সঙ্কোচ আসে না।

প্রেমদাদা। আচ্ছা, তবে যাঁহারা অমনিয়া (অনিবেদিত বস্তু) দ্বারা মহাপ্রভুর সেবা করেন, তাঁহারা কি অন্যায় করেন?

বাবাজী। না, তা কেন হইবে? মহাপ্রভু ভাবনিধি। যাহারা যে ভাবে ইচ্ছা তাঁহাকে ভজিলে, তিনি তদ্‌জাতীয় ভাবে তাঁহার সেই ভজন গ্রহণ করেন। শ্রীঅদ্বৈত প্রভু নিজ গৃহে একত্র তিনখানি পাতা করিয়া তিনখানিতেই তুলসী মঞ্জরী পাতা ঘৃত দ্বারা অভিষিক্ত করিলেন, কিন্তু কৃষ্ণকে একখানি পাতায় ভোগ দিলেন। অপর দুইটি পারশ অমনিয়াই রহিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু আসিয়া উপস্থিত হইবামাত্রই শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু পূর্ব্বোক্ত অমনিয়া পারশ দুইটিতে দুইজনকে বসাইলেন; লীলাময় পুরুষ মহাপ্রভু কিন্তু কৃষ্ণনৈবেদ্য জ্ঞানে অদ্বৈত-আচার্য্যকে বহুবিধ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তবেই ভাবিয়া দেখ না কেনে, তুমি যে ভাবেই দাও না কেন, তিনি তাঁহার নিজ ভাবানুসারে গ্রহণ করিবেন। অতএব কেহ "এই দুইভাবের কোনও ভাবকে পরিত্যাজ্য" একথা বলিতে পারিবেন না। এইরূপে নানাপ্রকার কথোপকথনে বহুক্ষণ কাটিয়া গেল। এদিকে মহাপ্রভুর ভোগান্তে ললিতাদাসী ইঁহাকে মহাপ্রসাদ পাইবার কথা বলিলে সকলকে সঙ্গে লইয়া একত্র মহাপ্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক বিশ্রাম করিলেন।

সন্দেহ ভঞ্জন।

অপরাহ্ন সময় বাবাজী মহাশয় সঙ্গিগণ সঙ্গে কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে গমন করিলেন। পুরীবাসী আবালবৃদ্ধ স্ত্রী-পুরুষ সকলেই বাবাজী মহাশয়ের দর্শন পাইবামাত্র যেন আশ্চর্য্যান্বিত হইতে লাগিলেন। সকলেরই মনে ধারণা ছিল যে, বাবাজী মহাশয় পাগল হইয়া গিয়াছেন। আর ভাল হইবার আশা নাই; অনেকেই এই জন্য বিশেষ দুঃখিত ছিলেন। আজ বড়

রাস্তায় ঠিক পূর্ব্ববৎ মন-প্রাণ-মাতান সংকীর্ত্তন-ধ্বনি শুনিয়া সকলেই যেন মৃতদেহে প্রাণ পাইলেন। এক একজন প্রাণের আবেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া ছুটিয়া গিয়া সংকীর্ত্তনাবকাশে ইঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক গদগদ কণ্ঠে সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন। ইনিও হাসিমুখে প্রত্যুত্তর করিয়া সকলের মনোব্যথা দূর করিতেছেন। ক্রমে শ্রীমন্দিরে যাইয়া শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন পাইবামাত্র দুইটি নয়ন-ধারায় ইঁহার মুখ বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। গদগদকণ্ঠে নানারূপ পদাবলী দ্বারা অনেক প্রকারে স্তব স্তুতি করিতে লাগিলেন। মাধব পশুপালক দূর হইতে ইঁহার কণ্ঠধ্বনি শ্রবণ করিয়াই হৃষ্টচিত্তে ঠিক বাবাজী মহাশয় কি না, এরূপ ইতস্ততঃ করিতেছিলেন; যেমন ইনি শ্রীজগমোহনে উপস্থিত হইয়াছেন, অমনি দ্রুতগতি যাইয়া কুশল জিজ্ঞাসা করা মাত্র বাবাজী মহাশয় বলিলেন—"যাঁহার কুশলে জগতের কুশল, তাঁহার সেবার আজকাল কিরূপ বন্দোবস্ত হইতেছে বলুন দেখি!

মাধব। শ্রীজগন্নাথদেবের ইচ্ছায় আজকাল অতিসুন্দর ভাবেই চলিতেছে। তবে ঐ ম্যানেজারটি যদি হিন্দু হইতেন, তাহা হইলে আরও সুবিধা হইত; কারণ ইনি ত আর মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিতে পারিতেছেন না। তবুও প্রভুর কৃপায় কৌশলে অনেক কার্য্য বুঝিয়া লইতেছেন।

বাবাজী। আপনাদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতেছেন?

মাধব। ব্যবহারটি অতি মধুর। কড়া মেজাজ নহে। প্রথম দিন আসিয়াই সেবক পাণ্ডাদিগকে ডাকাইলেন। আমরা সকলেই উপস্থিত হইলে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনাদের শ্রীজগন্নাথদেবের সেবার কিরূপ নিয়ম আমি একবার শুনিতে চাই। আমি আপনাদের হিন্দু নই বলিয়া আমার নিকট সেবার কথা বলিতে কোন আপত্তি আছে কি?" শুনিয়া আমরা সকলেই একবাক্যে বলিলাম—"আজ্ঞে! না হুজুর! আপনাকে যখন শ্রীজগন্নাথদেব তাঁহার নিজ

সেবার সুশৃঙ্খলতার জন্য অঙ্গীকার করিয়াছেন, তখন আপনি আমাদের অপেক্ষা তাঁহার বিশেষ অন্তরঙ্গ সন্দেহ নাই। আপনার নিকট বলিতে আবার আপত্তি কি? বলিয়া নিত্য সেবার মোটামুটি নিয়মগুলি বলা হইল।

ম্যানেজার। আচ্ছা, আজকাল এই নিয়মমত সেবা হইতেছে কি?

আমরা। হুজুর! এনিয়মের একআনা হইতেছে কি না সন্দেহ, দিন রাত্রের মধ্যে যেদিন মধ্যাহ্ন ধূপ হইল, সেদিন আমরা মনে করি যে, খুব সেবা হইল।

ম্যানেজার। আচ্ছা, এই সেবা না হওয়ার কারণ কি—অর্থাভাব না অন্য কিছু?

আমরা। আজ্ঞে! জগন্নাথ ঈশ্বর; তাঁহার অর্থের অভাব নাই। কেবল বন্দোবস্তের অভাব। মোট কথা রাজা বাহাদুর যদি একটু দৃষ্টি করিতেন, তাহা হইলে সমস্ত কার্য্য সুচারুরূপে চলিত।

ম্যানেজার। রাজা বাহাদুর নিজে কোন সেবা করিতেন কি?

আমরা। আজ্ঞে, সেবা না করিলেও তাঁহার একটু শাসন থাকিলে সেই ভয়ে কার্য্য ভাল চলে।

ম্যানেজার। আচ্ছা, জগন্নাথ কি একা রাজারই উপাস্য, না আপনাদেরও?

আমরা। হুজুর! ইনি জগন্নাথ—রাজারও ইষ্ট, আমাদেরও ইষ্ট, জগদ্বাসীর-সকলেরই ইষ্ট।

ম্যানেজার। আচ্ছা, সেবাই ত উপাসনা?

আমরা। আজ্ঞে হ্যাঁ. সেবাই প্রধান উপাসনা। সেবা বিনা কখনই সাধ্য বস্তু পাওয়া যায় না।

ম্যানেজার। আচ্ছা, যাহাদের নিজ কর্ত্তব্যজ্ঞান থাকে, তাহাদের উপাসনা সম্বন্ধে অপরের শাসন অপেক্ষা করে কি? বড়ই দুঃখের বিষয়—আপনারা হিন্দু, আপনাদেরই উপাস্য দেবতার উপাসনা বা সেবা সম্বন্ধে বন্দোবস্ত করিবার

জন্য আমি একজন খৃষ্টিয়ান, আসিয়াছি। ইহাতে আপনাদের অপমান বোধ-করা উচিত নয় কি? আমার বিশ্বাস, আপনারা স্ব স্ব কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হওয়ার দরুণই সেবার এরূপ বিশৃঙ্খলতা ঘটিয়াছে; কতস্থানে দেখা যায় যে, নিজ নিজ ইষ্টদেবের সেবার জন্য লোক কত কায়ক্লেশ সহ্য করে। এমন কি ভিক্ষা করিয়া পর্য্যন্ত কত লোক সেবা করিয়া থাকে। আর এ কি না সমস্ত বস্তু প্রস্তুত; কেবল সেবকেরা নিজ নিজ কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হওয়ার দরুণ সেবা বন্ধ! এ সম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য, আমি আপনাদের উপর বিচারের ভার দিলাম।

আমরা সরলেই নীরব। কি আর বলিব? সাহেবের কথা শুনিয়া আমাদের চোখে জল আসিল। উপস্থিত সেবক পাণ্ডাগণ সকলেই একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন যে, যথার্থই এ বিষয়ে আমাদের সম্পূর্ণ দোষ। আমাদের ইষ্টদেবের সেবার জন্য আমরা যদি অবহেলা না করিতাম, তবে কি এতদূর দূরবস্থা ঘটিত? যাহা হউক, কল্য হইতে আমাদের নিজ নিজ কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আমরা বিশেষ উদ্‌যোগী হইব।

সাহেব সন্তুষ্টচিত্তে বলিলেন—"বড়ই সুখের কথা; আপনাদের কার্য্য আপনারা করিলে আর অপরের বলিবার অবকাশ কোথায়? এবার যাঁহার চৈতন্য না হইবে, তাঁহার পক্ষে কিন্তু বড়ই অনিষ্টের আশঙ্কা, এটি সকলেরই ধারণা রাখা দরকার।" সেইদিন হইতে তিন ধূপ, পাঁচ অবকাশ, বড় শিঙ্গার প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্য অতি সুন্দররূপে চলিতেছে। বেলা দশটা বাজিতে না বাজিতে সকাল ধূপ শেষ হইয়া যায়, মাধব পশুপালকের কথা শুনিয়া বাবাজী মহাশয় প্রেম-পুলকিত অঙ্গে উঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—"বড়ই সুখের বিষয়, আপনাদের প্রাণের প্রাণ শ্রীজগন্নাথদেবের জন্য যে আপনাদের প্রাণ কাঁদিয়াছে, তাঁহার দিকে যে আপনাদের দৃষ্টি পতিত হইয়াছে, ইহা দেখিয়া শুনিয়া ধন্য হইলাম। সকলই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা! সাহেব ম্যানেজার না আসিলে

এত সত্বর এরূপ সুশৃঙ্খলা হইত বলিয়া আমার মনে হয় না। মঙ্গলময় যখন যাহা করেন সবই মঙ্গলের জন্য।" বলিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। এইরূপ পরমানন্দে বহুক্ষণ নৃত্য কীর্ত্তনের পর শ্রীমন্দির পরিক্রমা করিয়া সমুদ্র দর্শন মানসে নাম করিতে করিতে গমন করিলেন। সমুদ্রের তীরে উপস্থিত হইয়া সকলেই সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতঃ কেবল স্পর্শ মাত্র করিবেন এই সঙ্কল্প ছিল; কিন্তু তীর্থরাজের আকর্ষণে কেহই আর স্থির থাকিতে না পারিয়া একেবারে জলে নামিয়া মনের আনন্দে সাধ্যানুসারে সাঁতার খেলিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ জলকেলি করিয়া শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুরের সমাধিস্থান, টোটাগোপীনাথ, গঙ্গামাতামঠ এবং গম্ভীরা প্রভৃতি দর্শন করিয়া ঝাঁজপিটা মঠে প্রত্যাগমন করিলেন। বাবাজী মহাশয় আসিয়াছেন শুনিবামাত্র বহুলোক আসিয়া ইঁহাকে দর্শন করতঃ মনের আনন্দে নানারূপ প্রশ্নোত্তর দ্বারা নিজ নিজ মনের সন্দেহ দূর করিতে লাগিলেন।

রাই রাজা ।

পুরীবাসিগণ বাবাজী মহাশয়কে পাইয়া পূর্ব্ববৎ আনন্দ করিতে লাগিলেন। আশ্রমে ঠাকুরসেবার ভার শ্রীকিশোরী দাসী সখীর উপরে দেওয়া হইল। কিশোরী দাসী অতি প্রীতির সহিত ঠিক অষ্টকাল লীলা অনুযায়ী সেবা করিতে লাগিল।

আবার সময়ে সময়ে কোন কোন নৈমিত্তিক লীলানুযায়ী ঠাকুরের বেশ করিয়া সেই সেই লীলার উদ্দীপক নৃত্যগীত প্রভৃতি দ্বারা রসপুষ্টি সাধন করিতে লাগিল। একদিন বাবাজী মহাশয় কিশোরীদাসীকে ডাকিয়া বলিলেন—

"তোমরা ত সকলই বেশ করিতেছ, একদিন রাই রাজা করিতে পার?" কিশোরী দাসী পরমানন্দচিত্তে বলিল—"আজ্ঞে! আপনার কৃপা হইলে অসম্ভবও যখন সম্ভব হইতে পারে, তখন এ আবার কত বড় কথা?" ললিতা দাসী বলিল—"কেবল রাজা করিয়া রাখিলে ত আর হইবে না, তদনুযায়ী কীর্ত্তন এবং রাজরাজেশ্বরীর উপযুক্ত ভোগ রাগের ব্যবস্থা করা চাই ত?"

বাবাজী মহাশয় একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"রাই রাজা হইলে ভোগ রাগের ভার ত সখীদের উপর, সে সমস্ত কি আর অপরে যোগাড় করিবে? তোমাদের কার্য্য তোমরা কর; আমরা মহাপ্রসাদ পাইবার অধিকারী।" সখীরা সকলেই একবাক্যে বলিয়া উঠিল—"আচ্ছা তাহাই হইবে। মহাপ্রসাদ পাইবার সময় আপনাদিগকে পাইব ত?"

বাবাজী মহাশয় "হ্যাঁ, সে বিষয়ে আমি সর্ব্বদা প্রস্তুত" বলিয়া শ্রীজগন্নাথ দর্শনে গমন করিলেন। এদিকে রাইরাজার উপযোগী বেশ-ভূষা প্রস্তুত হইতে লাগিল। আগামী পূর্ণিমা দিবস দিন স্থির হইল। ত্রিভঙ্গ দাদা বলিলেন—"আমার নিকট রাইরাজার পালা আছে।" বাবাজী মহাশয় পদগুলি সমস্ত শুনিলেন।

পূর্ণিমার দিন সকাল হইতে নানারূপ বন্দোবস্ত হইতেছে। আশ্রমবাসিগণের আনন্দ আর ধরে না। সকলেই আপন আপন ভাবানুযায়ী কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। কেহ বা কীর্ত্তন করিবেন বলিয়া নানারূপ পদ, পদাবলী ও অলঙ্কারাদি স্মরণ করিতেছেন। কেহ বা খোল বাজাইবেন ভাবিয়া আনন্দে অধীর হইতেছেন। কেহ কেহ বা নৃত্য করিবেন বলিয়া নানারূপ বেশ ভূষার যোগাড় করিতেছেন। এদিকে ললিতাদাসী আধ মন ময়দার লুচি, একমণ দুধের সুজির পায়স, পাঁচসের সুজির মোহনভোগ এবং তদুপযোগী ভাজা, তরকারী ও অন্যান্য মিষ্টি প্রভৃতি সমস্ত প্রস্তুত করিবার যোগাড়ে আছেন।

বাবাজী মহাশয় বিশিষ্ট বিশিষ্ট ভদ্রলোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন। ঠাকুরের সেবাইত কিশোরী দাসী এবং তৎসহযোগিগণ নানাবিধ সাজসজ্জা নির্ম্মাণে ব্যস্ত।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইল। কিশোরী দাসী সন্ধ্যাআরতি শেষ করিয়া বাবাজী মহাশয়কে বলিল—"আজ্ঞে! রাত্র দশটার পর ভিন্ন ত দর্শন খোলা হইতে পারিবে না। কারণ, যথাসময়ে অভিসার করিয়া নিকুঞ্জে মিলনের পর তবে ত শ্রীমতী রাজা হইবেন? ইহার পূর্ব্বে কিরূপে দর্শন খোলা হইবে?" বাবাজী মহাশয় হৃষ্টচিত্তে বলিলেন—"ঠিক ভাবানুযায়ী কার্য্য করিবে, ও বিষয়ে আমার আনন্দ বই নিরানন্দ নাই। তোমরা ঠিক ভাবানুযায়ী ভগবৎসেবা করিয়া নিজেরাও ধন্য হও, আমাকেও ধন্য কর। কোন লোকাপেক্ষার দ্বারা তোমাদের ভাবের অভাব না ঘটে, এইটাই সর্ব্বদা নিতাইচাঁদের চরণে আমার প্রার্থনা। যাও প্রাণের মত করিয়া ঠাকুরকে সাজাও।" বলিয়া নিজে কীর্ত্তনের কাছে গেলেন। এদিকে ঠাকুরের বেশ হইতে লাগিল। ত্রিভঙ্গ দাদা অভিসার কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছেন। বাবাজী মহাশয় বসিয়া কীর্ত্তন শুনিতেছেন; আর যে সমস্ত ভক্তগণ আসিতেছেন, তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য সমাদর পূর্ব্বক বসাইতেছেন রাত্র অনুমান নয়টার সময় কয়েকটি ভদ্রলোক একটু দুঃখিত চিত্তে বাসায় ফিরিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছেন দেখিয়া বাবাজী মহাশয় উঁহাদিগকে আর একটু সময় অপেক্ষা করতঃ ঠাকুর দর্শন করিয়া যাইতে বলিলেন। ভদ্রলোক কয়টি যে কোনও অবস্থায় একবার ঠাকুর দর্শন করিবার জন্য বড়ই ব্যাকুলতা প্রকাশ পূর্ব্বক বাবাজী মহাশয়কে প্রার্থনা করিতেছেন যে, "আমাদের বাসায় বিশেষ প্রয়োজন অর্থাৎ দশটার সময় কয়েকটি ভক্ত আগমণ করিবেন, আমরা না থাকিলে উঁহারা দুঃখিত চিত্তে চলিয়া যাইবেন; সুতরাং আমাদের না গেলেও নয়; এদিকে একবার ঠাকুর

দর্শনের জন্যও মন বড়ই উৎকণ্ঠিত। যাহাতে উভয় কূল রক্ষা পায় আপনি তাহার ব্যবস্থা করুন।" বাবাজী মহাশয় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ভাবে ভাবিতেছেন,—একদিকে ভক্তের উৎকণ্ঠা, অপরদিকে নিজগণের ভাবের প্রতি আঘাত। নিজগণের প্রাণের ব্যথা মিটাইবার অনেক উপায় হইতে পারে, কিন্তু ভক্তের প্রাণের দুঃখ মিটাইবার ত কোনও উপায় নাই। বিশেষতঃ বিদেশী ভক্ত; আজ তাঁহাদের দর্শন না হইলে পুনর্ব্বার এরূপ সুযোগ ঘটিবে কি না সন্দেহ। ইত্যাদি নানারূপ বিচার করিয়া ভক্ত-বাঞ্ছা পূরণ করিবার জন্যই দৃঢ় সঙ্কল্প করতঃ ঠাকুর মন্দিরের দরজায় দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন—"একবার দরজা খুলিয়া দাও, আবার বন্ধ করিলেই হইবে।" সেবকগণ একনিষ্ঠ ভাবে ঠাকুর সাজাইতেছেন, এ অবস্থায় খোলা অসম্ভব বিবেচনায় কোনই উত্তর করিলেন না। ইনি পুনঃ পুনঃ ডাকিতেছেন, এমন কি হাতের দ্বারা দরজার উপর আঘাত করিয়া পর্যন্ত খুলিবার জন্য বলিতেছেন, তথাপি ভাব-নিষ্ঠ সেবক ভাবের অভাব মনে করিয়া কিছুতেই দরজা খুলিলেন না! এদিকে ভক্তগণ অত্যন্ত দুঃখিত হইতেছেন দেখিয়া অবশেষে ইনি দরজার কবাটের উপর সজোরে এক পদাঘাত করিলেন, তাহাতেও কবাট খুলিল না দেখিয়া দ্রুতপদে অপর দরজা দ্বারা মন্দিরে প্রবেশ করিবেন, এই সময় পশ্চাদ্‌ভাগ হইতে ললিতা দাসী বলিল—"বাবু ভক্তদিগের বাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য রাই রাজা করা অপেক্ষা না করাই ভাল ছিল।" বাবাজী মহাশয় পশ্চাৎ ফিরিয়া উহাকে দেখিবামাত্র বাম হাতে উহার গালে এক চাপড় মারিয়া মন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক দরজা খুলিয়া দিলেন। ভক্তগণ দর্শন করিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন। এদিকে সেবকগণ ও অন্যান্য সঙ্গিগণ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া পড়িলেন। কেহ বা ধৈর্য্য ধরিতে না পারিয়া অবশেষে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। নানা বিভ্রাটের জন্য কিছু সময় কীর্ত্তন বন্ধ হইল। পরে বাবাজী মহাশয়ের বিশেষ

চেষ্টায় ত্রিভঙ্গদাদা রাই রাজার কয়েকটি পদ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন বটে; কিন্তু সেরূপ আনন্দ হইল না। যাঁহারা নৃত্য করিবার জন্য সুসজ্জিত ছিলেন, তাঁহাদিগকে নৃত্য করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেও তাঁহারা আর নৃত্য করিলেন না। অতি অল্প সময়ের মধ্যে আশ্রম একেবারে জন্যশূন্যের ন্যায় নীরব অবস্থা ধারণ করিল। ঠাকুরের ভোগ রাগ হইয়া গেল। সেবকদের মধ্যে প্রায় অনেকেই প্রসাদ গ্রহণ করিলেন না। অন্যান্য যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা মহাপ্রসাদ পাইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। বাবাজী মহাশয় কিঞ্চিৎ প্রসাদ গ্রহণ পূর্ব্বক বিশ্রাম করিলেন। পরদিবস প্রভাতে বাবাজী মহাশয় ললিতা দাসী, কুসুমমঞ্জরী দাসী, কিশোরী দাসী প্রভৃতিকে ডাকিয়া বলিলেন— "দেখ, কাল আমি তোমাদের প্রাণে বড়ই আঘাত দিয়াছি। এ আঘাতটি যে আমি অজ্ঞাতসারে দিয়াছি তাহা নহে, জানিয়া শুনিয়াই তোমাদিগকে দুঃখ দিয়াছি। তোমরা সরল প্রাণে বল দেখি, ইহাতে আমার কি শাস্তি পাওয়া উচিত? কেবল যে তোমাদের প্রাণেই আঘাত দিয়াছি তাহা নহে; আমার বিশ্বাস—শ্রীরাধারাণী এবং রাধাকান্তও আমার ব্যবহারে দুঃখ পাইয়াছেন। আমি ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া যখন নিকুঞ্জের দরজায় পদাঘাত করিয়াছি, তখন আর আমার তোমাদের সহিত একত্র বাস বা আহার-ব্যবহার করা সম্পূর্ণ অন্যায়। আমি আজ হইতে নৃসিংহদেবের উপাসক বলিয়া পরিচয় দিব। রাধাগোবিন্দ বা নিতাই গৌরাঙ্গের দাস বলিয়া পরিচয় দেওয়া কোনমতেই উচিত নহে। শ্রীরাধাকান্ত দেব যেরূপ ভাবে নীচে বসিয়াছিলেন, যদি আমার লাথিতে দরজা খুলিয়া যাইত, তবে না জানি কি সর্ব্বনাশই হইত! অতএব আমি আর এই আশ্রমে থাকিবার উপযুক্ত নহি।" বলিয়া যেমনি গমনোদ্যত হইলেন অমনি সকলেই ইঁহার চরণ ধারণপূর্ব্বক সাশ্রু-গদগদকণ্ঠে বলিতে লাগিল "আমাদের অপরাধ মার্জ্জনা করুন, আমরা বুঝিতে না পারিয়া আপনার

আদেশ লঙঘন করিয়াছি। আমরা যখন আপনার অনুগতা দাসী, আপনার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া আপনার কৃপাদত্ত সেবা করিতেছি, তখন আপনার বাক্যের ভাল মন্দ বিচার করিবার আমাদের অধিকার কোথায়? অবিচারে আপনার আদেশ পালন করাই ত আমাদের কর্ত্তব্য? অতএব আপনি আমাদের অপরাধ ক্ষমা করুন!" বাবাজী মহাশয় বলিলেন—"না তোমাদের ত কোনই অন্যায় হয় নাই। তোমরা ত উপযুক্ত কার্য্যই করিয়াছ। তোমরা ত আমার কথা ছাড়া কোন কার্য্য কর নাই। আমিই ভ্রমঃবশত আমার পূর্ব্ব কথা ভুলিয়া গিয়া তোমাদিগকে অশেষ দুঃখ দিয়াছি। তোমরা আর বাধা দিও না; আমার অন্তঃকরণের বৃত্তি যে কয়েকদিন পরিবর্ত্তন না হইবে, সে কয়দিন আমি স্থানান্তরে বাস করিব। তোমাদের কোনই ভয় নাই, তোমাদের ব্যবহারে আমি বিশেষ সুখী হইয়াছি। তোমরা সকলে মিলিয়া ভগবৎসেবা কর। ভাগ্যে যখন ঘটিবে, আসিয়া তোমাদের সহিত সেবায় যোগ দিব।" বলিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন। "তথাপি গুরুর ধর্ম্ম গৌরব বর্জ্জিত" এই বাক্যের একমাত্র আশ্রয় স্বেচ্ছাময় স্বতন্ত্র প্রভুর উপস্থিত ব্যাপারে সঙ্গিগণ কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় ভাবে মৃতপ্রায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইনি শ্রীজগন্নাথ দেব দর্শন করিয়া প্রাণবল্লভ মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সঙ্গিগণ অনেকেই সন্ধান পাইয়া সে স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলে সকলকে বিদায় দিয়া কেবল প্রেমদাকে কাছে রাখিলেন। উহার উপর আদেশ যে "একপোয়া ডা'ল, একপোয়া চাল, আধপোয়া লঙ্কা-মরিচ, আধপোয়া জিরা-মরিচ, আধপোয়া হলুদ প্রভৃতির দ্বারা খিচুড়ি পাক করিয়া গরম গরম শ্রীনৃসিংহদেবের ভোগ লাগাইবে। কারণ, বর্ত্তমান অবস্থায় আমার রাধা গোবিন্দ বা নিতাই গৌরাঙ্গের প্রসাদ পাইবার অধিকার নাই।" প্রেমদাদা আদেশানরূপ কার্য্য করিতে লাগিলেন। প্রায় পনেরদিন এইরূপ অবস্থায় থাকিলেন। এদিকে আশ্রম বাসিগণ বাবাজী মহাশয়ের আশ্রমে

প্রত্যাগমন কামনায় এই পনের দিনের মধ্যে তিনটি অষ্টপ্রহর, দুইটি চব্বিশ প্রহর নাম কীর্ত্তন করিলেন। করুণাময়ের করুণা হইল। শেষ চব্বিশ প্রহরের পরদিবস ইনি আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। সঙ্গিগণের মনে আনন্দ আর ধরে না। পূর্ব্ববৎ আনন্দ উৎসব চলিতে লাগিল। এই হইতে সেবা এবং কীর্ত্তন, এই উভয়ের বিশেষ ভাবে সমন্বয় রাখিয়া যাহাতে কোনওরূপ রসাভাসদোষ না ঘটে, সেইরূপ ভাবে সেবকদিগকে উপদেশ প্রদান করতঃ তাহা রক্ষা করিবার জন্য নিজে বিশেষ ভাবে যত্নবান্ হইতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীরাধাবিনোদের শুভাগমন।

একদিন বেলা অনুমান এগারটা—বাবাজী মহাশয় ঝাঁজপিটা মঠে বসিয়া আছেন, এই সময় কলিকাতা হইতে পুলিনদার একখানি পত্র আসিল। পুলিন দাদা লিখিয়াছেন—"কলিকাতায় আমাদের কোন একটী নিরপেক্ষ স্থান নাই। রাম দাদা প্রভৃতি আমাদের যে সমস্ত বিরক্ত গুরুভাইগণ প্রায় অধিক সময়ই কলিকাতায় থাকেন. কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থান না থাকায় উঁহাদের বড়ই কষ্ট হয়। এই কারণে আমরা কয়েকজন গৃহস্থ গুরুভাই পরামর্শ করিয়া মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে একটি দোতলা বাড়ী চল্লিশ টাকা ভাড়ায় ঠিক করিয়াছি, স্থানটি মঠ হইবার উপযুক্ত। সমস্তই ঠিক হইয়াছে, কেবল আপনার আদেশ হইলেই সকলে সেই মঠে গিয়া বাস করিতে পারেন এবং আমরাও অবকাশ মতে ঐ স্থানে গিয়া সংকীর্ত্তনাদিতে যোগ দিতে পারি।" পত্রখানি পড়িয়া ইনি একটু মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"বাড়ী ভাড়া করিয়া মঠ করিলে সেই মঠ কতদিন স্থায়ী হইবে? অবশেষে অশান্তির কারণ হইবে। যাহা হউক, নূতন উৎসাহ—যতদিন চলে চলুক।" বলিয়া পত্রের উত্তর দিলেন। ৬৬নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটস্থ বাড়ীতে

যথানিয়মে মঠ স্থাপিত হইল। পরমানন্দে প্রায় ছয় মাস গত হইয়া গেল। কলিকাতাবাসী এবং বিদেশাগত ভক্তগণ সকলেই অবগত হইলেন যে মির্জ্জাপুর মঠে গেলেই বাবাজী মহাশয়ের পুরী থাকা না থাকা এবং অন্যান্য যাবতীয় সংবাদ পাওয়া যাইবে। যাঁহার যাহা প্রয়োজন তিনিই মঠে গিয়া জানিতে লাগিলেন। একদিন বেলা অনুমান চারিটার সময় একটি বাঙ্গালী ব্রহ্মচারী আসিয়া একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এইটি কি মির্জ্জাপুর মঠ? এই মঠে রামদাস বাবাজী প্রভৃতি থাকেন?" পুলিনদাদা তখন মঠে কি উপস্থিত ছিলেন, তিনি বলিলেন—"আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি কোথা হইতে আগমন করিয়াছেন? এবং রামদাস বাবাজীর খোঁজ করিতেছেন কেন?

ব্রহ্মচারী। আপনার কি নাম?

পুলিন। আজ্ঞে! আমার নাম শ্রীপুলিনবিহারী মল্লিক।

ব্রহ্মচারী। আমি আপনাকেই খুঁজিতেছিলাম। আমি বহুদিন হইতে একাকী নানা দেশ-দেশান্তর ঘুরিয়া বেড়াই। প্রায় অধিকাংশ সময়ই হরিদ্বারের ঐদিকে থাকি। একদিন হরিদ্বার পাহাড়ের কোন উপত্যকায় রাত্রে শয়ন করিয়া আছি। অর্দ্ধ নিদ্রিত অবস্থায় হঠাৎ কে যেন আমার শিয়রে বসিয়া জলদগম্ভীর স্বরে বলিল—"আমি এই পার্ব্বত্য ভূমির মধ্যে প্রস্তর চাপা আছি, তুই আমাকে তুলিয়া সেবা কর্। আমার যথাযথ বিবরণ পরে জানিতে পারিবি।" আমি ঐ অবস্থায়ই জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনি কে? আপনার নাম কি? তখন আবার শব্দ হইল, আমার নাম—**বিনোদবিহারী**। তুই আমাকে তুলিয়া সেবা কর্, আমি তোকে সমস্ত বিবরণ বলিব।' আমি হঠাৎ চক্ষু মেলিয়া দেখি কোথাও কেহ নাই। উঠিয়া চারিদিকে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াও কোন খোঁজ পাইলাম না। ভাবিলাম—আমি এরূপ ভাবের স্বপ্ন ত আর কখনও দেখি নাই। যদি যথার্থই ঠাকুরের আদেশ হয়, তবে আমি এই পর্ব্বতের মধ্যে অনির্দ্দিষ্ট ভাবে

কি করিয়া তাঁহার সন্ধান পাইব? তাঁহার আদেশই বা কিরূপে লঙঘন করি? ইত্যাদি নানারূপ চিন্তা করিতে করিতে রাত্র প্রভাত হইল। সূর্য্যের আলোকে চারিদিক আলোকিত হইল। আমি নিকটবর্ত্তী স্থান সকল পরিভ্রমণ করিতে লাগিলাম; কিন্তু কোনরূপ সন্ধান পাইলাম না। তবে একটি স্থান গাছ-গাছড়ায় বেষ্টিত দেখিয়া মনে সন্দেহ হইল যে, এই স্থানে লোকের গতাগতি নাই, সে কারণ এই স্থানেই অনুসন্ধান করিলে হয় ত কোনওরূপ নিদর্শন পাওয়া যাইতে পারে। আবার মনে ভাবিলাম—এত বন-জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া যদি নিরাশ হইতে হয়, সেও ত বড় দুঃখের বিষয়। যাহা হউক, পুনর্ব্বার কোনও নির্দ্দিষ্ট ভাবে প্রত্যাদেশ না পাইলে কোনও কার্য্য আরম্ভ করা হইবে না। এইরূপ সঙ্কল্প স্থির করিয়া যথাসময়ে মহাপ্রসাদ গ্রহণ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ বিশ্রামের ভান করিয়া শয়ন করিয়া রহিলাম। মনে মনে আশা যে, গতরাত্রের ন্যায় যদি কেহ আসিয়া কিছু বলেন, কিন্তু দিবসে আমার ভাগ্যে কিছুই ঘটিল না। রাত্রে শয়ন করিলাম, নানারূপ চিন্তায় বেশ গাঢ় নিদ্রা হইল না। শেষ রাত্রে অর্দ্ধনিদ্রিত অবস্থায় দেখি যে, অনুমান দশ এগার বৎসর বয়স্ক একটি অতি সুন্দর কৃষ্ণবর্ণ বালক আমার শিয়রে বসিয়া হাসিমাখা মৃদু মধুর কণ্ঠে বলিলেন—"দেখ বাবা। তুমি যে স্থান মনে মনে ধারণা করিয়াছ, আমি সেই স্থানেই আছি। আমার বড়ই কষ্ট হইতেছে। তুমি যত সত্বর পার আমাকে বাহির করিয়া সেবা কর। ক্ষুধা ও পিপাসায় আমার বড়ই কষ্ট হইতেছে।' শুনিয়া আমি চোখের জল রাখিতে পারিলাম না। কাতরকণ্ঠে বলিলাম—''আমি ভিখারী ব্রহ্মচারী, আমি কিরূপে ঐ বন কাটাইব? উহা ত বহু অর্থব্যয় সাপেক্ষ'। অমনি তিনি বলিলেন—"কোনই চিন্তা নাই, তুমি কেবল মাত্র উদ্যোগী হও, আপনা আপনিই সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইবে।" সেই সুধামাখা আশ্বাসবাণীতে আমার মন প্রাণ জুড়াইয়া গেল। চক্ষু মেলিলাম, আর কিছুই নাই। প্রাণে বড়ই কষ্ট হইল। মনে

মনে কতই দুঃখ করিতে লাগিলাম যে প্রভু হে! আমি কেন নয়ন মেলিলাম! হায়রে! যদি নয়ন না মেলিতাম, তবে ত মনপ্রাণমাতান সেই সুধামাখা কথা শুনিয়া আরও কিছুক্ষণ কর্ণ শীতল করিতে পারিতাম। আহা মরি! আর কি সেইরূপ কথা শুনিতে পাইব? ইত্যাদি নানারূপ ভাবনা করিতে করিতে রাত্র প্রভাত হইল। আদিষ্ট স্থানে গমন করিয়া ভাবিতেছি যে, কিরূপে এই জঙ্গল কাটাইবার ব্যবস্থা করাইব? আমি ত এ স্থানের কোন বিষয়েই অভিজ্ঞ নহি। মাত্র সাড়ে চারিটী টাকা আমার হাতে আছে, ইহার দ্বারাই বা আমি কি করিব? যাহা হউক, তিনি আদেশ করিয়াছেন যে, "তুমি কেবল উদ্যোগী হও, আপনা আপনি সমস্ত যোগাড় হইয়া যাইবে।" বেশ! আমার সাধ্যানুসারে আমি চেষ্টা করি, এই ভাবিয়া লোকালয়ের দিকে নামিয়া যাইব এই সময় তিনটী স্ত্রীলোক এবং দুইটী পুরুষ দুইখানি কুঠারী হাতে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি একটু বিস্মিতভাবে উহাদিকে জিজ্ঞাসা করিলাম—হ্যাঁ গা! তোমরা কোথায় যাইতেছ? উহাদিগের মধ্যে একটী পুরুষ বলিল—"বাবা! আমারা কাঠুরিয়া, কাঠ কাটিতে যাইতেছি।"

আমি। তোমরা কাঠ কাটিয়া কি করিবে?

কাঠুরিয়া। আমাদের এই ব্যবসা। কাঠ লইয়া বিক্রি করিব; সেই পয়সা দ্বারা আমাদের খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিব।

আমি। আচ্ছা বাবা! আমি একটী জায়গা দেখাইয়া দিলে, সেই স্থানের কাঠ কাটিতে পারিবে?

কাঠুরিয়া। কেন পারিব না? আমাদের কাঠ পাইলেই হইল।

শুনিয়া আমি পরমানন্দিত চিত্তে তাদাদিগকে সেই জঙ্গলের কাছে লইয়া গিয়া বলিলাম—"প্রথমতঃ ইহার ভিতরে প্রবেশ করিবার মত একটী প্রশস্ত রাস্তা করিতে হইবে, তৎপরে যাহা করিতে হয় দেখিয়া বলিব। তখন স্ত্রীলোক

কয়টী বলিল—“বাবা! এই কাঁচা কাঠ ত আজ বাজারে কেহ কিনিবে না, তবে আমরা কি খাইব? আমি উহাদিগকে সেদিনকার মত কিছু পয়সা দিতে স্বীকার করায় উহারা কাটিতে আরম্ভ করিল। বেলা চারিটার সময় আমি উহাদিগকে পাঁচ সিকা পয়সা দিলে উহারা পরমানন্দিত হইয়া আগামী দিন আসিয়া সমস্ত পরিস্কার করিয়া দিতে স্বীকৃত হইল। পরদিবস উহারা আট দশজন আসিয়া রীতিমত রাস্তা পরিস্কার করিয়া দিলে উহাদিগকে সঙ্গে লইয়া বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখি—আট হাত পরিমান স্থান পরিস্কৃত রহিয়াছে। অন্যান্য ভূমি অপেক্ষা ঐ ভূমিটী প্রায় দেড় হাত উচ্চ। আমার মনে দৃঢ় ধারণা হইল যে, ঠিক এই স্থানেই ঠাকুর আছেন। কাঠুরিয়াদের ঐ উচ্চ স্থানটী খুঁড়িতে বলায় উহারা বলিল “আমরা কেবল কাঠ কাটা অস্ত্র ভিন্ন আর কোনও অস্ত্র আনি নাই, কাল লইয়া আসিব।” আমিও অগত্যা তাহাতেই স্বীকৃত হইয়া উহাদিগকে চারি আনা হিসাবে মজুরী দিয়া দিলাম। উহারা চলিয়া গেলে উৎকণ্ঠা বশতঃ আমি অন্যত্র না গিয়া ঐ উচ্চ ভুমির এক পার্শ্বেই শয়ন করিয়া রহিলাম। রাত্র অনুমান চারিটার সময় পূর্ব্ব পরিচিত সেই সুমধুর কণ্ঠে আদেশ হইল যে, তুমি যাহা ঠিক করিয়াছ আমি সেইস্থানেই আছি। ঠিক মধ্যস্থলে অতি অল্প খুঁড়িলেই আমার নিদর্শন মিলিবে। সুমধুর কণ্ঠে আশ্বাসবাণী পাইয়া পরম তৃপ্ত হইলাম। পরদিবস যথাসময়ে পূর্ব্বোক্ত কাঠুরিয়াগণ আসিলে উহাদিগকে নির্দিষ্ট স্থান দেখাইয়া অতি ধীরে ধীরে খুঁড়িতে বলিলাম। উহারাও আমার কথামত একটী স্থানে অনুমান এক হস্ত পরিমিত গর্ত্ত করিবামাত্র শ্রীমূর্ত্তির দর্শন পাওয়া গেল। উপস্থিত সকলেই শ্রীমুর্ত্তি দর্শন করিয়া পরম বিস্মিত হইতে লাগিল। অনেকটা স্থান খুঁড়িয়া তবে দুইটী অপূর্ব্ব দারুময়ী মূর্ত্তি বাহির করা হইল। মূর্ত্তি দেখিয়া কে বলিবে যে, মূর্ত্তি মৃত্তিকা সংস্পর্শে অবস্থান করিয়াছিলেন। এমন উজ্জ্বল জ্যোতিঃসম্পন্ন আমরা আর কখনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। এদিকে প্রভুর ইচ্ছায় দুইটী একটী

করিয়া লোক আসিতে লাগিল। সকলেই আনন্দিত। অনেকেরই কৌতুহল যে, শ্রীমূর্ত্তির বিবরণ জানিবেন। প্রভুর আদেশ না থাকায় আমি কাহারও নিকট কিছুই বলিলাম না বটে, কিন্তু কাঠুরিয়াগণের নিকট যথাযথ বৃতান্ত শুনিয়া লোকপরস্পরায় প্রকাশ হইয়া গেল। শ্রীমূর্ত্তির সঙ্গে একজোড়া কোশা-কুশী, একটী কমণ্ডলু, একখানি তাম্রকুণ্ড, একখানি ছোট থালা, দুইটী ছোট ছোট বাটী এবং আমার সঙ্গে একটী কমণ্ডলু ছিল, উহার দ্বারাই এক প্রকারে সেবা চলিতে লাগিল। এইরূপ ভাবে কয়েক বৎসর কাল আমি পরমানন্দে সেবা করিতেছিলাম ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাতেই হউক বা আমার দুর্ভাগ্য বশতঃ কোন রূপ অপরাধেই হউক, একদিন রাত্রে আমাকে আদেশ করিলেন যে—"আমাকে পুরী ধামে রাখিয়া আইস।" নিদ্রাভঙ্গের পর আমি অতিশয় দুঃখিত হইয়া বলিতে লাগিলাম—"হা প্রভু! আমি এমন কি গুরুতর অপরাধ করিলাম যে, আমায় সেবা হইতে বঞ্চিত করিলে? এস্থান হইতে শ্রীধাম পুরী বহুদূর; তাহাতে তুমি এই নব কৈশোর মূর্ত্তি, আমি একা কিরূপেই বা তোমাকে লইয়া যাইব? বিশেষতঃ আমি কাহাকেও চিনি না, আমার কথা বিশ্বাস করিয়া তোমাকে কেহ গ্রহণ করিবে কি না, আমি কি করিয়া বলিব? এইরূপ ভাবনা প্রায় সর্ব্বদাই মনে হইতে লাগিল। আবার একদিন রাত্রে আদেশ করিলেন—"বাবা! তোর কোন দোষে আমি ছাড়িয়া যাইতেছি না, আমার বড়ই ইচ্ছা হইয়াছে আমি পুরী যাইব। তুই আর কালবিলম্ব না করিয়া আমাকে পুরী ঝাঁজপিটা মঠে চরণদাস বাবাজীর নিকট রাখিয়া আয়।" ঠাকুরের একান্ত ইচ্ছা হইয়াছে জানিতে পারিয়া আমি বহুকষ্টে কলিকাতায় আসিয়াছি। এস্থানে দুই একটী লোকের নিকট চরণদাস বাবাজী মহাশয়ের কথা জিজ্ঞাসা করায় তাহারাই বলিল—হ্যাঁ, আমরা তাঁহাকে জানি বটে, কিন্তু তিনি প্রায়ই একস্থানে থাকেন না। তাঁহারই শিষ্য পুলিনবিহারী মল্লিক এবং রামদাস বাবাজী প্রভৃতি মির্জ্জাপুর স্ট্রীটে একট মঠ করিয়াছেন, আপনি সেই স্থানে গেলেই

সম্প্রতি তিনি পুরীতে আছেন কিনা, সবিশেষ বিবরণ জানিতে পারিবেন। এমন কি, তাঁহারা একটু চেষ্টা করিলে আপনার আর কোনই কষ্ট হইবে না।” তাই আমি বহু অনুসন্ধান করিয়া আপনাদের নিকট আসয়াছি। এখন এ বিষয়ে আপনাদের যেরূপ কর্ত্তব্য করুন।” ব্রহ্মচারী মহাশয়ের কথা শুনিয়া সকলেই পরমানন্দিত হইলেন। পুলিন দাদা ব্রহ্মচারী মহাশয়কে বলিলেন যে—“আপনি ঠাকুর লইয়া এইস্থানে থাকুন, আমি একবার বাবাজী মহাশয়কে একখানি পত্র লিখিয়া তিন চারদিনের মধ্যে আপনার পুরী যাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিতেছি, কোনই চিন্তা নাই।” বলিয়া বিশেষ উদ্যোগের সহিত গাড়ী করিয়া ঠাকুর মঠে আনিলেন। এদিকে বাবাজী মহাশয় ঝাঁজপিঠা মঠের পুরাতন পাকা ঘরে ঠাকুরের সেবার অসুবিধা দেখিয়া কয়েক মাস পূর্ব্ব হইতেই একখানি খড়ের ঘর করাইয়া তাহাতে ঠাকুর স্থাপন করিয়াছিলেন। এই ঘটনার প্রায় পনের দিন পূর্ব্বে একদিন অতিশয় ব্যস্ততা সহকারে “লক্ষণ মহারাণা” নামক একটী সূত্রধরকে ডাকিয়া বলিলেন—“বাবা! চারি পাঁচদিনের মধ্যে একখানি বড় খোলা সিংহাসন প্রস্তুত করিয়া দিতে হইবে।” লক্ষ্মণ বলিল—“আজ্ঞে! এই ঠাকুরের পরিমাণে একখানি সিংহাসন প্রস্তুত করিয়া দিই, বিশেষ বড় এবং খোলা করিবার প্রয়োজন কি?” তখন বাবাজী মহাশয় বলিলেন—“না বাবা! আমার আরও চারিমূর্ত্তি ঠাকুর আসিতেছেন। দুইমূর্ত্তি প্রমাণ, আর দুই মূর্ত্তি উঁহাদের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ছোট। সেই চারি মূর্ত্তি এবং এই ঠাকুর একসঙ্গে থাকিতে পারেন এরূপ সিংহাসন চাই।” বলিয়া উহাকে মাপ দিলেন, সেও চার পাঁচদিনে সিংহাসন প্রস্তুত করিয়া দিল। সিংহাসনে ঠাকুর বসাইবার সময় কিশোরী দাসী জিজ্ঞাসা করিল—আজ্ঞে! কতদিনে সেই ঠাকুর শুভাগমন করিবেন?

বাবাজী। বেশী দেরী নাই, দশ বারদিনের মধ্যেই আসিয়া পঁহুছিবেন।

কিশোরী। আজ্ঞে! কোথা হইতে ঠাকুর আসিবেন?

বাবাজী। দুইমূর্ত্তি হরিদ্বার হইতে আসিতেছেন, আর দুইমূর্ত্তি কলকাতা হইতে আসিবেন।

কিশোরী। মণিময় বিগ্রহ, কি দারুময়?

বাবাজী। চারি মূর্ত্তিই দারুময়?

কিশোরী। রাধাগোবিন্দ মূর্ত্তী, না অন্য কোনও বিগ্রহ?

বাবাজী। বড় দুই মূর্ত্তি রাধাগোবিন্দ, তাঁহারাই হরিদ্বার হইতে আগমন করিতেছেন। আর দুই মূর্ত্তি নিতাই গৌর।

কিশোরী। আজ্ঞে! উহাদের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলে ভাল হইত; কারণ তদনুযায়ী আসনাদি ঠিক করিয়া রাখা প্রয়োজন হইবে ত?

বাবাজী মহাশয় শ্রীমন্দিরে গিয়া স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। আশ্রমবাসী সকলেই কতক্ষণে ঠাকুর আসিবেন ভাবিয়া উৎকণ্ঠিত। প্রায়ই বাবাজী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করেন—"আজ্ঞে! আজও ত ঠাকুর আসিলেন না?" বাবাজী মহাশয় মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"আসিবেন বৈকি? ঠিক সময় হইলেই আসিবেন।"

একদিন বেলা চারিটার সময় কলিকাতা দর্জ্জিপাড়ার যোগেনবাবুর নিকট পত্র পাঠমাত্র খুব লম্বা নলযুক্ত একটী ফুরসী হুঁকো এবং কলিকাতায় যত দূর ভাল হইতে পারে সেইরূপ কিছু তামাক পাঠইবার জন্য একখানি পত্র লিখিলেন। লিখিবার সময় ললিতা দাসী পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল; তামাকের কথা লিখিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আজ্ঞে! তামাক কি হইবে?" বাবাজী মহাশয় বলিলেন—"যে ঠাকুর হরিদ্বার হইতে আসিতেছেন তিনি তামাক সেবা করেন। ইত্যবসরে ঠাকুরের বিবরণ সহ পুলিন দাদার একখানি পত্র আসিয়া পঁহুছিল। পত্র পাঠমাত্র ইনি হৃষ্টচিত্তে উত্তর দিলেন—"ব্রহ্মচারী মহাশয়কে আমার দণ্ডবৎ প্রণাম জানইবে, অবিলম্বে ব্রহ্মচারী মহশয়ের সহিত যাহাতে অতিসুন্দর বন্দোবস্ত মত ঠাকুর আসতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করিবে।" পুলিন দাদা বাবাজী মহাশয়ের পত্র

পাইয়া যথাযথরূপে ব্রহ্মচারী মহাশয়ের সহত ঠাকুর রওনা করিয়া দিলেন। পরদিবস বেলা অনুমান নয়টার সময় ঠাকুর আসিয়া ঝাঁজপিটা মঠে শুভবিজয় করিলেন। আতি মনোমুগ্ধকর বিগ্রহ দর্শনে সকলেই পরিতৃপ্ত। যথা নিয়মেঠাকুরের অভিষেকাদি করিয়া ঠাকুরকে মন্দিরে বিজয় করান হইল। ঠাকুরের নাম "**শ্রীরাধাবিনোদ**।" ব্রহ্মচারী মহাশয় ঠাকুরের আমূল বৃত্তান্ত সকল বাবাজী মহাশয়ের নিকট যথা যথ রূপে বর্ণনা করিয়া অবশেষে বলিলেন—"আজ্ঞে! বিনোদবিহারী তামাক ব্যবহার করিয়া থাকেন।" বলিয়া বিনোদের হুঁকো, কলিকা, তামাক বাহির করিয়া দিলেন। এদিকে যোগেনবাবুর প্রেরিত তামাক প্রভৃতিও আসিয়া ঠিক সময়ে উপস্থিত হইল। তখন বাবাজী মহশয় এবং অন্যান্য সকলেরই মত হইল যে, নূতন হুঁকোতে বিনোদকে তামাক দেওয়া হউক। তাহাই হইল। অপূর্ব্ব কৌতুহলে সেবক তামাক সাজিয়া নলটী বিনোদের হাতে অর্পণপূর্ব্বক মন্দিরের দ্বার বন্ধ করতঃ বাহিরে আসিয়া কিছুক্ষণ পরে দরজা খুলিবামাত্র দেখে যে, তামাকের ধোঁয়ায় এবং সুঘ্রাণে মন্দির পরিপূর্ণ। প্রত্যহ এইরূপ হইতে লাগিল। ব্রহ্মচারী মহাশয় কয়েকদিন মঠে থাকিয়া শ্রীবিনোদবিহারী জীউ এবং বাবাজী মহাশয়ের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক কলিকাতায় চলিয়া গেলেন।

শ্রীশ্রীনিতাই গৌরের আগমন।

একদিন প্রাতঃকালে বাবাজী মহাশয় ললিতাদাসীকে ডাকিয়া বলিলেন—"দেখ, আজ শ্রীশ্রীরাধাকান্তদেবের বাড়ীতে দুইটী ভদ্রলোক অতিথি আসিবেন; অতএব বেশ ভাল করিয়া ভোগরাগের যোগাড় কর। পায়স, পুরী, দধি সন্দেশ প্রভৃতির বন্দোবস্ত করিবে। সর্ব্বাগ্রে একটু জলখাবার এর ব্যবস্থা করা চাই। বোধ হয় তাঁহারা একটু সকালেই আসিবেন। তোমরা যত শীঘ্র হয় ভোগের

যোগাড় কর! দেখ যেন তাঁহাদের কোনওরূপ কষ্ট না হয়! দুই গাছা ফুলের মালা চাই।'' বলিয়া নিজেও যেন তাঁহাদের আগমন প্রতীক্ষায় ঠাকুরের অঙ্গনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং মধ্যে একটু চমকিতভাবে সদর দরজায় অগ্রসর হইয়া উৎকণ্ঠিত ভাবে রাস্তার দিকে তাকাইতে লাগিলেন। ললিতাদাসী প্রভৃতি আশ্রম-বাসিগণ বাবাজী মবাশয়ের এইরূপ উৎকণ্ঠা দেখিয়া বিস্মতভাবে পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন—"কি আশ্চর্য্য। কত কত সম্ভ্রান্ত, ভদ্রলোক এবং মহাত্মাগণ আসিয়া থাকেন; কিন্তু ইঁহার এইরূপ ব্যগ্রতা ত আমরা আর কখনও দেখি নাই। বিশেষতঃ তাঁহাদের অমর্য্যাদা না হয়, জলখাবার এর যোগাড় কর, দুইছড়া মালা চাই'—এইরূপ ভাষা ত আমরা আর কখনই শুনি নাই। নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে কোনও না কোন রহস্য থাকিবেই থাকিবে। আচ্ছা, আমাদের কর্ত্তব্য আমরা করি।'' এই বলিয়া সকলে স্ব স্ব সেবাকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন; কিন্তু সকলেই যেন উৎকণ্ঠিতচিত্তে কি ব্যাপার হয়, কোনমহাত্মাগণ আগমন করেন, কিরূপ ব্যবহার করিলে তাঁহাদের মর্য্যাদা রক্ষা হইবে ইত্যাদি ভাবনা করিতেছেন, আর বাবাজী মহাশয়ের আদেশমত কার্য্য করিতেছেন।

বেলা অনুমান সাড়ে নয়টার সময় কলিকাতা ইন্টালী কাঁটাল বাগানের হরিদাস দাদা দুই মূর্ত্তি দারু বিগ্রহ নিতাই গৌর সঙ্গে লইয়া সপরিবারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যদিও শ্রীমূর্ত্তি দুইটীর আকার বিশেষ বড় নয়; কিন্তু অতি মনোমুগ্ধকর মাধুর্য্য। হাসিমাখা ঢর-ঢর মুখ দুইখানি দেখিবামাত্রই যেন মনপ্রাণ গলিয়া যায়। বাবাজী মহাশয় দূর হইতে দেখিবামাত্র দ্রুতিগতি গিয়া মূর্ত্তি দুইটীকে বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক নৃত্য করিতে করিতে শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করতঃ সিংহাসনের দুই পার্শ্বে দুইটী মূর্ত্তিকে উপবেশন করাইয়া, কিশোরীদাসীকে যথাযোগ্য ভাবে সেবা করিতে বলিলেন। সর্ব্বাগ্রে মিশ্রির সরবৎ এবং বাল্যভোগ দিতে বলিয়া নিজে বাহিরে আসিবামাত্র হরিদাদা সাষ্টাঙ্গ হইয়া ইঁহার চরণে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলে বাবাজী

মহাশয় উঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই সময়ে একেবারে পুত্রপরিবারে মায় শ্রীবিগ্রহসহ এখানে আসিবার কি উদ্দেশ্য, বেশ খুলিয়া বল দেখি।"

হরিদাস। আজ্ঞে! আপনি চলিয়া আসিবার পরে কলিকাতায় এক মূহুর্ত্তও থাকিতে আমার প্রাণ মানিল না। আমি আর সে স্থানে কিছুতেই যাইব না, এখন আমাকে অঙ্গীকার করুন। এই স্ত্রী, পুত্র পরিবার ও ঠাকুর প্রভৃতি সমস্তই আমি আপনাকে অর্পণ করিলাম। আপনি এখন যাহা ইচ্ছা তাহাই করুন।

বাবাজী। বাড়ী ঘর কাহার উপর নির্ভর করিয়া আসিলে?

হরিদাস। আজ্ঞে! ঐরূপ ভাবে সমস্তকে লইয়া আসিয়াছি; আর আমাকে সে দিকের মমতায় মুগ্ধ করিয়া শ্রীচরণ ছাড়া করাইবেন না।

বাবাজী। তোমার মা এবং স্ত্রীর মত লইয়া এ কার্য্য করিয়াছ কি?

হরিদাস। আজ্ঞে! আমি একাকীই আসিবার মনস্থ করিয়াছিলাম, কিন্তু উঁহারা যখন আমার সঙ্গে আসিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন, তখন আমি বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছি যে, আমি আর কলিকাতায় ফিরিব না। নিস্কিঞ্চন ভাবে বাবাজী মহাশয়ের নিকট থাকিব। তোমরা যদি সেইভাবে থাকিতে পার তবে চল, নতুবা তোমাদের বাড়ী ঘর লইয়া তোমরা থাক। উঁহারা কিছুতেই রাজী হইলেন না। বিশেষতঃ, আজ এক মাস হইল আমার একটী কন্যা মারা যাওয়ার দরুন বাড়ীর সকলেই খুব শোক-সন্তপ্ত। প্রায় সর্ব্বদাই কান্নাকাটি করিতেছিলেন। শ্রীধামে আসিবার কথায় যেন সকলেই বিশেষ উৎসাহিত ভাবে আসিবার মত করিলেন।

ইনি আর কিছুই বলিলেন না; একটু মৃদু হাসিয়া মঠের নিকটবর্ত্তী একটী বাড়ীতে হরিদাদার মা এবং স্ত্রীর থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। হরিদাদা সম্পূর্ণ ভাবে উঁহাদের সংস্রব ছাড়িয়া মঠে রহিলেন। শ্রীশ্রীরাধাকান্তদেব আশ্রমের

অধীশ্বর; শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ জীউ এবং শ্রীশ্রীনিতাই গৌর ইঁহারা হইলেন অভ্যাগত। পরমানন্দে সেঁবা চলিতে লাগিল। সেবকগণ নিত্য নূতন বেশভূষা দ্বারা ননারূপ কৌশলে লীলারসাস্বাদন করিতে এবং করাইতে লাগিলেন। মঠে সর্ব্বদা যেন আনন্দের পাথার বহিয়া যাইতে লাগিল।

কয়েকটী প্রসঙ্গ।

একদিন প্রাতে বাবাজী মহাশয় স্নানাদি শেষ করিয়া নাম করিতে করিতে সদলে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে গমন করিলেন। কিছুক্ষণ মন্দিরে সংকীর্ত্তন করতঃ সকলকে আশ্রমে পাঠাইয়া, নিজে সমুদ্রতীরে শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুরের সমাধি-বাড়ীতে গমন করিলেন। মনে কি ভাবিলেন ইনিই জানেন—সে বেলায় আর আশ্রমে আসিলেন না দেখিয়া ফণী রাধাবিনোদ এবং উদ্ধারণ এই তিন জন ইঁহার নিকট গিয়া ইঁহাকে আশ্রমে আসিবার কথা বলায়, ইনি বলিলেন—"আমি কিছুদিন এই স্থানে নির্জ্জনে বাস করিব।" ফণী প্রভৃতি অনেক অনুরোধ করলেও যখন আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন না, তখন উহারাও সঙ্গেই রহিল। ঝাঁজপিঠা মঠ হইতে মহাপ্রসাদ পাঠাইবার প্রস্তাব করায় অসম্মতি প্রকাশ করিয়া ভিক্ষা দ্বারা হরিদাস ঠাকুরের সেবা চালাইতে লাগিলেন।

এই রূপে সাত আট দিন যায়, একদিন কৌশল করিয়া মঠ হইতে ললিতাদাসী শ্রীগোবিন্দানন্দ পরিব্রাজককে মঠের খরচার অভাব জানাইবার জন্য বাবাজী মহাশয়ের নিকট পাঠাইলেন। উঁহাদের মনের ধারণা যে, এই কথা শুনিলেই বাবাজী মহাশয় আশ্রমে আসিবেন; কিন্তু তাহা হইল না। গোবিন্দানন্দ গিয়া ইঁহাকে বলিল—"আজ্ঞে! মঠে একেবারে কিছুই নাই; শ্রীশ্রীরাধাকান্তের সেবা

বন্ধ, এমন কি জ্বালাইবার তৈলও নাই যে, ঠাকুর ঘরে রাত্রে প্রদীপ জ্বলে। আপনি একবার মঠে চলুন।" বাবাজী মহাশয় একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন— "কেন শ্রীশ্রীরাধাকান্তদেব অপেক্ষা ত আমি বেশী শক্তিমান্ নহি যে, তাঁহার সেবার জন্য আমি চেষ্টা করিব! তাঁহার যদি তেলের আলোতে থাকিতে ইচ্ছা হয়, তবে যোগমায়ার ইচ্ছায় যোগাড় হইয়া যাইবে; নচেৎ চাঁদের আলোতে থাকিবেন। কৃষ্ণসেবার দ্রব্য সঙ্কুলান শ্রীযোগমায়াদেবীর হাত! তিনি যোগাযোগ না করিলে সেবকের কি সাধ্য যে, সেবার বস্তু সংগ্রহ করে? চেষ্টা করিলেও সেটী স্বতন্ত্রতায় পরিণত হইয়া থাকে। সেব্য-সেবক এবং পতিব্রতা ও তাঁহার পতির ব্যবহার ঠিক একরূপ। পতিব্রতা স্ত্রী যেমন পতির মুখাপেক্ষী, পতিদত্ত দ্রব্যে সন্তুষ্টা। পতির সুখে সুখী, পতির উপার্জ্জিত অর্থের দ্বারা নিজ চতুরতা এবং বুদ্ধির কৌশলে পতি-সেবার প্রয়োজনীয় যাবতীয় বস্তু সংগ্রহ করিয়া পতির আজ্ঞানুবর্ত্তিনী থাকেন, স্বতন্ত্রতার কোনও কার্য্য করেন না, সেবক তেমনি প্রভুদত্ত বস্তু দ্বারা নিজ অনুরাগ ও বুদ্ধির কৌশলে নানারূপ ভাবে সেবা করিয়া প্রভুর সন্তোষ বিধান করিয়া থাকে। স্বতন্ত্রতা করিলে তিনি সহিবেন কেন? রাধাকান্তই আমাকে আনিয়েছেন, আমি ত আর তাঁহাকে আনি নাই?

গোবিন্দানন্দ। আজ্ঞে! আপনার এই কথাতে উপাসনার বিরোধ হইল না কি? শ্রীরাধাকান্তই যদি আনিবার কর্ত্তা হন বা সেবার দ্রব্য সংগ্রহকারী হন, তবে বিশুদ্ধ মাধুর্য্য রহিল কোথায়? ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণে ঐশ্বর্য্যের গন্ধ স্পর্শ হইলে ব্রজ-উপাসনা রহিল কোথায়? মা যশোমতী যদি মনে করেন যে, কৃষ্ণ যাহা মিলাইয়া দিবে তাহা দ্বারাই তাহার সেবা করিব, তবে তাঁহার শুদ্ধ বাৎসল্য-জনিত সেবার উৎকণ্ঠা, ব্যগ্রতা বা চেষ্টা থাকে কি? তিনি দিতেছেন বা দিবেন এই ধারণা হইলেই ত ঈশ্বরতত্ত্ব আসিয়া গেল। আমার পুত্র, আমার সখা, আমার প্রাণবল্লভ বুদ্ধি অন্তর্হিত হইয়া গেল।

বাবাজী। বড়ই নিগূঢ় কথা! বেশ মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর। দৃষ্টান্ত এবং দার্ষ্টান্তিক সর্ব্বাংশে সমান থাকে না। প্রায়ই কোন না কোন দুই একটি বিষয় লইয়া উপমা হয়। পতিব্রতা স্ত্রীর সহিত ব্রজ উপাসকদিগের কয়েকটি অংশে সাদৃশ্য দেখান হইয়াছে। পতিব্রতা যেমন পতির মুখাপেক্ষী, পতি-সুখে সুখী, পতিপরায়ণা এবং পতির আজ্ঞানুবর্ত্তিনী থাকিয়া সেবা করেন; ব্রজ-উপাসকগণ তেমনি সর্ব্বদা কৃষ্ণমুখাপেক্ষী, কৃষ্ণ সুখে সুখী, কৃষ্ণনিষ্ঠ এবং কৃষ্ণের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া কৃষ্ণসেবা করিয়া থাকেন। এই অংশে সাদৃশ্য। কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা কর্ত্তু সমর্থঃ প্রভুঃ। ব্রজলীলায় প্রভু শ্রীযোগমায়া, তাঁহারই ইচ্ছায় বৃন্দাবন-লীলা হইয়া থাকে। যোগমায়ার ইচ্ছায় কৃষ্ণসুখের জন্য ষড়-ঋতু বর্ত্তমান, ইচ্ছামাত্র প্রয়োজনীয় ফলফুলে বৃক্ষলতা পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। তাঁহারই ইচ্ছায় গাভীগণ দুগ্ধবতী; সুতরাং যিনি কৃষ্ণসেবা করিবেন, তাঁহার প্রভু একমাত্র যোগমায়া। প্রভুদত্ত অর্থাৎ যোগমায়া-প্রদত্ত বস্তু দ্বারা কৃষ্ণসেবা করিয়া প্রভুর অর্থাৎ যোগমায়ার সন্তোষ বিধান করিয়া থাকেন।

গোবিন্দানন্দ। 'কৃষ্ণের আজ্ঞানুবর্ত্তিনী' বলিলেন; ব্রজগোপীগণ কৃষ্ণের আজ্ঞানুবর্ত্তনী হইলে মান প্রভৃতি কিরূপে সমন্বয় হয়।

বাবাজী। ঐটি বড়ই মধুর। কৃষ্ণ-আজ্ঞায় কৃষ্ণ-আজ্ঞা লঙ্ঘন! "প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন। বেদস্তুতি হইতে সেহ হরে মোর মন।।" ইত্যাদি কৃষ্ণমুখবাক্যে কৃষ্ণসুখ হইবে জানিয়া গোপীগণ মান করিয়া থাকেন।

গোবিন্দানন্দ। আপনি যে বলিলেন—'রাধাকান্ত আমাকে আনিয়াছেন', সেটি কিরূপ হইল?

বাবাজী। প্রকৃত কথাই ত তাই; কৃষ্ণ যদি মনপ্রাণ হরণ করিয়া আকর্ষণ না করেন, তবে কি কাহারও সংসার-শৃঙ্খল ছেদন হয়; না অবিদ্যাবন্ধন মোচন হয়? তিনি কেশে ধরিয়া ঠিক কিঙ্করীগণের ন্যায় আকর্ষণ করিয়া নিয়াছেন,

তাই আমি আসিয়াছি, আমার নিজের ইচ্ছায় আজ আমি এইখানে আসিয়াছি, যখন তিনি আকর্ষণ করিবেন যাইব। তুমি গিয়া মঠে এই কথা বল।

এইরূপ ভাবে গোবিন্দানন্দকে বিদায় দিলেন। তৎপর দিবস শ্রীএকাদশী; নিরম্বু উপবাস করিবেন। ফণী, রাধাবিনোদ এবং উদ্ধারণ দাসকে নিজের তিনদিকে দাঁড় করাইয়া উচ্চৈঃস্বরে "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।" এই নাম করিতে বলিয়া নিজে সংখ্যা রাখিতে লাগিলেন।; বেলা অনুমান দশটা, এই সময় একটী লোক শ্রীজগন্নাথদেবের কিছু মহাপ্রসাদ লইয়া আসিলে বাবাজী মহাশয় সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক মহাপ্রসাদ মস্তকে ধারণ করিলেন। ঠিক ঐ অবস্থায় দিন রাত্র কাটিয়া গেল—খেয়াল নাই। পর দিবস বেলা সাতটার সময় মহাপ্রসাদের এক রঞ্চ গ্রহণপূর্ব্বক সমুদ্রে স্নান করিতে গমন করিলেন। এইরূপে হরিদাসঠাকুরের সমাধিবাড়ীতে পনের দিন থাকিয়া ষোল দিনের দিন মঠে প্রত্যাগমন করিলেন।

একদিন বাবাজী মহাশয় ঝাঁজপিঠা মঠের পঙ্গতঘরে বসিয়া আছেন, এই সময় হরিদাদা গিয়া বলিলেন—"আজ্ঞে! আমাকে দয়া করিয়া ভেক দিয়া দিন। আমার আর এইরূপে ধুতি চাদর ব্যবহার করিতে ইচ্ছা হইতেছে না।

বাবাজী। কেন তোমাদের ত ভেক হইয়াছে। শুনিয়াছি তোমাদের বিবাহের পূর্ব্বে ভেক না হইলে বিবাহই শুদ্ধ হয় না।

হরিদাদা। সে ভেক ভেকের মধ্যে নয়। কারণ 'ভেক' শব্দের অর্থ—বৈরাগ্যধর্ম্মাশ্রয়, আর সে ভেকের অর্থ হইল—সংসারে প্রবেশ। আর ভুলাইলে চলিবে না, আমাকে ভেক দিতে হইবে।

বাবাজী। যথার্থই কি আর তোমার সংসারধর্ম্ম করিবার অভিপ্রায় নাই?

হরিদাদা। আজ্ঞে! যথার্থই আর আমি সংসারে প্রবেশ করিব না। আপনি কৃপা করিয়া আমার মায়া-বন্ধন মোচন করিয়া দিন।

বলিয়া ইঁহার চরণ ধারণপূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন। ইনি উঁহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক বলিলেন—"দেখ, যদি যথার্থই বেশ পরিবর্ত্তন করিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে তোমার পিছন টান নিবৃত্তি করিয়া তবে গ্রহণ করিও; কারণ বৈরাগ্য করিয়া আবার রাজার দরবারে যাওয়া বড়ই যুক্তি-বিরুদ্ধ কার্য্য।

হরিদাদা। আজ্ঞে! আমার পিছন টান সমস্তই প্রায় মিটাইয়াছি; কেবলমাত্র কলিকাতার বাড়ীখানি আছে। সেইটী বিক্রি করিতে পারিলেই সমস্ত কার্য্য নিস্পত্তি হইয়া যায়।

বাবাজী। বেশ, তাহাই যদি মনে কর, তবে সেই কার্য্য শেষ করিয়াই পরে ভেক লওয়া উচিত।

হরিদাদা আর কোনও প্রত্যুত্তর না করিয়া কলিকাতা গমন পূর্ব্বক সাতদিনের মধ্যে বাড়ী বিক্রি করিয়া শ্রীধামপুরী উপস্থিত হইলেন। বাড়ী বিক্রির টাকা আনিয়া বাবাজী মহাশয়ের সম্মুখে রাখিবামাত্র ইনি একটু বিস্মিতভাবে বলিলেন—"ইহার মধ্যে বাড়ী বিক্রি করিয়া আসিলে?"

হরিদাদা। আজ্ঞে! আপনার অপূর্ব্ব করুণা! যাইবামাত্রই একটি গ্রাহক উপস্থিত হইল, সে যাহা বলিল আমিও তাহাতেই স্বীকৃত হইয়া রেজেষ্টারী করিয়া দিলাম।

বাবাজী মহাশয় সাশ্রুগদগদ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—"আহা মরি নবানুরাগের কি প্রবল প্রতাপ! নিতাইচাঁদ জীবের এই অবস্থাটি যদি চিরদিন সমান রাখিতেন, তবে না জানি কত কত মহৎ উদ্দেশ্য সফল হইত। তাঁহার ইচ্ছা! আচ্ছা এই টাকা তোমার মাতা ঠাকুরাণীকে না দিয়া এখানে আনিলে কেন?

হরিদাদা। আজ্ঞে! আমি একমাত্র আপনাকে ছাড়া আর কিছুই জানি না।

আমার বলিতে যাহা কিছু আছে, সমস্ত আপনার শ্রীচরণে সমর্পণ করিলাম; আমি চিরজীবনের মত আপনার আশ্রিত ভৃত্য। আমাকে আর ঐ সমস্ত মায়ার প্রলোভনে ফেলাইয়া প্রতারিত করিবেন না।

বাবাজী মহাশয় আর কিছুই বলিতে পারিলেন না। ললিতাদাসীকে আদেশ করিলেন,—"নাও এই টাকা গুলি নিয়ে ঘরে রাখ; কিন্তু সাবধান! আমি না বলা পর্য্যন্ত যেন ইহার একটি পয়সাও খরচ না হয়।"

পাঁচ ছয় দিন যায়, একদিন প্রাতঃকালে হরিদাদা ভেক লইবার জন্য বড়ই জেদ করিতে লগিলেন। কিছুতেই চরণ ছাড়িতেছেন না। চোখের জলে মুখ বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কোন রকমেই প্রবোধ মানিতেছেন না দেখিয়া, অগত্যা প্রসাদী ডোর কৌপীন পরাইয়া নাম করিতে করিতে কয়েক ঘর ভিক্ষা করিবার আদেশ করিলেন। হরিদাদা পরমানন্দে মনপ্রাণমাতান প্রেম-গদগদ কণ্ঠে "ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।" এই নাম ধরিয়া ভিক্ষা করিতে বাহির হইলেন। মরি মরি কি অপূর্ব্ব শোভা! কাঁধে ভিক্ষার ঝোলা হাতে করতাল, অবিরত ধারে দুইটি চোখের জলে বুক ভাসিয়া যাইতেছে। উঁহার তাৎকালিক অবস্থা একবার যাঁহার নয়নগোচর হইতেছে, তিনিই প্রেমাবেশে নিতাইচাঁদের কৃপার জয় দিয়া রোদন করিতেছেন। যথাসময়ে ভিক্ষা শেষ করিয়া আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যসহ যাবতীয় বাসনা কামনাদি শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে সমর্পণ করতঃ গুরুদেবের আজ্ঞার প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। বাবাজী মহাশয় বলিলেন—"দেখ সাবধান! কেবল ভেক গ্রহণ করিলেই যে হইল, তাহা নহে; ভেকের মর্য্যাদা রক্ষা করা চাই। বাহিরে সাজিলেই যে ভেক হইল তাহা নহে। গোস্বামিগণ আচরণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে আগে বৈরাগ্য, তবে বেশ। মোট কথা—আগে বস্তু ভিতরে উদয় হইয়া ক্রিয়া করিতে করিতে তবে বাহিরে প্রকাশ পায়।"

হরিদাদা। আজ্ঞে! ভেক আশ্রয়ের পরে কি কি বিধি নিষেধ পালন করিতে হয়, একবার আদেশ করুন।

বাবাজী। আশ্রয় বহু প্রকার। তন্মধ্যে কতকগুলি অবান্তর, কতকগুলি বহিরঙ্গ কতকগুলি প্রধান বা অবশ্য পালনীয়। প্রধান আশ্রয় পাঁচ প্রকার—"নামাশ্রয়, গুরুপদাশ্রয়, মন্ত্রাশ্রয়, ভাবাশ্রয় এবং বেশাশ্রয়।" এই পাঁচটি অবশ্য পালনীয়। ইহার মধ্যে "বেশ আশ্রয়" সকলের শেষ অর্থাৎ চতুর্ব্বিধ আশ্রয় গ্রহণ না হওয়া পর্য্যন্ত বেশাশ্রয় মঙ্গলপ্রদ হইতে পারে না। বেশাশ্রয়ের পরে যে যে স্থানে বৈপরীত্য দেখা যায়, সে সমস্তই জানিতে হইবে যে, চতুর্ব্বিধ আশ্রয়ের কোনও স্থানে কোনওরূপ গোল বা অভাব আছে। প্রকৃত অন্তরের সহিত যাঁহার এই পঞ্চ প্রকার আশ্রয় গ্রহণ হয়, তাঁহার কখনই পতন হইতে পারে না।

হরিদাদা। আজ্ঞে! অবান্তর আশ্রয় কি?

বাবাজী। অবান্তর আশ্রয় অনেক প্রকার; তন্মধ্যে কয়েকটি মাত্র দেখাইতেছি-এই পঞ্চবিধ আশ্রয় করিলে রূপাশ্রয় ক্রমে গুণাশ্রয়, ধামাশ্রয় লীলাশ্রয় প্রভৃতি অবান্তর ভাবে আপনিই হইয়া থাকে। যেমন "**কৃষ্ণ**" এই নামের আশ্রয় গ্রহণ হইলে কালরূপ, ভক্তানুগ্রহ, অসুর নিগ্রহ প্রভৃতি গুণ, দ্বারকা, মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি ধামের আশ্রয় আপনা-আপনিই হইয়া যায়। তৎপরে গুরু-পদাশ্রয় এবং মন্ত্রাশ্রয় হইলে নির্দ্দিষ্ট কোন ধামের এবং রূপের বিশেষভাবে আশ্রয় হয়। আবার ভাবাশ্রয় হইলে বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর প্রভৃতি বয়সের আশ্রয় এবং তত্তদবস্থাপন্ন বিষয়ের আশ্রয় আপনা-আপনিই হইয়া থাকে, উহার জন্য আর পৃথক চেষ্ঠা করিবার প্রয়োজন হয় না। "বেশ আশ্রয়" হইলে, গ্রাম্য কথা বলিবে না, শুনিবে না, বিষয়-লিপ্ত হইবে না। অর্থ সঞ্চয় করিবে না, কাম ক্রোধের দাস হইয়া ইন্দ্রিয় চরিতার্থের মানসে কখনই

স্ত্রীলোকের পানে তাকাইবে না বা আলাপ ব্যবহার করিবে না। নিজাভীষ্ট রস ছাড়া রসান্তরের প্রতি দ্বেষ বুদ্ধি বা সমালোচনা করিবে না, "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।" সর্ব্বদা এই শ্লোকের মর্ম্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া তদনুযায়ী আচরণ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে, স্ত্রীসঙ্গ বা তৎসঙ্গীর সঙ্গ, বাহ্যাড়ম্বর, অযথাভাষণ, মিথ্যা ব্যবহার, পরচর্চ্চা, পরনিন্দা, অসূয়া, হিংসা, দ্রোহ, পরচ্ছিদ্রান্বেষণ, অতিরিক্ত ভোজন, আসক্তি, বিলাসিতা, অনিবেদিত ভোজন প্রভৃতি বিশেষ যত্নের সহিত পরিবর্জ্জনপূর্ব্বক শ্রবণ কীর্ত্তনাদি নবধা ভক্তি যাজন করিবে। অধিক আর কি বলিব? যাজন করিতে থাক; যখন যেটি দরকার, মঙ্গলময় নিতাই চাঁদ হৃদয়ে স্ফুর্ত্তি করাইবেন।

হরিদাদা এতক্ষণ করযোড়ে বাবাজী মহাশয়ের কথা শুনিতেছিলেন, আর দুইটি চোখের জলে উহার মুখ বুক ভাসিয়া যাইতেছিল; যেমন ইঁহার কথা শেষ হইল, অমনি বাস্প গদগদ কণ্ঠে বলিলেন—"গুরুদেব! আমার কোনই কিছু যাজন করিবার সামর্থ্য নাই; একমাত্র **আপনার কৃপাই আমার সম্বল**।" বলিতে বলিতে শ্রীচরণ ধরিয়া সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলে বাবাজী মহাশয় উহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন দানে কৃতার্থ করিলেন এবং উহার উপর মুষ্টিভিক্ষার আদেশ করিলেন।

একদিন বেলা অনুমান চারিটার সময় শ্রীযুক্ত জগদীশ বাবুর বাড়ী হইতে তাঁহার চাকর দীনবন্ধু দাস আসিয়া বাবাজী মহাশয়কে বলিল—"উহাদের বাড়ীতে একটি লোহার সিন্দুক আছে, যদি আশ্রমের কোনও প্রয়োজনীয় কার্য্য থাকে তবে আশ্রমে আনা হউক, নচেৎ বিক্রী করা হইবে। ইনি বলিলেন— "দেখ বাবা! জগদীশ বাবু, প্যারী বাবুকে বলিবে যে, ভিক্ষার আশ্রমে লোহার সিন্দুকে রাখিবার মত বস্তু ত কিছুই দেখিতেছি না; বিশেষতঃ উহাদের

অতগুলি টাকা নষ্ট করা আমি যুক্তিসঙ্গত মনে করি না; সুতরাং বিক্রি করিতে বল গিয়া।" দীনবন্ধু বাড়ীতে গিয়া যথাযথভাবে সমস্ত কথা প্যারীবাবু এবং জগদীশ বাবুকে বলিলে, উঁহারা দুই ভাই কি মনে ধারণা করিলেন নিতাই জানেন, দুই জনেই দীনবন্ধুকে বলিলেন "দেখ দীনা! চারজন মুটে ডাকিয়া এই সিন্দুকটা ঝাঁজপিটা মঠে দিয়ে আয় ত?" দীনবন্ধু প্রথমে বলিল, "আজ্ঞে! বাবাজী মহাশয় যে নিষেধ করিয়াছেন? প্যারীবাবু বলিলেন—"তুমি বলিবে যে তিনি আপনাকে দেন নাই, তিনি রাধাকান্তদেবকে দিয়াছেন।" শুনিয়া অতিশয় হৃষ্টচিত্তে দীনবন্ধু চারজন মুটে ডাকিয়া সিন্দুকটি ঝাঁজপিটামঠে লইয়া গেলে, বাবাজী মহাশয় আমূল বৃত্তান্ত সকল একে একে প্রশ্ন করিলে, দীনবন্ধু সমস্তের উত্তর প্রদান করিল। বাবাজী মহাশয় একটু মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"বেশ! রাধাকান্তদেবের বড়লোক নাম কিনিতে ইচ্ছা হইয়াছে কিনুন, আমার আপত্তি কি?" ঝাঁজপিটামঠ সংলগ্ন দোতালার নীচের ঘরে সিন্দুকটি রাখা হইল।

কয়েকদিন যায়, একদিন ললিতাদাসী জিজ্ঞেস করিল—"আজ্ঞে! লোহার সিন্দুকে কি জিনিষ রাখা হইবে?" বাবাজী মহাশয় বলিলেন—"যিনি আনিয়াছেন তিনিই জানেন।" এই বলিয়া জগন্নাথদেবের দর্শনে গমন করিলেন। দর্শন করিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ জগন্নাথদেবের কণ্ঠমালা গাছটি খসিয়া একেবারে রত্নবেদীর উপর পতিত হইল। একজন সেবক পাণ্ডা অমনি ঐ মালাগাছটি বাবাজী মহাশয়ের গলায় দিয়া দিলেন। ইনি তখন সাশ্রুগদগদ কণ্ঠে বলিলেন, "আচ্ছা প্রভু! তোমার যাহা ইচ্ছা" বলিয়া সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক লক্ষ্মীদেবীর মন্দিরে গমন করিলেন। লক্ষ্মীদেবীর জগমোহনে এবং মন্দিরের মধ্যে অনেকগুলি কড়ির পেটারী ঝুলান আছে; কেন যেন বাবাজী মহাশয়ের ঐ পেটারীর মধ্যে একটীর লোভ হইল। একজন সেবককে বলিলেন—"বাবা! ঐ যে পেটারীটী ঝুলিতেছে ঐটী আমাকে দিবে?"

সেবক। বাবা! আজত আমার সেবার পালা নয়। যাঁহার পালা সে বলিতে পারে। বিশেষতঃ ঐ যে পেটারীগুলি আছে, ঐগুলি লক্ষ্মী পূর্ণিমার দিন ব্যতীত আর খোলা হয় না। আর ঐ যে ধানের ছড়া দেখিতেছেন, ঐগুলি ঠাকুরের নবান্নের দিন রাখা হয় এবং আবার পর বৎসর নবান্নের সময় পুরাতনগুলি নামাইয়া রাজার নহরে এবং সেবকদের ঘরে ঘরে বাঁটিয়া দেওয়া হয়। আমাদের পূর্ব্ব হইতে এইরূপ প্রথা চলিয়া আসিতেছে। আমি কি করিয়া একটী নূতন নিয়ম করিব? শুনিয়া বাবাজী মহাশয় আর কিছু না বলিয়া লক্ষ্মীদেবীকে দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্ম দর্শনে গমন করিলেন। অনুমান পাঁচ মিনিটের মধ্যে সেই সেবকটী বিশেষ ব্যগ্রতার সহিত বাবাজী মহাশয়ের নিকট আসিয়া প্রেম গদগদ কণ্ঠে বলিলেন—"বাবা! আপনি ধন্য ভাগ্যবান্ মহাপুরুষ। আপনি যাহা চাহিয়াছিলেন তাহা লক্ষ্মীদেবী কৃপা করিয়া দিয়াছেন; চলুন লইয়া যাইবেন।" শুনিবামাত্র ইনি কেমন একপ্রকার ভাবে কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া সাশ্রুগদগদ কণ্ঠে বলিলেন—"বাবা! চলুন লক্ষ্মীদেবীর কৃপাচিহ্ন দেখিয়া কৃতার্থ হই।" বলিয়া দ্রুতগতি লক্ষ্মীদেবীর জগমোহনে গিয়া দেখেন যে, যে ধানের ছড়া এবং পেটারীটী ইনি লইতে মনস্থ করিয়াছিলেন, সেই দুইটী অবিকৃত ভাবে লক্ষ্মীদেবীর সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে। দেখিয়া বিস্মিতভাবে পূর্ব্বোক্ত সেবক পাণ্ডাকে ইহার প্রকৃত বিবরণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিতে লাগিলেন—" আপনি যেমন আমার সহিত কথোপকথন করিয়া অঙ্গনে বাহির হইয়াছেন, অমনি ঐ ধানের ছড়াটী এবং ঐ পেটরীটী দুলিতে লাগিল, আমি প্রথমে মনে করিলাম যে, হয় ত বাতাসে দুলিতেছে; আবার মনে হইল যে, বাতাসে দুলিলে একটী দুলিবে কেন? এইরূপ ভাবিতে না ভাবিতেই ঐ দুইটী ছিঁড়িয়া নীচে পড়িল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অতি উচ্চস্থান হইতে পড়িয়া কোন জিনিষ ভগ্ন বা ইতস্ততঃ

ছড়াইয়া পড়া বা বিস্রস্ত হওয়া কিছুই হয় নাই, যেন কেহ হাতে করিয়া নামাইয়া রাখিল। কাজেই আমার বা অন্যান্য সেবকগণের মনে দৃঢ় নিশ্চয় হইল যে—"বড় বাবাজী মহাশয় যাহা চাহিয়াছিলেন আমরা তারা দিতে অস্বীকার করিয়াছি, লক্ষ্মীদেবী নিজে তাঁহাকে দিলেন। তাই আপনাকে ডাকিতে গিয়াছিলাম। আপনার প্রাপ্য দেবীর কৃপাদত্ত বস্তু আপনি গ্রহণ করুন।" বলিয়া উক্ত পেটারী এবং ধানের ছড়াটী বাবাজী মহাশয়ের চাদরের প্রান্তে বাঁধিয়া দিলেন। বাবাজী মহাশয় ঠিক বালকের ন্যায় উচ্চৈস্বরে রোদন করিতে করিতে বলিয়া উঠিলেন—"হা নিতাই চাঁদ। তোমার খেলা, প্রভু তুমিই জান; কত ভাবে কত লীলা করিবে, আমি ক্ষুদ্র জীব তাহার আর কি বুঝিব? যাহা হউক, তোমার কৃপার জয় হউক বলিয়া দ্রুতগতি আশ্রমে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক ললিতাদাসীর নিকট শ্রীজগন্নাথের কৃপাদত্তমালা এবং লক্ষ্মীদেবীর কৃপাদত্ত বস্তুসকল দিয়া পূর্ব্বোক্ত লোহার সিন্দুকে রাখিয়া দিতে বলিলেন এবং প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় ঐ স্থানে একটী করিয়া ঘৃত-প্রদীপ দিতে আদেশ করিলেন।

একদিন সন্ধ্যার সময় ইনি কিশোরীদাসীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন— "আজ রাত্রে বাসরশয্যা এবং কাল প্রাতঃকালে মান কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের বেশ করিতে পারিবে কি?"

কিশোরী। আজ্ঞে! আপনার কৃপা হইলে অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে— এ আর বেশী কথা কি? আদেশ করুন, কোন্ সময় কি করিতে হইবে?

বাবাজী। আমি আর কি বলিব? কীর্ত্তনের ভাবানুযায়ী আচরণ করিবে। অর্থাৎ একজন রাধারাণীর প্রতিনিধিরূপে কার্য্য করিতে হইবে!

কিশোরী। আমার প্রাণে একটী বাসনার উদয় হইয়াছে। যদি আপনি আদেশ করেন, তবে তদানুযায়ী কার্য্য করিয়া মনোবাসনা পূর্ণ করি।

বাবাজী। বল, কি মনের বাসনা! ভগবৎ-সেবা কিংবা ভগবদ্‌ভজনাকুল্যে যদি আমা দ্বারা তোমরা কোনওরূপ আনন্দ পাও, তাহাতে আমার কোনই আপত্তি নাই।

কিশোরী। আজ্ঞে! আমার ইচ্ছা যে, আপনি রাধারাণীর প্রতিনিধি স্বরূপে থাকুন; আমরা আপনার অনুগতা ভাবে সমস্ত কার্য্য করি।

কিশোরীদাসীর কথায় সকলেই পরমানন্দিত ভাবে যোগদান করিলেন; সুতরাং বাবাজী মহাশয় আর কোনই আপত্তি করিতে পারিলেন না।

কুসুমদাসী গোপীচন্দন দ্বারা ইহার নানারূপ শিঙ্গার করিয়া দিতে লাগিলেন; শিঙ্গারান্তে একখানি নীল শাড়ী পরাইয়া তুলসী কাষ্ঠের মালা এবং ফুলমালা দ্বারা নানারূপ অলঙ্কার প্রস্তুত করতঃ মনের মতন করিয়া সাজাইলেন। অতি অপূর্ব্ব শোভা। বাহিরের লোকের কথা ত দূরে থাকুক, যাহারা সঙ্গিলোক তাহারাই ইঁহার মুখ পানে তাকাইয়া চিনিতে পারিতেছেন না। যেন হাব-ভাব কটাক্ষ সমস্তই অন্যরকম! সমস্তই নূতন, সমস্তই মনোমুগ্ধকর। যাঁহারাই উপস্থিত ছিলেন, সকলেই স্ত্রীবেশ ধারণ করিলেন। হরিদাদার উপর কীর্ত্তনের আদেশে করিলে, হরিদাদা প্রথম সঙ্কেত হইতে বাসরশয্যা কীর্ত্তন ধরিলেন। এদিকে পদের ভাবানুযায়ী অভিনয় হইতে লাগিল! সংকীর্ত্তন হইতেছে বাবাজী মহাশয়ের শয়নগৃহে। কিশোরীদাসীর উপর আদেশ করিলেন—"তুমি ঠিক কীর্ত্তনের ভাবানুযায়ী রাধারাণীর যে সমস্ত আচরনীয় কার্য্য, সমস্ত শ্রীমন্দিরে আচরণ কর। কীর্ত্তনীয়া সাধকগণের উদ্দীপনের জন্য এইস্থানে একটী শয্যা রচনা করা হউক।" বলিয়া নিজের বিছানায় চাদর প্রভৃতি পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক যথাকথিতরূপে নিজে আচরণ করিতে লাগিলেন।

আনন্দের অবধি নাই। বাবাজী মহাশয় এক একবার এক একটী পদে আখর দিতেছেন, আর যেন রসের পাথার বহিয়া যাইতে লাগিল। উপস্থিত

সকলেই ভাবে নিমগ্ন। কে বলিবে লীলা অপ্রকট? সমস্ত যেন বর্ত্তমান। যখন শ্রীমতী উৎকণ্ঠিত ভাবে বিছান শেজ আবার বিছাইতেছেন, সুবাসিত তাম্বুল আবার কর্পূর-বাসিতে করিতেছেন, এই সমস্ত পদ কীর্ত্তন হইতেছে, তখন সকলেই উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া কীর্ত্তন করিতেছেন। এইরূপ পরমানন্দে সমস্ত রাত্রি কীর্ত্তন হইতে লাগিল। কাহারই বাহ্যস্মৃতি নাই, রাত্র শেষ হইল বলিয়া কেবল শ্রীমতী উক্ত—"ত্যজ সখী কানু আগমন আশ! যামিনী শেষ ভেল সবহু নৈরাশ্য।" এই পদে সকলের জ্ঞান হইল। সকলেই ভাবে বিভোর, নিদ্রা বলিয়া কোনও বস্তু কাহারও শরীরকে অধিকার করিতে পারিল না। ভোর হইতে না হইতে শ্রীশ্রীরাধাকান্তদেবের সম্মুখে গিয়া খণ্ডিতা গান আরম্ভ হইল। পদানুযায়ী ঠাকুরের বেশ করা হইয়াছে। ঠাকুরমন্দিরের দরজা খোলা হইল। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। নাগর খণ্ডিত বেশে দূরে দণ্ডায়মান, নিকটে কেহই নাই। শ্রীমতী মানিনী। নাগরকে পশ্চাৎদিকে করিয়া কম্পিত কলেবরে উপবিষ্টা—সখী মঞ্জরীগণ নীরবে দণ্ডায়মানা। এদিকে হরিদাদা বৃন্দাদেবীর ভাবাবেশে প্রথমে খণ্ডিতা, তৎপর দুর্জ্জয় মান, তৎপর কলহান্তরিতা গান করিতে লাগিলেন উহার অখরের ছটা এবং ভাবের ভঙ্গিতে ঠিক যেন বৃন্দাদেবীর ভাব প্রকাশ পাইতে লাগিল। প্রাতঃকাল হইতে গান আরম্ভ হইয়াছে; সুতরাং বাহিরের শ্রোতা অনেক সমবেত হইয়াছেন। হরিদাদার গান শুনিয়া সকলে বিমুগ্ধ। সকলেই একাগ্র চিত্তে নীরব হইয়া বিভোর ভাবে গান শুনিতেছেন। আশ্রমবাসী সকলেই সখীবেশে কীর্ত্তনানন্দে মাতোয়ারা—সকলেই ভাবে বিভোর। শ্রীমতি দুর্জ্জয় মাননিমগ্না এবং শ্রীকৃষ্ণ মানভঞ্জনের চেষ্টায় চেষ্টিত, সখী-মঞ্জরীগণ তত্তদ্‌ভাবাবিষ্টা, কে আর সেবাকার্য্য করিবে? সুতরাং ঠাকুরের রান্না প্রভৃতি সমস্তই বন্ধ। এমন কি, সে দিকে কাহারও খেয়ালই নাই।

বেলা অনুমান নয়টার সময় শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী কর্ত্তৃক প্রতারিত হইয়া শ্রীকুণ্ডের

জলে প্রাণ ত্যাগ করিবার মানসে কুণ্ডের তীরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। এদিকে শ্রীমতীর কলহান্তরিতার ভাব আসিয়া উপনীত হইল। শ্রীকৃষ্ণের জন্য উৎকণ্ঠিত এবং পূর্ব্বকৃত নিজ কর্ম্মের জন্য নিজে খুব অনুতপ্তা হইতে লাগিলেন। সখীগণ কেহ কেহ বা শ্রীমতীকে নানারূপ ওলাহন দিতেছেন, কেহ কেহ বা আবার শ্রীমতীর সান্ত্বনা করণার্থ নানারূপ প্রবোধ বাক্য বলিতেছেন। অবশেষে শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে প্রাণত্যাগে কৃতসংকল্প হইলে দূতীরা কৃষ্ণের নিকটে গমন ও কৃষ্ণকে বিদেশিনীভাবে মিলন ইত্যাদি গান হইতেছে। কাহারই বাহ্যস্মৃতি নাই। বেলা অনুমান এগারটার সময় সকলের অনিচ্ছাসত্ত্বেও গান সমাপ্ত হইল। তখন সকলেরই চমক ভাঙিল। ললিতাদাসী কয়েক জনকে সঙ্গে লইয়া বিশেষ চতুরতার সহিত রান্না করিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ঠাকুরের ভোগের ব্যবস্থা করিলেন। সখীবেশধারী কয়জন ছাড়া আর সকলেই বেশ পরিবর্ত্তন করিলেন। একমাত্র হরিদাদা আর বেশ করিবর্ত্তন করিলেন না। কেহ বেশপরিবর্ত্তন কথা বলিলেই তিনি রোদন করিতে লাগিলেন।

বাবাজী মহাশয় যথাসময়ে প্রসাদাদিগ্রহণ পূর্ব্বক একেবারে শ্রীজগন্নাথদর্শন করতঃ শ্রীরাধারমণকুঞ্জে আসিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিলেন। এদিকে হরিদাদা একবার বাবাজী মহাশয়ের দর্শন মানসে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করতঃ শ্রীরাধারমণকুঞ্জে গিয়া ইঁহার দর্শন পাইবামাত্র ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া গিয়া ইঁহার শ্রীচরণ ধারণপূর্ব্বক ব্যাকুলভাবে রোদন করিতে লাগিলেন। কেন যে কাঁদিতেছেন, কেহই অবগত নহেন। ইনি যতই জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"হরিদাস কেন কাঁদিতেছ? কি হইয়াছে প্রাণ খুলিয়া বল," হরিদাদা ততই ব্যাকুল হইতেছেন। নূতন অনুরাগের প্রাণে নূতন ভাবের সঞ্চার হইয়া চিত্তবৃত্তিকে একেবারে উদ্বেলিত করিয়া তুলিল। কার সাধ্য উঁহাকে স্থির করে? কিছুক্ষণ পরে অন্তর্য্যামী প্রভু কি ভাবিলেন ইনিই জানেন, একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"আচ্ছা প্রাণে প্রকৃত ভাবের সঞ্চার হইয়া

থাকে কর। কিন্তু বড়ই গুরুতর কার্য্য! যেন কপটতা স্পর্শ না করে! যেন কোনও কার্য্য দেখাদেখি আচরণ করিবার চেষ্টা না হয়। সর্ব্বদা মনপ্রাণকে অবরোধের মধ্যে আনিতে না পারিলে ভাবের অভাব ঘটিয়া যায়। শ্রীনিতাইচাঁদের কৃপায় যাহার হৃদয়ে যেরূপ ভাবের বিকাশ হইয়াছে, সর্ব্বদা সেই ভাবকে স্থায়ী করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। সঞ্চারী নানারূপ ভাবের বশতাপন্ন হইলে ভাবনিষ্ঠা বা রসনিষ্ঠা থাকে না; সুতরাং সে বিষয়ে বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন"। হরিদাদা এতক্ষণ নীবরে ইঁহার কথা শুনিতেছিলেন; যেমন কথা শেষ হইল অমনি গদগদকণ্ঠে বলিলেন—"প্রভু! আপনি অন্তর্য্যামী। সকলই ত অবগত আছেন। আমি আর কি জানাইব? আমার সম্বন্ধে যাহা কিছু কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সমস্তই আপনার চরণে নির্ভর। আমি কিছুতেই এই বেশ পরিবর্ত্তন করিতে পারিতেছি না। যখনই পরিবর্ত্তনের কথা মনে হইতেছে, তখনই যেন হৃৎকম্প উপস্থিত হইয়া আমাকে বিবশ করিয়া ফেলিতেছে। আমি কি করিব আদেশ করুন।"

বাবাজী। আমি প্রথমেই বলিয়াছি যে, এই বেশ বা ভাব কাহারও উপদেশে হয় না বা পরামর্শেই কার্য্য নয়। প্রভু কৃপা করিয়া হৃদয়ে যেরূপ স্ফুরণ করাইবেন, তাহাই আচরণীয়।

হরিদাদা। আজ্ঞে! আপনি কৃপা করিয়া যাহা দিয়াছেন, তাহা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অভাবনীয়। সেই কৃপাদত্ত বস্তুর আনুকূল্যে আমার কি কি আচরনীয়, সেই সেই আদেশ করিয়া অঙ্গীকৃত জীবের মনোবাসনা পূর্ণ করুন!

বাবাজী। যাহারা তোমার আদর্শস্থানীয় আছে, তাহাদের আনুগত্যে অস্বতন্ত্র হইয়া তাহাদের পন্থা অনুসরণ কর। আনুগতই ভক্তিপথের জীবন। বিনা আনুগত্যে সহস্র ভজন করিলেও ব্রজে কৃষ্ণপ্রাপ্তি সুদুর্ল্লভ। এই ভক্তির নাম হইল রাগানুগা বা ভাবানুগা ভক্তি। কোনওরূপ স্বতন্ত্রতা আসিলে আর সে স্থানে ভক্তিদেবী অবস্থান করিতে পারেন না।

হরিদাদা। সখীগণ ব্যতীত অন্যান্য গুরুভাইদিগের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে?

বাবাজী। নিজেতে গৃদস্থ গোপাজাতি, এই বৃদ্ধি রাখিয়া প্রাণিমাত্রকেই নিজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করিতে হইবে। পুরুষ-অভিমানী জীবের সহিত একত্র ভোজন, শয়ন, উপবেশন, নির্জ্জনে অবস্থান প্রভৃতি অনিষ্টকারী। নিজ নিজ ভ্লাব এবং রসের বিরপীত রসাশ্রয়ী ব্যক্তিদিগের সঙ্গ অনিষ্টকর। স্বরূপ প্রকৃতির সহিত নির্জ্জনে বাস সর্ব্বথা পরিত্যজ্য। গ্রাম্য সম্বন্ধ অর্থাৎ পূর্ব্ব সম্বন্ধীয় ব্যক্তিদিগের সহিত কোনওরূপ সংস্রব রাখিলে অনিষ্ঠ হইবে।"

ইত্যাদি নানরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া উহাকে ঝাঁজপিটা মঠে পাঠাইয়া দিলেন। অনুমান একঘণ্টা পরে নিজে মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ললিতাদাসী প্রভৃতি সকলেই জিজ্ঞাসা করিল—"আজ্ঞে! এই নব সখীর কি নাম রহিল?

বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "তোমরা সকলে উঁহার ভাব এবং স্বভাব অনুযায়ী একটা নাম নির্দ্দেশ করিয়া দাও।"

ললিতাদাসী। আজ্ঞে! আমরা আর কি বুঝিব? আপনার প্রাণে যাহা ভাল লাগে তাহাই রাখুন।

বাবাজী। গতকল্য ইঁহার যেরূপ কীর্ত্তনের ঘটকালী শুনা গেল, তাহাতে বেশ বুঝা গিয়াছে যে, ইনি দৌত্য কার্য্যে বিশেষ নিপূণা; সুতরাং উঁহার নাম বৃন্দাদাসী রাখাই উচিত।

ললিতাদাসী। আজ্ঞে! দেবীগণে দেওয়া হইল যে! এমন একটী নাম দিন যাহাতে আমাদের এইদিকে থাকে।

বাবাজী। তোমার মতে যাহার সেরূপ স্বভাবই হউক না কেন, তোমাদের গণে ভর্ত্তি করিয়া লওয়া চাই! তাহা হইলে সেখানে গিয়াও তোমার ওকালতী না করিলে চলিবে না!

ললিতাদাসী লজ্জিতভাবে আর কোন কথা বলিলেন না। বাবাজী মহাশয় বলিলেন—"এটী নিশ্চয়ই জানিও, যে যে ভাবের ভজনাই কর না কেন, কিন্তু সেস্থানে গিয়া রসের তারতম্য হইলে রসান্তরে কিংবা স্থানান্তরে যাইতে হইবে। ললিতাদেবী ঘুষখোর নহেন। ঠিক যাহার যেরূপ ভাবের যোগ্যতা দেখিবেন, তাহাকে সেই ভাবে সেই যুথে সেই সেবায় নিযুক্ত করিবেন। সেখানে অনুরোধ নাই, কেবল যোগ্যতার খেলা।" এইরূপ উপদেশের পর সমস্ত সখীদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন—"তোমরা সকলে আজ হইতে প্রত্যহ রূপ, অভিসার ও মিলন পদ গান করিবে। অর্থাৎ এইটী তোমাদের আস্বাদনীয় জিনিষ। যেন ব্যবসায় পরিণত করিতে চেষ্টা করিও না, করিলে নিজেরা বঞ্চিতহইবে।" এই হইতেই বাবাজী মহাশয়ের আদেশক্রমে রূপ, অভিসার ও মিলন গান হইতে লাগিল।

সদলে শ্রীধাম বৃন্দাবন যাত্রা।

পরমানন্দে কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁজপিটা মঠের সেবাকার্য্য চলিতে লাগিল। দিনের পর দিন যায়; দেখিতে দেখিতে শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা আসিয়া উপস্থিত হইল। বাবাজী মহাশয় পূর্ব্ববৎ পরমানন্দে স্নানযাত্রা, গুণ্ডিচা মার্জ্জন, রথযাত্রা প্রভৃতি উৎসব সমাপ্তি করিলেন।

একদিন সংকীর্ত্তনে বহুলোক সমবেত হইয়াছে; সংকীর্ত্তনের মধ্যেই ইনি সকলের নিকট শ্রীধাম বৃন্দাবন যাইবার জন্য বিদায় গ্রহণ করিতে লাগিলেন। বিদায়ের ভঙ্গি যেন একটু অন্য প্রকার; সুতরাং ভক্তগণের প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিল। সকলেই ঠিক বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। সংকীর্ত্তন সমাপ্ত হইলে ভক্তগণ সকলেই বাবাজী মহাশয়ের চরণ ধারণপূর্ব্বক

বৃন্দাবন যাত্রা স্থগিত রাখিবার জন্য ব্যাকুলভাবে অনুরোধ করিতে লাগিলেন; সুতরাং সকলের অনুরোধে সে যাত্রায় শ্রীধাম বৃন্দাবন গমন বন্ধ করিলেন। কিছু দিন পরে সরল প্রাণে পুরীবাসী ভক্তবৃন্দকে বুঝাইয়া অতি অল্প দিনের মধ্যে পুরী ফিরিবেন এইরূপ আশ্বাস-বাক্যে সকলকে আশ্বস্ত করতঃ ললিতাদাসী প্রভৃতি সখীগণকে এবং তাহাদের সাহায্যের জন্য চারি পাঁচজনকে আশ্রমের সেবাকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া সদলে শ্রীধাম বৃন্দাবন গমনার্থ কলিকাতায় রওনা হইলেন। যথাসময়ে হাওড়া ষ্টেশনে গাড়ী পৌঁছিলে সঙ্গিগণ কোথায় কাহার বাড়ী যাওয়া হইবে জিজ্ঞাসা করায়, বাবাজী মহাশয় উত্তর করিলেন, "নিতাইএর ইচ্ছায় কলিকাতায় দুইদিন মাত্র থাকা হইবে। সহরের মধ্যে গেলে সহজে বাহির হওয়া কঠিন হইবে, সুতরাং বরাহনগরে কামাখ্যা দাসের বাড়ী যাইব।" তাহাই হইল। গাড়ী করিয়া সকলে বরাহনগরে গমন করিলেন। কামাখ্য দাস বাবাজী সগণে ইঁহাকে পাইয়া পরমানন্দ সহকারে সেবা করিতে লাগিলেন।

সিউড়ী গমন ও একমাস অবস্থিতি ।

দুই দিন যায় তিন দিনের দিন প্রাতঃকালে মৃদু-মধুর বাক্যে কামাখ্যা দাস প্রভৃতি সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক সগণে সিউড়ী যাত্রা করিলেন। যথাসময়ে সিউড়ী উপস্থিত হইয়া তথাকার জমীদার শ্রীযুক্ত রাখাল দাস চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীতে অবস্থান করিলেন। রাখালবাবুর ভগিনী শ্রীমতী কুসুম কুমারী দাসীর বিশেষ আগ্রহে নবদ্বীপ নিবাসী পণ্ডিতপ্রবর শ্রীল শ্রীযুক্ত রামদাস বাবাজী মহাশয়কে একমাস শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠের জন্য নিযুক্ত করা হইল। পণ্ডিত মহাশয় সনাতনশিক্ষা পাঠ আরম্ভ করিলেন। পাঠের অগ্র পশ্চাতে বাবাজী মহাশয়ের মন-প্রাণ মাতান সংকীর্ত্তন হয়; লোকে লোকারণ্য! সিউড়ী এবং

তন্নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের লোক সকল সংকীর্ত্তন শুনিবার মানসে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই পাঠ আরম্ভ হয়। নাম-সংকীর্ত্তন দ্বারা চিত্ত-দর্পণ মার্জ্জিত হইলে ভগবৎলীলাগুণ সহজেই স্ফুর্ত্তি হইয়া থাকে। এই স্থানে আরও সুবিধা; কারণ কীর্ত্তন অন্তেই পাঠ শ্রবণ করিয়া সকলে অতি অনায়াসে ভগবৎ-লীলাগুণ ধারণা করিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতেছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যমের দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ পাঠ হইতেছে মহাপ্রভু নিজমুখে সনাতনকে লক্ষ্য করিয়া জগতের জীবগণকে শিক্ষা দিয়াছেন। উহার এক একটী কথা পণ্ডিতজী বেশ বিস্তারিতরূপে ব্যাখ্যা করিয়া সর্ব্বসাধারণের মনোরঞ্জন এবং হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিতেছেন। সকলেই পাঠ শ্রবণে পরমানন্দ লাভ করিতেছেন।

একদিন পণ্ডিত মহাশয় কথা প্রসঙ্গে নামমাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করিতে গিয়া যেন একটু কিরূপ দুই একটী কথা ব্যবহার করিলেন; অর্থাৎ উহার কথার ভাবে যেন নামের শক্তি হইতে কর্ম্মের কিঞ্চিৎ প্রাধান্য প্রকাশ পাইতে লাগিল। শুনিয়া বাবাজী মহাশয় অতি সন্তর্পনে অন্যের অলক্ষিতভাবে সেস্থান হইতে উঠিয়া কোনও নির্জ্জন স্থানে একটী বাগানের মধ্যে গিয়া বসিয়া রহিলেন। সঙ্গে দুই একটীমাত্র সঙ্গী রহিয়াছে। সেইদিন হইতে ইনি আর পাঠ শুনিতে যান না। যেমন পাঠ হইয়া যায়, অমনি কীর্ত্তন করিতে যান। জানি না প্রভুর কি অভিপ্রায়। তিন চার দিন পণ্ডিতজী ঠিক ঐরূপ ভাবের সিদ্ধান্তই করিতে লাগিলেন। শ্রোতাদের মধ্যে অনেকের মনেই আঘাত লাগিতে লাগিল। একদিন কয়েকটী ভক্ত একত্র হইয়া বাবাজী মহাশয়ের নিকট গমনপূর্ব্বক একটু ব্যথিত হৃদয়ে পাঠক পণ্ডিতের সিদ্ধান্ত লইয়া সমালোচনা করতে লাগিলে, ইনি বলিলেন—"বাবা! স্থির হও, এই স্থানে নানাজাতীয় লোক মিলিত হইয়া থাকে। ভিন্ন জাতীয় লোকদিগকে মনস্তুষ্টি মানসে বোধ হয় নিতাইচাঁদ ঐ একরূপ ভঙ্গি করিয়াছেন। একটু ধৈর্য্য ধর, পরমানন্দ পাইবে। যে মুখে তোমরা আজ ঐরূপ

কথা শুনিয়াপ্রাণে একটু আঘাত পাইতেছ, কয়েকদিন গেলে সেই মুখে ভগবৎ-নামপ্রসঙ্গে নামমাহাত্ম্য শুনিয়া পরমানন্দ লাভ করিবে, চিন্তা কি? সহস্র লোক পরিবেষ্টিত সভার মধ্যে একটী বক্তার মুখ নির্গত দুই চারিটী কথা দ্বারাই যদি সর্ব্বসাধারণের সন্দেহ ভজন হইয়া যাইবে, তবে আর স্বজাতীয় সাধুর সঙ্গ বা গুরুপদাশ্রয় গ্রহণের কর্ত্তব্যতা থাকে কোথায়? পাঠ কীর্ত্তনাদি শ্রবণ করিতে গেলে সর্ব্বাংশই যে সকলের প্রয়োজনীয় হইবে, তাহা নয়; উহার মধ্যে অধিকারী ভেদে কিছু ছাঁটকাট না দিলে চলিবে কেন?" ইত্যাদি নানারূপ সান্ত্বনা-বাক্যে লোকদিগকে নামমাহাত্ম্য বিশেষভাবে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। ইনি প্রায় সর্ব্বদাই ঐ বাগানে বসিয়া থাকেন। এক একদিন প্রাতঃকালে নাম লইয়া নগর ভ্রমণ করিতে গমন করেন, নগরকীর্ত্তনে পরমানন্দ লাভ হইয়া থাকে। গ্রামবাসী আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলেই আসিয়া নামে যোগ দিয়া থাকে। যে সমস্ত কুলবতী স্ত্রীলোক ঘরের বাহিরে গিয়া ইঁহাদের কীর্ত্তন শুনিতে অক্ষম, নগরকীর্ত্তন দ্বারা তাহাদের সেই বাসনা পূর্ণ হইতে লাগিল।

একদিন প্রাতঃকালে বাবাজী মহাশয় বাগানের মধ্যে একটি উচ্চ স্থানে বসিয়া আছেন—কুঞ্জলাল গোস্বামী, রামদাদা, ফণী, রাধাবিনোদ, উদ্ধারণদাস, শীতলদাস প্রভৃতি কয়েকজন ইঁহার সঙ্গে রহিয়াছেন। হঠাৎ কি মনে হইল, সকলকে ডাকিয়া বলিলেন—"দেখ, সকলে উচ্চৈঃস্বরে নাম কর; বেশ মনে প্রাণে নাম করা চাই, নামে যাহার প্রেম না হইবে তাহাকে আমার সঙ্গ ছাড়িয়া স্থানান্তরে যাইতে হইবে।" কঠোর আদেশ শ্রবণে সকলেই অতিশয় ব্যাকুল অন্তঃকরণে নাম করিতে লাগিলেন। নিতাই চাঁদের কি ইচ্ছা! আধঘণ্টা যাইতে না যাইতে অশ্রু, কম্প, পুলক প্রভৃতি সাত্ত্বিক বিকারগণ সমকালীন সকলের দেহ অধিকার করিল। যাঁহারা আগন্তুক—ইঁহাদের অনতিদূরে বসিয়া বা দাঁড়াইয়া নাম শুনিতেছিলেন, তাঁহারাও প্রেমে উন্মত্ত। বাবাজী মহাশয় একেবারে ভাবাবেশে অচৈতন্য হইয়া

পড়িলেন। অষ্ট সাত্ত্বিক বিকারগণ ইঁহার দেহ আচ্ছাদন করিয়া ফেলিল। একেবারে বাহ্যস্মৃতি নাই দেখিয়া কেহ কেহ প্রেমগদগদকণ্ঠে নাম করিতে লাগিলেন, আর যথাবিধি ইঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। প্রায় দুইঘণ্টা পরে অনেক শুশ্রূষার পর কিঞ্চিৎ অর্দ্ধ বাহ্য দশা লাভ করিয়া বাস্প-গদগদ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—"আহা মরি এই সেই রাঢ়দেশ! যাঁহ' কিনা আমার নিত্যানন্দ প্রভুর বিলাস-ভূমি। প্রভু আমার এই সব স্থানে কতই না লীলা করিয়াছেন! সঙ্গী বালকগণের সহিত কত না বাল্যখেলা করিয়াছিলেন! এই দেশের প্রতি বৃক্ষলতার প্রতি রেণুতে রেণুতে ভাবপ্রেম-রসখনি শ্রীনিতাইচাঁদের শক্তি বিরাজিত রহিয়াছে। নিতাইএর কৃপায় এ দেশের সর্ব্বত্র ভক্তির সঞ্চার হইয়াছে। হা নিতাই! তোমার নিত্য বিহারভূমি এই প্রদেশে থাকিয়া যাহার প্রেমভক্তি লাভ না হয়, যে জন তোমার নামরসে ডুবিয়া না যায়, যাহার হৃদয় তোমার লীলাগুণে মাতিয়া না যায়, সেজন আমার ন্যায় দুর্ভাগ্য পাষণ্ড জীব।" বলিতে বলিতেই ভাবান্তর হইল। অমনি বলিয়া উঠিলেন—"আমার গৌর কাশীধাম গমন করিয়াছিলেন, আমিও কাশী যাইব। গৌর যে মায়াবাদী সন্ন্যাসীদিগকে বৈষ্ণব করিয়াছিলেন। আমি একবার তাঁহাদের চরণ দর্শনে নিজেকে ধন্য করিব। আহা মরি করুণাময় শ্রীগৌরাঙ্গের জীবের প্রতি কি অসীম করুণা! জীবের জন্য তিনি কতই না কষ্ট, কতই না লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াছেন।" ইত্যাদি নানারূপ কাতরতাপূর্ণ বাক্যে বহুক্ষণ হৃদয়ের ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অনেক শুশ্রুষার পর কিঞ্চিৎ স্থির হইয়া সকলকে বলিলেন—"দেখ তোমরা সকলে এই স্থানে থাক, আমি একাকী শ্রীধাম কাশী গমন করিব।" শুনিয়া রামদাদা বলিলেন—"আজ্ঞে! আমিও আপনার সঙ্গে যাইব।" এইরূপ নানা কথা হইতেছে, এদিকে বেলা অতিরিক্ত হইয়াছে দেখিয়া রাখাল বাবুর বাড়ী হইতে লোক আসিয়া স্নানাদি করিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল; সুতরাং সকলেই রাখাল বাবুর বাড়ীতে

গমন করিলেন। বাবাজী মহাশয় কাশীতে যাইবেন শুনিয়া রাখাল বাবুর ভগিনী কুসুমকুমারী দাসী আসিয়া সাশ্রুগদগদ কণ্ঠে বলিলেন—"বাবা! আপনি যদি চলিয়া যাইবেন তবে আর পাঠ করাইবার প্রয়োজন নাই, আজই পাঠ শেষ হইল। কারণ আপনি একমাস এই স্থানে থাকিয়া পরমানন্দে পাঠ শ্রবণ করিবেন এবং সেই উপলক্ষে আমরা আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিব এই অভিপ্রায়েই আমার পাঠ দেওয়া! যদি আপনিই না থাকেন, আমার পাঠের কোন প্রয়োজন নাই" বলিয়া ইঁহার শ্রীচরণ ধারণপূর্ব্বক কাঁদিতে লাগিলেন। কুসুমকুমারীর কাতর ক্রন্দনে উপস্থিত সকলেই কাঁদিতে লাগিলেন। হৃদয়ের সরল ভাবের নিকট সকলেই পরাস্ত। বাবাজী মহাশয় কুসুমকুমারীর পৃষ্ঠের উপর বাম হাতে এক চাপড় মারিয়া মৃদু হাসিতে হাসিতে সঙ্গিগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"কেন! এই সমস্ত মহাপুরুষদিগকে রাখিয়া যাইতেছি, তোমার চিন্তা কি? ইঁহারাই কীর্ত্তনাদি করিবেন।" কুসুমকুমারী করযোড়ে বলিলেন—"বাবা! তারকামণ্ডলী পূর্ণচন্দ্রের চারি পাশেই শাভা পাইয়া থাকে। ইঁহারা এক এক জন মহাপুরুষ—এক এক জনে ব্রহ্মাণ্ড উদ্ধার করিতে সমর্থ। তথাপি আপনার সঙ্গে থাকিলে ইঁহাদের বিশেষ শোভা হইয়া থাকে।" বাবাজী মহাশয় আর কোনও উত্তর করিতে পারিলেন না। কাশী যাওয়া বন্ধ রহিল। রামদাস পণ্ডিত মহাশয় এই সমস্ত ব্যাপার অনুভব করিয়া যেন কেমন একপ্রকার হইয়া গেলেন। সেই দিন হইতে পাঠের সুর অন্য রকম হইতে লাগিল। আগা গোড়া কেবল নাম-মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা হইতে লাগিল। অন্যান্য পাঠের মধ্যেও এক একবার নামমাহাত্ম্যের দুই একটী কথা প্রত্যহ বলাই চাই। যে যে ভক্তগণ পণ্ডিতজীর ব্যাখ্যায় নামমাহাত্ম্য ছোট এবং কর্ম্মকাণ্ডকে একটু বড় আসন দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া মনে কষ্ট পাইয়াছিলেন, আজ তাঁহারা পরমানন্দ লাভ করিলেন। পণ্ডিতজীর পাঠে পরমানন্দ হইতে লাগিল।

দিনের পর দিন যায় একদিন বাবাজী মহাশয় একখানি ঘরে বসিয়া আছেন, হঠাৎ মনে কি খেয়াল উদয় হইল—রামদাদা, রাধাবিনোদ, ফণী প্রভৃতি কয়েকজনকে আদেশ করিলেন—"সকলে উচ্চৈঃস্বরে এক লক্ষ মহামন্ত্র কীর্ত্তন কর।" সকলেই ইঁহার আদেশানুযায়ী নাম আরম্ভ করিলেন। নিজে মধ্যস্থলেবসিয়া সংখ্যা রাখিতে লাগিলেন। একঘণ্টা সময় যাইতে না যাইতেই সেই ঘর ঘামিয়া জল চুয়াইতে লাগিল, এদিকে নামের রোল ক্রমেই প্রবলভাবে ধারণ করিতে লাগিল। চারিদিক হইতে বহু লোক আসিয়া সমবেত হইতেছেন। সকলেই উপস্থিত ব্যাপার দর্শনে বিস্মিত ভাবে পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন,—"কি আশ্চার্য্য! নাম ত বহুদিন শুনিয়াছি; কিন্তু এরূপ প্রকট নামের শক্তি ত আমরা কখনও দেখি নাই! এ কি নামের শক্তি, না মহাপুরুষের শক্তি; আমরা ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।" তখন সকলেই এক বাক্যে মহাপুরুষের শক্তির জয় দিতে লাগিলেন। যথাসময়ে এক লক্ষ নাম শেষ হইলে, উপস্থিত ব্যাপার সম্বন্ধে রাখাল বাবু বাবাজী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলে ইনি বলিলেন—"দেখুন, নামের শক্তি অসীম। নাম না করিতে পারেন এরূপ কোন কার্য্য জগতে ন্যাই এমন কি, নামী যে কার্য্য সম্পন্ন করিতে অক্ষম, নাম অতি সহজেই সেই কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। "সর্ব্বশক্তি নামে দিল করিয়া বিভাগ। আমার দুর্দ্দৈব নামে নাহি অনুরাগ।" প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেঁখুন, ভক্তপ্রবর হনুমান রামনাম লইয়া নামের শক্তিতে অনায়াসে এক লম্ফে সাগর পার হইয়া গেলেন; কিন্তু রামচন্দ্র নিজে কত কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক সাগর বন্ধন করিয়া তবে পার হইলেন। এইরূপ সর্ব্বত্রই নামী অপেক্ষা নামের প্রধান্য দেখাইয়াছেন। এ আর কি সামান্য শক্তি দেখিলেন? নামে মৃত তরু মুকুলিত এবং পাষাণ দ্রবীভূত হয়।

রাখাল। আজ্ঞে! অন্যান্য সময়েও ত নাম হয়; কিন্তু কৈ এরূপ ত আর কখনও আমরা দেখি নাই!

বাবাজী। নাম সেচ্ছাময় স্বতন্ত্র বস্তু; যখন কোনও ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া ভ্রমান্ধ অবিশ্বাসী জীবগণের হৃদয়ে বিশ্বাস জন্মাইবার ইচ্ছা করিবেন তখনই ত হইবে? আমরা ইচ্ছা করিলেই যে হইবে, তাহা নয়।

রাখাল। আমার বিশ্বাস উজ্জ্বল বস্তুরও পাত্রবিশেষের সংসর্গে বিশেষ উজ্জ্বলতা প্রকাশ পায়।

বাবাজী মহাশয় আর বিশেষ কিছু না বলিয়া বলিলেন, "এ সমস্ত কথা লইয়া সমালোচনা করার কোন আবশ্যকতা নাই! নাম সর্ব্বশক্তিমান্, এই বিশ্বাস মনে দৃঢ় করিবার চেষ্টা করাই প্রয়োজন।" এইরূপ নানা কথাবার্ত্তায় সেদিন কাটিয়া গেল।

পর দিন বেলা অনুমান চারিটার সময় সঙ্গিগণ সঙ্গে বাবাজী মহাশয় খোলা মাঠের মধ্যে ভ্রমণ করিতেছেন। হঠাৎ ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ঘোড়ায় চড়িয়া ইঁহার সম্মুখ দিয়া গমন করিলেন দেখিয়া ফণী ধীরে ধীরে সঙ্গিগণকে বলিল—"সাহেবের কি স্পর্দ্ধা! বাবাজী মহাশয়ের সম্মুখ দিয়া ঘোড়ার উপর চড়িয়া গেল?" এই কথা বলিতে না বলিতেই বাবাজী মহাশয় বিশেষ ক্রুদ্ধ ভাবে ফণীকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন—উঁহারা রাজপুরুষ, শ্রীমতী মহারাণীর গণ। যখন যাঁহাকে পৃথিবী অঙ্গিকার করেন, তখন সেই দেহে অষ্টবসুর অধিষ্ঠান হইয়া থাকে, বিশেষতঃ ভগবান্ নিজ মুখে বলিয়াছেন—'নরাণাঞ্চ নরাধিপঃ' সুতরাং রাজপুরুষকে অর্থাৎ রাজপ্রতিনিধিকে অপমান করাও যা ভগবান্‌কে অপমান করাও তাই। তোমার অপরাধ হইয়াছে, যাও, উঁহার সম্মুখে গিয়া সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম করতঃ ক্ষমা প্রর্থনা কর।" বালক ফণী বিশেষ অপ্রতিভের ন্যায় ইঁহার আদেশানুযায়ী অতি দ্রুতবেগে যাইয়া সাহেবের সম্মুখে দণ্ডবৎ প্রণাম করিল। সাহেব বিস্মিতভাবে ঘোড়ার লাগাম আকর্ষণ পূর্ব্বক সেইস্থানে দাঁড়াইয়া পার্শ্বস্থ একটী লোকের নিকট বালকের আচরিত

ব্যাপারের মর্ম্ম জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বাবাজী মহাশয়ের আদেশ যথাযথরূপে সাহেবকে বুঝাইয়া দিলেন। সাহেব অতিশয় প্রীতি সহকারে ঘোড়া ফিরাইয়া বাবাজী মহাশয়ের নিকট আগমন পূর্ব্বক মাথার টুপি খুলিয়া উক্ত টুপিদ্বারা প্রণাম করিলেন।

বাবাজী মহাশয়ও প্রতিপ্রণাম করিলেন।

এইরূপে কয়েকদিন যায়, একদিন প্রাতঃকালে শীতল দাস, উদ্ধারণ, নীলমণি, নন্দকিশোর প্রভৃতি সাতজন সঙ্গীকে আদেশ করিলেন—"এই রাঢ়দেশে আমার নিতাই চাঁদের বিহারভূমি; অতএব তোমরা পদব্রজে অযাচক বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক প্রথমে হেতমপুর শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ জীউ, ক্রমে ময়নাড়াল শ্রীমন্মহাপ্রভু, একচক্রা বীরচন্দ্রপুর প্রভৃতি স্থান দর্শন করিয়া এক সপ্তাহের মধ্যে আসিয়া পঁহুছিবে। আগামী শনিবার দিন শুভ অধিবাস হইয়া রবিবার দিন অষ্টপ্রহর নাম কীর্ত্তন হইবে। ঐ নাম-কীর্ত্তনে আসিয়া যোগ দেওয়া চাই।" বলিয়া নিজে নিত্যকৃত্য করিতে গমন করিলেন। উঁহারাও ইঁহার আদেশানুযায়ী রওনা হইলেন।

শনিবার দিন অধিবাস হইয়া রবিবার নাম আরম্ভ হইল। প্রাতঃকাল হইতেই বাবাজী মহাশয় যেন কেমন একপ্রকার হইয়া গেলেন। একেবারে বাহ্যজ্ঞান নাই। যতক্ষণ নামের মধ্যে থাকিতেছেন ততক্ষণও যেরূপ, আবার একস্থানে বসিলেও ঠিক তদ্রুপ। পরমানন্দে দিনরাত কাটিয়া গেল। অতিকষ্টে ইঁহাকে কিঞ্চিৎ মহাপ্রসাদ খাওয়ান হইল। ইঁহার চক্ষু দুইটী রক্তবর্ণ ও ঢুলু ঢুলু। কথাগুলি যেন এ রাজ্যের নহে—কেমন একপ্রকার অসংলগ্ন। রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল খেয়াল নাই, একজন আসিয়া বলিল—"আজ্ঞে! নগরকীর্ত্তনে বাহির হইবেন না? বেলা যে সাতটা বাজে!" বাবাজী মহাশয় একটু চমকিতভাবে বলিয়া উঠিলেন—"অ্যাঁ! এত বেলা হইয়াছে? আচ্ছা

চল।” বলিয়া নগরকীর্ত্তনে বাহির হইলেন। কি অপূর্ব্ব আনন্দ! যে রাস্তা দিয়া কীর্ত্তন যাইতেছে, সে রাস্তায় আর কাহারও চলাচল করিবার সাধ্য নাই। চারিদিক লোকে লোকারণ্য। বালক বালিকাগণ আগে পাছে নৃত্য করিতে করিতে ছুটিয়াছে। দোকানী পসারী স্ব স্ব ব্যাপারে নিমগ্ন ছিল; যেমন গগনভেদী সুমধুর নামের ধ্বনি কর্ণগোচর হইল, অমনি নিজ নিজ কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক উধাও হইয়া ছুটিল। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে কেহ কেহ জলের কলসী লইয়া, কেহ কেহ বা স্নান করিতে, আবার কেহ কেহ বা স্নান করিয়া বাড়ীতে যাইতেছিলেন। সংকীর্ত্তনের ধ্বনি শুনিয়া আর যাওয়া হইল না, রাস্তার একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া বিভোরভাবে নাম শুনিতে লাগিলেন; আনন্দাশ্রুতে মুখ বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। বিশেষ সম্ভ্রান্ত ঘরের স্ত্রীগণ কেহ বা জানালা খুলিয়া, কেহ কেহ বা ছাদে উঠিয়া, আবার কেহ কেহ বা সদর দরজা খুলিয়া তাহার আড়াল হইতে বিশেষ আগ্রহের সহিত নিবিষ্টচিত্তে নাম শুনিতে লাগিলেন। এইরূপ ভাবে বহুক্ষণ নগর ভ্রমণ করিয়া রাখালবাবুর বাড়ীতে আগমন পূর্ব্বক দধি-হরিদ্রা দ্বারা নাম সমাপ্তি করিলেন। হঠাৎ কি মনে হইল, একেবারে আবিষ্টভাবে সেই হলুদ কাদার মধ্যে গড়াগড়ি দিতে দিতে সকলের মাথায় চরণ দিতে লাগিলেন। ইঁহার তাৎকালিক অবস্থা দর্শনে সকলেই বিস্মিত। যেই চরণের নিকট গিয়া প্রণাম করিতেছেন, অমনি তাহার মস্তকে চরণ অর্পণ পূর্ব্বক গদগদ কণ্ঠে আধ আধ স্খলিত ভাষায় কি যেন কি বলিতেছেন! চক্ষু দুইটী মুদ্রিত। হঠাৎ কি মনে হইল—রামদাস পণ্ডিতজী গিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করতঃ ইঁহার চরণ ধারণ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন—“বাবা! আমি আপনার নিকট অপরাধ করিয়াছি, আজ কয়েকদিন হইতে আমার মনে বড়ই তাপ হইতেছে, আপনি ক্ষমা করুন।” বাবাজী মহাশয় গদগদ কণ্ঠে বলিতে লাগিলে[illegible] তোমার অ[illegible] কোনই অপরাধ নাই। তুমি

সনাতন-শিক্ষার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া অনেক লোকের প্রাণে একটা নৈরাশ্যের সঞ্চার করিয়া দিয়াছ। মহাপ্রভু সনাতনকে যে উপদেশ দিয়াছেন, সে উপদেশ পালন করিবার পাত্র একমাত্র সনাতন গোস্বামী। তিনি ছাড়া ঐরূপ কঠোর আদেশ পালন করা জীবের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। কলিহত দুর্ব্বল জীব অল্পায়ু এবং অন্নগতপ্রাণ। ইহারা একমাত্র কৃপার ভিখারী। কৃপাই ইহাদের সম্বল। তাই মহাপ্রভু কৃপা করিয়া অবিচারে একমাত্র নামের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহাও কিরূপ? 'খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়। কাল দেশ নিয়ম নাই সর্ব্ব সিদ্ধি হয়। শুদ্ধং যদ্যপ্যশুদ্ধং ব্যবহিতরহিতং তারয়ত্যেব সত্যম্' ইত্যাদি। অর্থাৎ কলির জীবের পক্ষে কোনরূপে কঠোর আদেশ তিনি করেন নাই। তাই তাঁহার কৃপায় ত্রিতাপ-দগ্ধ নিরাশপ্রাণ কলির জীবের মনে কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হইতে না হইতেই তোমাদের ন্যায় পণ্ডিত-অভিমানী অনেক মহাত্মাগণ প্রচারকের পদ গ্রহণপূর্ব্বক সেই কৃপালব্ধ সুকোমল নামকে কতকগুলি বিধির কঠিন আবরণে আবৃত করিয়া আবার জীবগণের প্রাণে হা হুতাশ আনিয়া দিতেছেন। তোমাদেরশান্তি হওয়া বড়ই কঠিন। পাণ্ডিত্য বরং ভজন সাধনের কথা অবগত হইতে পারা সম্ভব; কিন্তু কৃপার কথা কোন মতেই অবগত হইতে পারিবে না। কৃপার কথা একমাত্র কৃপা ভিন্ন কিছুতেই অবগত হওয়া যায় না। সর্ব্বদাই কৃপার উপরে কোনওরূপ সিদ্ধান্ত করিতে যাওয়া সম্পূর্ণ ভুল। নিজ মনোবৃত্তি অনুসারে সর্ব্ব সাধারণের উপর সিদ্ধান্ত করিতে গেলে অপরাধ হয়। বিশেষতঃ ভগবদ্বাক্যের আশয় বুঝিতে না পারিয়া নিজ বুদ্ধিবৃত্তির বলে নিজকৃত সিদ্ধান্তকে চরম সিদ্ধান্তরূপে প্রকাশ করা আমার মতে সম্পূর্ণ ভ্রম।"

রামদাস। তাহা হইলে ব্যাস-আসনে বসিয়া শাস্ত্র ব্যাখ্যা কিরূপে হইবে?

বাবাজী। কেন? সে স্থানে "আমি যাহা বলিলাম ইহাই চরম সিদ্ধান্ত"

এইরূপ দাম্ভিকতা প্রকাশ না করিয়া "আমার বুদ্ধিবৃত্তি অনুসারে আমি এইরূপ বুঝিয়াছি বা শ্রীগুরুদেব আমাকে কৃপা করিয়া অন্তর্য্যামিরূপে এইটী বুঝাইয়াছেন। হয় ত নিজ ভজনবলে বা গুরুকৃপায় কেহ অন্যথা ব্যাখ্যাও করিতে পারেন।" এইরূপ ভাষা ব্যবহার করাই যুক্তিসঙ্গত। পণ্ডিজী সাশ্রুগদগদ কণ্ঠে বলিলেন—"আজ আমি ধন্য হইলাম। আজ আমার অনেক শিক্ষা হইল।"

বাবাজী মহাশয় পণ্ডিতজীকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক বলিলেন—"বাবা! পাঠের পূর্ব্বে এবং পরে উপস্থিত শ্রোতাদিগের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত।" বলিয়া একেবারে মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। অনেক শুশ্রুষার পর চৈতন্য লাভ করিয়া সকলকে দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্ব্বক সকলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। বেলা অতিরিক্ত হইয়াছে জানিয়া, নিজ হৃদয়ের ভাব সম্বরণ পূর্ব্বক স্নান-আহ্নিকাদি শেষ করতঃ মহাপ্রসাদ গ্রহণ পূর্ব্বক বিশ্রাম করিলেন।

দুম্‌কা যাত্রা।

কয়েকদিন হইতে বাবাজী মহাশয়ের শিষ্য শ্রীভাগবত মিশ্র নামক জনৈক উড়িষ্যাবাসী শিক্ষিত যুবক সদলে ইঁহাকে দুম্‌কা লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। এ কয়েকদিন রাখাল বাবু এবং তাঁহার ভগিনী কুসুমকুমারীর আগ্রহে কাটিয়া গিয়াছে; আজ আর ভক্তের আগ্রহ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। সিউড়ী হইতে দুম্‌কা অনুমান বিশ ক্রোশ ব্যবধান হইবে। ভাগবত মিশ্র মহাশয়ের ইচ্ছা যে বাবাজী মহাশয়কে একখানি ঘোড়ার গাড়ী করিয়া লইয়া যান এবং অন্যান্য সকলের জন্য গরুর গাড়ীর ব্যবস্থা করেন। যিনি গরুর গাড়ীতে যাইতে অসম্মত হন, তিনি অগত্যা পদব্রজেই

গমন করিবেন। তিনি নিজ মনোভাব বাবাজী মহাশয়ের নিকট প্রকাশ করিলে, বাবাজী মহাশয় বলিলেন—"দেখ ভাগবত! আমার নিতাইচাঁদ যে রাস্তায় গমনাগমন করিয়াছেন বা করিতেছেন, সেই রাস্তায় কোন যান আরোহণে যাওয়া আমার মতে কোনরূপেই সঙ্গত নহে। অতএব আমরা পদব্রজেই পরমানন্দে যাইব; সে জন্য তোমার কোনরূপ চিন্তা করিবার প্রায়োজন নাই।" এই বলিয়া অপরাহ্ন বেলা চারিটার সময় সদলে নাম করিতে করিতে রওনা হইয়া রাত্রি অনুমান আটটার সময় গিয়া মৌড়েশ্বর গ্রামে মৌড়েশ্বর শিবের মন্দিরে পৌঁছিলেন। বাবার দর্শন পাইবামাত্রই "আমার নিতাইচাঁদের পূজিত শিবলিঙ্গ" বলিয়া একেবারে অচৈতন্য হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন! সঙ্গিগণ সকলে শশব্যস্তে ইঁহার চারিদিকে ঘেরিয়া নাম করিতে লাগিলেন। প্রায় এক ঘণ্টা পরে অর্দ্ধ বাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া করযোড়ে স্তব করিতে লাগিলেনঃ—

জয় শিব শঙ্কর, শ্রীমৌড়েশ্বর, গঙ্গাধর হর বোম্ বোম্ বোম্।
তাপ বিনাশন, পাপবিমোচন, শত্রুনিসূদন, বোম্ বোম্ বোম্॥
দিগম্বর মৃড়, কৈলাসেশ্বর, কাশীবিশ্বেশ্বর, বোম্ বোম্ বোম্।
পিনাকী ত্র্যম্বক, কামবিনাশক, ত্রিপুর অন্তক, বোম্ বোম্ বোম্॥
দেব মৃত্যুঞ্জয়, প্রণত জনাশ্রয়, ভূতেশ্বর জয়, বোম্ বোম্ বোম্।
শশাঙ্কমৌলি, ঈশ্বরশূলী, জাহ্নবীমৌলি, বোম্ বোম্ বোম্॥
সর্পবিভূষণ, ভস্মবিলেপন, বৃষভবাহন, বোম্ বোম্ বোম্।
হলাহল ভক্ষক সুরাসুর রক্ষক, দক্ষবিনাশক, বোম্ বোম্ বোম্॥
সঙ্কর্ষণমন, চিত্তবিনোদন, পার্ব্বতী-মোহন, বোম্ বোম্ বোম্।
জয় শ্রীপশুপতি, গিরীশ উমাপতি, প্রমথ-অধিপতি, বোম্ বোম্ বোম্॥

এইরূপে বহুক্ষণ স্তব করিয়া সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম করতঃ বাবার সম্মুখেই

উপবেশন করিলেন। সেই স্থানে একমূর্ত্তি সাধু আছেন। সাধুটী শৈব। ইঁহারা যখন নাম করিতে করিতে প্রথম গিয়া উপস্থিত হন, তখন তিনি ইঁহাদিগকে "গোঁড়া বৈষ্ণব" বলিয়া মনে ধারণা করিয়াছিলেন; কিন্তু বাবাজী মহাশয়ের ভাব-ভঙ্গি দেখিয়া এবং ইঁহার মুখে মহাদেবের স্তব শুনিয়া একেবারে বিমুগ্ধ হইয়া গেলেন। বাবাজী মহাশয় স্থির হইবামাত্র সাধু আসিয়া দণ্ডবৎ করিলে ইনিও বিশেষ সম্মানের সহিত সাধুকে প্রতিনমস্কার করিলেন। উভয়ে শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্ব সম্বন্ধে নানারূপ কথোপকথন করিতেছেন, ইত্যবসরে সাধু বলিলেন—"বাবা! আমার ইচ্ছা—ভিক্ষালব্ধ কিছু চাল ডাল রান্না করাইয়া মহাপ্রভুর ভোগ দেওয়া হউক।" ইনি প্রথমে বলিলেন—"রাত্র অনেক হইয়াছে, আপনার ভোজনে ব্যাঘাত হইবে। কোনই আবশ্যকতা নাই।"

সাধু কিছুতেই শুনিলেন না। কাজেই কলায়ের ডাল ও কাঁচা কুমড়ার তরকারী করিয়া, সঙ্গে যে মহাপ্রভুর চিত্রপট ছিলেন, তাঁহাকে ভোগ দিয়া, সকলে মহাপ্রসাদ গ্রহণ পূর্ব্বক শয়ন করিলেন। পরদিবস প্রাতঃকালে সাধু ইঁহাদিগকে সেদিন মৌড়েশ্বরে রাখিবার জন্য বহু চেষ্টা করিতে লাগিলে, বাবাজী মহাশয় করযোড়ে সাধুর নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। বেলা অনুমান এগারটার সময় পাহাড়ের নীচে একখানি ক্ষুদ্র গ্রামে মহাপ্রভুর ভোগরাগ দিয়া সকলে প্রসাদ গ্রহণ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ বিশ্রাম লাভ করিলেন।

গ্রামখানি ক্ষুদ্র হইলেও গ্রামবাসীদিগের আগ্রহাতিশয় দেখিয়া সে দিন সেই স্থানেই থাকা হইল। সন্ধ্যার পর সংকীর্ত্তন আরম্ভ হল। গ্রামবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই যেন আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইয়া গেল। বহুক্ষণ কীর্ত্তনের পর কীর্ত্তন সমাপ্ত করিলেন। গ্রামবাসী ভক্তগণ সে রাত্রে অন্ততঃ কিছু জলযোগ করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কিন্তু অবেলায় মহাপ্রসাদ সেবা হইয়াছে বলিয়া, বাবাজী মহাশয় আর কিছু গ্রহণ

করিতে স্বীকৃত না হইয়া কেবল মাত্র মহাপ্রভুকে কিঞ্চিৎ শীতলী ভোগ দিবার ব্যবস্থা করিলেন। গ্রামবাসীগণ মুড়ি গুড় আনিয়া দিলে, ইঁহাদের পরিমাণ মত দিন মহা প্রভুর ভোগ দিয়া সকলে কিছু কিছু প্রসাদ গ্রহণ পূর্ব্বক শয়ন করিলেন।

পরদিবস প্রাতঃকালে বাবাজী মহাশয় প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্ব্বকসগণে নাম করিতে করিতে বনপথে রওনা হইলেন। বেলা যখন এগারটা তখন একটী গ্রামে পৌঁছিয়া, একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবা! এ গ্রামের নাম কি?" সে বলিল—"আজ্ঞে! রাণীশ্বর।" শুনিবামাত্র ইনি একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "রাণী—রাধারাণী, ঈশ্বর—শ্রীকৃষ্ণ। অতএব রাধাকৃষ্ণ বিরাজ করেন যে গ্রামে, তাহার নাম রাণীশ্বর গ্রাম। সুতরাং আজ এই গ্রামেই থাকা প্রয়োজন।" বলিয়া গ্রামের মধ্যে নদীর ধারে একটী গোয়াল ঘরে বসিলেন। ঘরখানি খুব পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন না হইলেও বিশেষ অপরিস্কারও নয়। সঙ্গিগণ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই উহা বাসোপযোগী করিয়া লইলেন। সঙ্গিগণের উপর ভিক্ষার আদেশ হইলে সকলেই নাম করিতে করিতে ভিক্ষায় বাহির হইলেন।

বাবাজী মহাশয় এবং ইঁহার সঙ্গী চার পাঁচজন গোয়াল ঘরেই রহিয়াছেন। রাণীশ্বর গ্রামে অনেক ব্রাহ্মণের বাস এবং সকলেই শৈব। ইঁহারা নাম করিতেছেন—"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥" **হরিবোল** বলিলেও বরং রক্ষা ছিল, কিন্তু ইঁহারা বলিতেছেন **নিতাই গৌর**। কাজেই ব্রাহ্মণেরা খড়গহস্ত হইয়া, ইহাদিগকে নানারূপ ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। বেশ হৃষ্টপুষ্ট যুবক ছেলেদের দেখিয়া বলিতেছেন—"কেন, তোদের কি কোথাও চাকুরী জোটে না যে, অমনি ভাবে লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছিস? ব্যাটাদের যদি অন্য কোনও কাজ না মিলে, মুটেগিরি করলেও ত বেশ উদরান্নের সংস্থান হয়।" ইত্যাদি যাহার যেরূপ

মনোবৃত্তি সে সেইরূপ বলিতেছে। ইঁহারা শ্রীগুরুদেবের আদেশক্রমে নাম করিতে করিতে গ্রামখানি ভ্রমণ করিয়া, বাবাজী মহাশয়ের নিকট আসিলেন। অনুমান আধসের চাউল ভিক্ষা হইয়াছে। সকলেরই মনে বড় তাপ জন্মিয়াছে। সকলেই আসিয়া, বাবাজী মহাশয়কে বলিতে লাগিলেন—"এ কি গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন! ভিক্ষা ত মিলেই না; উপরন্তু যা তা বলিয়া গালাগালি করে!"

বাবাজী। কেন বাবা! ভিখারী বৈরাগী ভিক্ষা করিতে গিয়াছ; গালাগালি দিতে অত দুঃখ কেন?

সকলে। আজ্ঞে! আমাদের গালাগালি দিলে কোনই দুঃখ হইত না। এ যে একেবারে নিতাই গৌরকে নিয়া পড়িয়াছে। যত দোষ নিতাই গৌরের।

বাবাজী। কোন চিন্তা নাই। নিতাইচাঁদ এস্থানে কোন খেলা খেলিবেন, তাই বোধ হয় এরূপ ভঙ্গি করিয়াছেন। যাও, তোমরা স্নান-আহ্নিকাদি শেষ করিয়া আইস, পরে যাহা হয় হইবে।

ইঁহার আদেশক্রমে সকলেই স্নান করিতে গেলেন। একা বাবাজী মহাশয় স্থিরভাবে বসিয়া আছেন। প্রায় আধঘণ্টা যায়, একটী ভদ্রলোক অনুমান দশ সের চা'ল এবং সেই পরিমাণ ডা'ল, তরকারী, তেল, লবণ, প্রভৃতি আনিয়া, ইঁহার সম্মুখে উপস্থিত করতঃ যাহাতে ঐ সকল দ্রব্য মহাপ্রভুর ভোগে লাগিয়া বৈষ্ণবদিগের সেবা হয়, করযোড়ে সেই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

বাবাজী মহাশয় সাশ্রুগদগদকণ্ঠে "**লীলাময় নিতাই চাঁদের কি বিচিত্র লীলা**" এই কথা বলিয়া সেই ভদ্রলোকটীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবা! এস্থানে মহাপ্রভু আছেন, তোমাকে কে বলিল?

ভদ্র। আজ্ঞে! সে এক অপূর্ব কাহিনী! যখন কয়েকমূর্ত্তি বাবাজী ভিক্ষা করিবার জন্য নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলেন,

তখন আমার মনে হইল—ইঁহারা কোথা হইতে আগমন করিয়াছেন এবং কোথায়ই বা বাসা করিয়াছেন জানিতে পারিলে, একবার বাসায় গিয়া ইঁহাদের চরণ দর্শন করিতাম।" এই কথা ভাবিতেছি, এমন সময় দীর্ঘকার একটী বিদেশী ব্রাহ্মণ হঠাৎ আসিয়া আমাকে বলিলেন—"বাবা! উহারা নদীর ধারে একটী গোয়াল ঘরে আশ্রয় লইয়াছে। প্রায় পঁচিশ-ছাব্বিশ জন লোক আছে, উহাদের আহারাদি কোনও সংস্থান হয় নাই।" বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। ব্রাহ্মণটীকে আমি চিনিতে পারিলাম না। তখন তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবার অবকাশও হইল না। তাড়াতাড়ি ঘর হইতে এই সমস্ত দ্রব্য লইয়া আসিলাম। এখন আপনার দয়া!

এইরূপ বলাবলি হইতেছে, ইত্যবসরে আর একটী ভদ্রলোক দুইটী চাকর সঙ্গে করিয়া, আন্দাজ আধ মণ চা'ল এবং সেই পরিমাণ ডা'ল, তরকারী, ঘি, মসলা—এমন কি, মাটির হাঁড়ি ও কাঠ পর্য্যন্ত লইয়া, বাবাজী মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। বাবাজী মহাশয় বিস্মিতভাবে সাশ্রুগদগদকণ্ঠে ভদ্রলোকটীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবা! তুমি কেন এ সমস্ত লইয়া আসিলে?'

ভদ্র। বাবা! কেন যে আনিলাম, তাহা আমি বলিতে পারি না। প্রায় এক ঘণ্টা পূর্ব্বে, কয়েকমূর্ত্তি বৈষ্ণব "ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥"—এই নাম করিতে করিতে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। প্রথমে আমরা মনে করিয়াছিলাম যে উঁহারা নগরকীর্ত্তনে বাহির হইয়াছেন। ক্ষণকাল পরে একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক এক মুষ্টি চাউল হাতে করিয়া আনিলে, উঁহাদের মধ্যের একজন নিজের কাঁধের ভিক্ষার ঝুলি দেখাইলেন। তখন বৃদ্ধা সেই ঝুলিতে চাউল মুষ্টি দিয়া প্রণাম করিল; উঁহারাও প্রতিপ্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলেন। আমরা তখন বুঝিলাম

যে, উঁহারা ভিক্ষায় বাহির হইয়াছেন। আমার নিকট ছয় সাত মূর্ত্তি গ্রামবাসী ব্রাহ্মণ বসিয়াছিলেন, তাঁহারা উহাদিগকে নানা কটু ভাষা দ্বারা ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেও, উঁহারা আনন্দিতমনে প্রণাম করতঃ স্থানান্তরে গমন করিলেন। ব্রাহ্মণগণও স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। তখন হইতেই আমার মনে বাসনার উদয় হইয়াছে যে, উঁহারা যে স্থানে থাকেন সন্ধান পাইলে, কিছু ভোগের চা'ল ডা'ল পাঠাইয়া দিব। অনেক অনুসন্ধানে এই স্থানের সন্ধান পাইয়া তবে এই যৎসামান্য চা'ল ডা'ল আনিয়াছি। কৃপা করিয়া গ্রহণ করিলে কৃতার্থ হইব।

বাবাজী। বাবা! আমার গ্রহণ অগ্রহণের মধ্যে কিছুই নাই, আমি কেবল নিতাই চাঁদের ভঙ্গি দেখিতেছি!

এইরূপ বলাবলি হইতেছে, ইত্যবসরে সঙ্গিগণ স্নান করিয়া আসিলে অতিশয় উৎসাহের সহিত নিতাইচাঁদের কৃপাদত্ত বস্তু মহাপ্রভুকে ভোগ দিবার জন্য সকলকে আদেশ করিলেন। কোথায় রান্না হইবে জিজ্ঞাসা করায়, ইনি বলিলেন—"ঐ যে কালীবাড়ী দেখা যাইতেছে, ঐ স্থানে মহাপ্রভুকে লইয়া যাও এবং যথাযোগ্য স্থানে রাখিয়া ভোগের ব্যবস্থা কর।" সকলে তাহাই করিতে লাগিলেন। যথাসময়ে ভোগ লাগিলে, ইঁহার আদেশে রামদাদা মনপ্রাণমাতান ভাবগদগদকণ্ঠে ভোগ আরতি কীর্ত্তন ধরিলেন। লোকে লোকারণ্য। কালীবাড়ীতে আর লোক ধরে না। বেলা অনুমান তিনটার সময় কীর্ত্তন সমাপ্তি হইল। যে সমস্ত মহাত্মা ব্রাহ্মণগণে প্রথমে খুব গালাগলি করিয়াছিলেন তাহারা অনুতপ্ত হৃদয়ে বাবাজী মহাশয়ের নিকট আসিয়া, নিজ নিজ আচরিত কর্ম্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। বাবাজী মহাশয় করযোড়ে বলিলেন—"সে কি? আপনারা ব্রাহ্মণ—আমাদের গুরু; আপনারা আমাদিগকে যাহা ইচ্ছা বলিতে বা করিতে পারেন। আপনাদের আবার অপরাধ কি? ও সমস্ত কথা মনে আনিলেও আমাদের অপরাধ হয়। আসুন

ও সমস্ত কথা ভুলিয়া গিয়া, আমরা মহাপ্রসাদ পাই।" বলিবামাত্র সকলে বিশেষ উৎসাহের সহিত বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে গমন করিলেন। ইনিও অবিচারে উঁহাদিগকে পাতা দিতে বলিলেন। মহাপুরুষের শক্তিপ্রভাবেই হউক বা নিতাইচাঁদের কৃপাপ্রভাবেই হউক, প্রায় বিশজন নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ, বাবাজী মহাশয়কে ঘেরিয়া মহাপ্রসাদ পাইতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পূর্ব্বে যে বৈষ্ণবদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়াছেন তাঁহারাই পরিবেশন করিতেছেন। নামের কৃপায় এবং সৎসঙ্গের বলে কোনই দ্বিধা-বুদ্ধি নাই, সকলেই পরমানন্দিত চিত্তে মহাপ্রসাদ পাইয়া নিজেকে ধন্য মনে করতঃ পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন—"আজ আমরা পবিত্র হইলাম, এমন অদোষদর্শী মহাপুরুষের সঙ্গ যে আমরা জীবনে পাইব, কখনও এমন আশা করিয়াছিলাম না। আজ আমাদের গ্রাম ধন্য হইল; আমরাও ধন্য হইলাম।" ইত্যাদি যাঁহার যেরূপ মনের ধারণা তিনি সেইরূপ বলিতেছেন। প্রায় এক শত লোক মহাপ্রসাদ পাইল। সকলেই পরমানন্দিত, যথাসময়ে সকলের মহাপ্রসাদ পাওয়া শেষ হইলে, গ্রামবাসী বহু ভদ্রলোক বাবাজী মহাশয়কে দুই একদিন সেইস্থানে থাকিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিতে লাগিলেন, ইনি বলিলেন—"বাবা"! আমি আমার নিজের ইচ্ছায় এস্থানে আসি নাই। নিতাইচাঁদ আনিয়াছেন; তিনি ইচ্ছা করিলে দুইদিন কেন, দশদিনও রাখিতে পারেন; আবার তিনি ইচ্ছা না করিলে এক মুহূর্ত্তও আমার থাকিবার সাধ্য নাই। আপনারা নিতাইকে জানান, এ যাত্রায় না রাখেন, আবার লইয়া আসিবেন।"

সকলে। আজ্ঞে! আমরা ত আপানাকেই সেই নিতাইচাঁদ দেখি। আপনি ইচ্ছা করিলেই সমস্ত হইতে পারে।

বাবাজী। নিতাই নিতাই! আমি ক্ষুদ্রজীব। আমাকে ওরূপ কথা বলিতে নাই। আপনারা আর্শীর্ব্বাদ করুন—আমি যেন নিতাই দাসের দাস হইতে পারি।

এদিকে সঙ্গিগণকে প্রস্তুত হইবার আদেশ দিলেন। সঙ্গিগণ প্রস্তুত হইয়া নাম ধরিলে, বাবাজী মহাশয় সকলকে দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্ব্বক রওনা হইলেন দেখিয়া, গ্রামবাসী বহুলোক ইঁহার সঙ্গে সঙ্গে অনেক দূর আসিতে লাগিলে ইনি মিষ্টবাক্যে সকলকে বিদায় দিয়া রওনা হইলেন। এদিকে কীর্ত্তনানন্দে মত্ত হইয়া রামদাদা প্রভৃতি, বাবাজী মহাশয় সঙ্গেই আছেন এই জ্ঞানে একেবারে দুম্‌কা পৌঁছিবেন মনে করিয়া, নৃত্য করিতে করিতে গমন করিলেন। গ্রামবাসী লোকদিগের সহিত আলাপ করিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইল; সুতরাং ইনি পিছনে পড়িলেন। ইঁহার সঙ্গে মাধবদাস বাবাজী, কুঞ্জলাল গোস্বামী, ফণী, রাধাবিনোদ, উদ্ধারণ প্রভৃতি কয়েকজন রহিল। অনুমান তিন ক্রোশ দূরে একটী ডাক বাঙ্গালায় পূর্ব্ব হইতেই শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ডেপুটী কলেক্টার, বাবাজী মহাশয়ের থকিবার জন্য বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। ইনি ঐ ডাক বাঙ্গালায় পৌঁছয়াই বলিলেন—'আজ এই স্থানে রাত্রিবাস করা যাউক।' তাহাই হইল। এদিকে রামদাদা প্রভৃতি দুম্‌কা শহরের নিকটবর্ত্তী হইলে, সংকীর্ত্তনের ধ্বনি শুনিয়া ভাগবত মিশ্র প্রভৃতি কয়েকজন, বাবাজী মহাশয় আসিয়াছেন এই জ্ঞানে দ্রুতগতি অগ্রসর হইয়া, রামদাদার সহিত আলাপ করিয়া জানিলেন যে, বাবাজী মহাশয় পিছনে আসিতেছেন। সকলেই উদ্‌বিগ্ন মনে বাবাজী মহাশয়ের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। রামদাদা প্রভৃতিকে বৈদ্যনাথ বাবুর খালি বাড়ীতে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। রাত্রি অধিক হইতে চলিল দেখিয়া সকলেই স্থির করিলেন যে বাবাজী মহাশয় নিশ্চয়ই সেই ডাক বাঙ্গালায় রহিয়াছেন। আজ আর দুম্‌কা আসিবেন না।

রাত্র প্রভাত হইতে না হইতে রামদাদা কীর্ত্তন লইয়া বাবাজী মহাশয়কে আনিবার জন্য রওনা হইলেন। সঙ্গে যোগেন বাবু, যতীনবাবু, গোপীবাবু প্রভৃতি অনেক ভদ্রলোক চলিলেন। সামান্য দূর যাইতে না যাইতেই বাবাজী

মহাশয়ের সহিত সকলের দেখা হইল। সকলে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ করিলে, ইনি সকলকেই প্রেমালিঙ্গন দানে কৃতার্থ করিলেন।

বেলা অনুমান নয়টার সময় সকলেই দুম্‌কায় পৌঁছিলেন। বাবাজী মহাশয় আসিবেন বলিয়া, দুম্‌কা মিউনিসিপ্যালিটি অফিস হইতে যতীনবাবুর বাড়ী পর্য্যন্ত রাস্তা কলাগাছ ইত্যাদি দ্বারা সুসজ্জিত করা হইয়াছে। কীর্ত্তনানন্দে নৃত্য করিতে করিতে সকলে যতীনবাবুর বাসায় পৌঁছিলেন। বহু ভদ্রলোকের সমাগম হইল। প্রায় দুই ঘণ্টা কাল যতীনবাবুর বাসায় কীর্ত্তন করিয়া, ঐ বাসার সন্নিকট শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ বাবুর বাড়ীতে গমন করিলেন। বৈদ্যনাথ বাবুর বাড়ীতে কেহই নাই; সুতরাং ঐ বাড়ীতেই ইঁহাদের থাকিবার বন্দোবস্ত হইল। সেস্থানে কিছুক্ষণ নাম করিয়া স্নান-আহ্নিকাদি সমাপন করতঃ মহাপ্রসাদ গ্রহণ পূর্ব্বক বিশ্রাম করিলেন। অপরাহ্ন চারিটা হইতে বহু ভদ্রলোক আসিতে লাগিলেন। শারদীয়া পূজার ছুটি; কাজেই সকলের অবসর। যাঁহার যেরূপ সন্দেহ, তিনি সেইরূপ প্রশ্ন করিতেছেন। ইনিও শাস্ত্রযুক্তি অনুসারে সরল ভাষায় সকলের প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন।

দুম্‌কা-প্রসঙ্গ।

এই ঘটণার সম্বন্ধে শ্রীযুক্তবাবু কিশোরীমোহন সিংহ, দুম্‌কা ডিষ্টিলারির সুপারিনটেণ্ডেণ্ট যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই এইস্থানে উদ্ধৃত করা হইল। তিনি লিখিয়াছেন ঃ—

প্রায় আঠার বৎসর পূর্ব্বে আশ্বিন মাসের শেষ কিংবা কার্ত্তিকের প্রথম শারদীয়া দূর্গা পূজার পূর্ব্বে প্রতিপদের দিন বেলা নয়টার সময় মাহাত্মা শ্রীল

শ্রীযুক্ত রাধারমণ চরণদাস বাবাজী মহাশয় সদলে সিউড়ী হইতে দুম্‌কায় শুভাগমন করেন। সিউড়ী হইতে দুম্‌কা বিশ ক্রোশ পথ হইবে। বাবাজী মহাশয় নাম করিতে করিতে পদব্রজে আগমন করেন। আমি তখন দুম্‌কা ডিষ্টিলারির সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট। তখনকার ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন বোমপাশ সাহেব! সাহেব বড়ই সদাশয়। ডেপুটী কলেক্টার যতীনবাবুর বাসা আমার ডিষ্টিলারির সন্নিকট। তিনি চারি বৎসর পূর্ব্ব হইতে যতীন বাবু, যোগেন বাবু প্রভৃতি আমরা কয়েকজন মিলিয়া, যতীন বাবুর বাসার নিকটবর্ত্তী একটী স্থানে একটী হরিসভা স্থাপন করিয়াছিলাম। প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় আমরা সকলে মিলিত হইয়া; ঐ হরিসভায় নামকীর্ত্তন করিয়া থাকি। সেদিন বাবা আসিয়াছিলেন; সুতরাং হরিসভায় খুব ধুমধাম। অপরাহ্ন পাঁচটার সময় বাবাজী মহাশয় সদলে "ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।" এই নাম করিতে করিতে বৈদ্যনাথ বাবুর বাড়ী হইতে বাহির হইয়া সামান্য ভাবে শহরের একপার্শ্বে ভ্রমণ করিয়া, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের বাড়ীর সম্মুখ দিয়া বরাবর হরিসভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যে সময় সাহেবের বাড়ীর সম্মুখে কীর্ত্তন আসিল, তখন সাহেব অনিমিষ নয়নে অনেক সময় পর্য্যন্ত বাবাজী মহাশয়ের দিকে চাহিয়া রহিলেন; এমন কি সংকীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কিছুদূর গমন করিলেন। সাহেবের দৃষ্টি কেবল বাবাজী মহাশযের দিকে। বাবাজ মহাশয় হরিসভায় পৌঁছিয়া রামদাস বাবাজী মহাশয়কে কীর্ত্তন করিতে আদেশ করিলে, রামদাস বাবাজী মহাশয় কীর্ত্তন ধরিলেন ঃ—

যদি গৌরাঙ্গ না হ'ত, কি মেনে হইত, কেমন ধরিতাম দে।
রাধার মহিমা, প্রেম রস সীমা, জগতে জানাত কে॥
বৃন্দা বিপিন, মধুর মাধুরী, প্রবেশ চাতুরী সার।
বরজ যুবতী, ভাবের ভকতি, শকতি হইতে কার॥

গাও গাও পুনঃ গৌরাঙ্গের গুণ, সরল করিয়া মন।
এ ভব সংসারে, দয়াল ঠাকুর, না দেখিয়ে অন্যজন॥
(এমন) গৌরাঙ্গ বলিয়ে, না গেলাম গলিয়ে, কেমনে ধরিলাম দে।
বাসু ঘোষের হিয়া, পাষাণেতে দিয়া, কেমনে গড়িল সে॥

অপূর্ব্ব আনন্দ। এমন কেহ নাই—যাঁহার চোখে জল নাই। সকলেই ঠিক বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করতে লাগিলেন। বাবাজী মহাশয় আবিষ্ট ভাবে নৃত্য করিতে করিতে গিয়া রামদাস বাবাজীর কোলে বসিয়া পড়িলেন এবং রামদাস বাবাজীর চিবুক ধরিয়া সাশ্রুগদগদকণ্ঠে কত কি বলিতে বলিতে ভূমিতলে পতিত হইলেন। একেবারে অচৈতন্য হইয়া বিস্ফারিত নিস্পন্দ নয়নযুগল হইতে দরদরিত ধারে অশ্রু ঝরিতেছে। শুষ্ক কাষ্ঠবৎ নিশ্চল সেই বিশাল দেহখানি এরূপ ভাব ধারণ করিয়াছে যে, দেখিয়া উপস্থিত সকলেরই মনে আতঙ্ক উপস্থিত হইল। ইঁহার সঙ্গী আরও তিন চারিজনের আবেশ হইয়াছে; কিন্তু বাবাজী মহাশয়ের অবস্থা দেখিয়া সকলেই বিশেষ চিন্তিত। কেহ পাখা, কেহ বা জল লইয়া আসিতেছেন। কেহ কেহ বা বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গিগণকে ব্যাকুল ভাবে ইঁহার এরূপ অবস্থার কারণ এবং কিরূপ ইনি স্থির হইবেন, এই সমস্ত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলে, প্রেমদাস বাবাজী মহাশয় সকলকে বলিলেন,—"আপনারা কোনই চিন্তা করিবেন না; সকলে নামে যোগ দিন, ইনি এখনই প্রকৃতিস্থ হইবেন।"

প্রেমদাস বাবাজী মহাশয়ের কথায় আমরা সকলেই নামে যোগ দিলাম। রামদাস বাবাজী মহাশয় এক একবার কীর্ত্তনে আখর দিতেছেন—"হায়রে তখন কেন জনম হল না, প্রকট লীলা দেখ্‌তে পেলাম না, সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে নিয়ে গৌর তুমি কোথায় বিহরিছ, কিছুই দেখ্‌তে পেলাম না" ইত্যাদি। এক একটী আখরের সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত ব্যক্তিগণ কাঁদিয়া অধীর হইতেছেন।

হঠাৎ বাবাজী মহাশয়ের দেহে এরূপ ভাবে কম্প উপস্থিত হইল যে, আমাদের বোধ হইতে লাগিল যেন সেই ঘরখানি শুদ্ধ কাঁপিতেছে। দেহের সঙ্গে দন্তগুলি পর্য্যন্ত এরূপভাবে কাঁপিতে লাগিল যে, দেখিলে ভয় হয়। বোধ হয় যেন এখনই সমস্ত দাঁতগুলি পড়িয়া যাইবে। এককালীন সর্ব্বাঙ্গ পুলকাবলি ভূষিত হইয়া গেল। আবার দেখিতে দেখিতে অর্দ্ধাঙ্গে কম্প, অর্দ্ধাঙ্গ স্থির, এক চক্ষে পলক, এক চক্ষু স্থির; এক হস্তে পুলক; এক হস্তে কিছুই নাই; মুখের একদিকে কান্না, একদিকে হাসি; এইরূপ বৈচিত্র্য ভাব হইতে লাগিল। আমরা এইসমস্ত দেখিয়া একেবারে আশ্চার্য্যন্বিত হইয়া গেলাম। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে অনেক রকম ভাবের কথা শুনিয়াছি; কিন্তু আজ এ সমস্ত নয়নগোচর করিয়া জীবনকে ধন্য মনে করিতে লাগিলাম। আগন্তুক ভদ্রলোক সকল পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন যে,—'মনুষ্যদেহে যে এরূপ ভাব হইতে পারে, ইহা আমাদের ধরণার অতীত ছিল; আজ এই মহাপুরুষকে দেখিয়া আমরা আশ্চয্যান্বিত হইলাম। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর দেহে অনেকরূপ ভাব হইত বলিয়া,অনেক ভক্তগণ বলিয়া থাকেন। অনেক সময় সেগুলি আমরা বিশ্বাস করিতে পারিতাম না, আমরা মনে করিতাম, ভক্তগণ তাহাদের ইষ্টদেবের দেহে সামান্য কোনও কিছু দেখিলে অতিরঞ্জিত করিয়া প্রকাশ করেন। আজ আমাদের সে ভ্রম দূর হইয়া গেল। আজ আমরা বুঝিলাম যে, এ সমস্ত ভাবের কথা ভাষায় প্রকাশ করাই অসম্ভব!" ইত্যাদি ভাবে যাঁহার যেরূপ মানসিক ধারণা, তিনি সেইরূপ সমালোচনা করিতে লাগিলেন।

আমি কীর্ত্তনমণ্ডলী হইতে উঠিয়া, বাবাজী মহাশয়কে স্পর্শ করিবার মানসে নিকটে গিয়া দেখি যে, বাবার সেই সুকোমল বিশাল দেহখানি ঠিক লৌহবৎ কঠিন হইয়াছে। অশ্রু এবং ঘর্ম্ম একত্র সম্মিলিত হইয়া ভূমিতে স্রোত বহিয়া যাইতেছে। বহুক্ষণ যায়, ইঁহার চৈতন্য হইতেছে না দেখিয়া, সকলে নাম

করিতে লাগিলাম। এইরূপে বাবাকে ঘেরিয়া উচ্চৈঃস্বরে নাম করিতে করিতে রাত্রি প্রায় এগারটার পর ইঁহার চৈতন্য হইল। ইঁহাকে পূর্ব্ববৎ প্রকৃতিস্থ দেখিয়া আমরা যেন মৃত দেহে প্রাণ পাইলাম। সকলেই কাতর প্রাণে গিয়া ইঁহার চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলাম! কীর্ত্তন সমাপ্ত হইলে ভক্তগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। ইঁহারাও বাসায় প্রত্যাগমন পূর্ব্বক মহাপ্রসাদ গ্রহণান্তে বিশ্রাম করিলেন।

বাবাজী মহাশয় সগণে দুম্‌কায় আসিয়াছেন, দুম্‌কা নিবাসী ভদ্র অভদ্র, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলেই এ কথা অবগত হইয়াছেন। দ্বিতীয় দিবস প্রাতে বহু সাঁওতাল একত্র হইয়া তাহাদের ভাষায় কীর্ত্তন করিতে করিতে বাবাজী মহাশয়ের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। কীর্ত্তন আসিবামাত্র বাবাজী মহাশয় সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। সাঁওতালগণও সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া পরমানন্দে নৃত্য ও কীর্ত্তন করিতে লাগিল। বহুক্ষণ কীর্ত্তনের পর বেলা অতিরিক্ত হইয়াছে দেখিয়া, বাবাজী মহাশয় সকলকে বিদায় দিলেন। নিজেও স্নানাদি নিত্যকৃত্য সমাপন করিয়া মহপ্রসাদ গ্রহণান্তে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিলেন।

অপরাহ্ন চারিটার সময় বহু ভদ্রলোকের অনুরোধে নগর কীর্ত্তন বাহির করিলেন। দুম্‌কা শহর হইতে দুই মাইল ব্যবধান রসিকপুর গ্রাম পর্য্যন্ত নগরকীর্ত্তন গমন করিল। অনেক সাঁওতাল আসিয়া নামে যোগ দিল, তাহাদের নৃত্যের ভঙ্গি এবং নামে আনন্দ দেখিয়া সকলে অবাক। রাত্র প্রায় এগারটার সময় সংকীর্ত্তন বাসায় ফিরিল। তখনও সাঁওতালদিগের পূর্ণ উদ্যম। সংকীর্ত্তন বাহির হইবার সময় বোমপাশ সাহেব কিছুদূর পর্য্যন্ত কীর্ত্তনের পাশে পাশে গমন করিয়াছিলেন। আসিবার সময় সংকীর্ত্তনের রোল শুনিয়া এবং সাঁওতালদিগের অবস্থা দেখিয়া সাহেব একটু ভীত হইলেন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত কীর্ত্তন সমাপ্ত না হইল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ঘোড়ার উপর চড়িয়া রাস্তায় ভ্রমণ

করিতে লাগিলেন। পরদিবস প্রাতে সাহেব যতীনবাবুকে বলিলেন,—"বাবু! তোমার বাসায় এক সাধু আসিয়াছেন, তিনি কে? এবং কেনই বা তিনি এ স্থানে আসিয়াছেন?"

যতীন। সাহেব! তিনি আমাদের পাদ্রি। তিনি একজন মহাপুরুষ, সর্ব্বদা নামকীর্ত্তন করিয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়ান। সিউড়ীতে আসিয়াছিলেন, তথা হইতে আমরা তাঁহাকে আনাইয়াছি।

সাহেব। উহার সঙ্গে কত লোক থাকে?

যতীন। তাহার কোন ঠিক নাই। তিনি কাহাকেও সঙ্গে থাকিতে নিষেধ করেন না। সম্প্রতি প্রায় পঁচিশ ছাব্বিশ জন সঙ্গে আছেন।

সাহেব। আমার বড় আশঙ্কা হয়, পাছে সাঁওতালগণ ক্ষেপিয়া উঠে।

যতীন। ইনি একমাত্র ভগবৎ-নাম বা ভগবৎ-চর্চ্চা ভিন্ন অন্য কোনও খেয়ালের সংস্রবে থাকেন না।

সাহেব। আমি একবার তাঁহার সহিত দেখা করিতে ইচ্ছা করি।

যতীন বাবু সাহেবকে বাহিরে অপেক্ষা করিতে বলিয়া, বাবাজী মহাশয়ের নিকট আসিয়া এই সংবাদ দিবামাত্র, ইনি বাড়ীর বাহিরে আসিয়া সাহেবের সঙ্গে দেখা করিলেন! দেখা হইবামাত্র উভয়ে উভয়কে সেলাম করিলেন। সাহেব অনিমেষ নয়নে বাবাজী মহাশয়ের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ পরে সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কতদিন এখানে থাকিবেন?"

বাবাজী। বাবা! আমি আমার ইচ্ছায় আসি নাই, যিনি আনিয়াছেন, কতদিন রাখিবেন তিনিই জানেন।

সাহেব প্রথমে মনে করিলেন, ইঁহার এই কথাটীকোনও ব্যক্তিগত; সুতরাং সেইভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন, তিনি কি দিনের কথা কিছু বলেন নাই?"

বাবাজী। বাবা! তিনি স্বেচ্ছাময় স্বতন্ত্র ঈশ্বর। তাঁহার মনের ভাব কেহ কিছু বুঝিতে পারে না বা তিনি কাহারও নিকট প্রকাশ করিয়া বলেন না; যখন যেটী মনে হয় তাহাই করেন।

সাহেব। তিনি কোথায় থাকেন?

বাবাজী। সর্ব্বত্র।

সাহেব। তবে আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই না কেন?

বাবাজী। তিনি স্বেচ্ছাময় ভগবান্; যখন যাহাকে দেখা দিতে ইচ্ছা করেন, সেই দেখিতে পায়। তাঁহার ইচ্ছা না হইলে কার সাধ্য তাঁহাকে দর্শন বা অনুভব করে?

সাহেব। আচ্ছা, হিন্দুশাস্ত্রে তাঁহাকে সাকার বলে, কি নিরাকার বলে?

বাবাজী। হিন্দুশাস্ত্রমতে ভগবান্ সাকার এবং নিরাকার উভয়ই।

সাহেব। একটি বস্তু দুই রকম কি করিয়া হইতে পারে?

বাবাজী। এই জন্যই হিন্দুরা তাঁহাকে সর্ব্বশক্তিমান্ স্বেচ্ছাময় বলিয়া থাকেন। তিনি যখন লীলা করিতে ইচ্ছা করেন, তখন লীলা-শক্তি যোগমায়ার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সর্ব্বনয়নগোচর হইয়া থাকেন। আবার যখন সঙ্কোচ করিবার ইচ্ছা হয়, তখন আবার একমাত্র জ্ঞানগম্যরূপে বিরাজ করেন। ঈশ্বর ঠিক এইটী, আর ঐটী নহে; একথা বলিলে তাঁহার ঈশ্বরত্ব থাকে না। তিনি পূর্ণ পূর্ণতম, সুতরাং সমস্তই তাঁহার অংশ কলা বিভূতি। ব্যষ্টি এবং সমষ্টি ভাবে তিনিই সব, একথা স্বীকার না করিলে তাঁহার পূর্ণতমত্বের হানি হয়।

সাহেব। আপনারা আমাদের যিশুকে কিরূপ মনে করেন?

বাবাজী। যিশু একজন ভগবানের অবতার।

সাহেব। অবতার কথাটী আমি বেশ ভাল বুঝিতে পারিলাম না।

বাবাজী। ভগবান নিজে বলিয়াছেন,—"যখন ধরাধামে ধর্ম্মের বিপ্লব

উপস্থিত হয় এবং অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবে দুর্দ্দান্ত পাষণ্ডগণ ভয়ানক অত্যাচারী হইয়া উঠে, তখন আমি অংশরূপে কোনও শক্তিবিশেষের আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক গুণময়ভাবে প্রকট হইয়া ধর্ম্মের সংস্থাপন, সত্যের সংরক্ষণ, অধর্ম্মের বিনাশ এবং পাষণ্ডদিগের দলন করিয়া থাকি।" কাজেই ভগবানের অবতার গ্রহণ করিবার কোনও নির্দ্দিষ্ট রূপ বা দেশ, কাল, জাতি প্রভৃতির স্থিরতা হইতে পারে না। যখন যে দেশে যেরূপে অবতার গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন, তাহাই হয়। আমরা কোন অবতারকে না মানিলে আমাদের অপরাধ হয়।

সাহেব ইঁহার মুখে সর্ব্বসমন্বয় ভাবের কথা শুনিয়া বড়ই প্রীত হইলেন। উভয়ে উভয়কে সেলাম করিয়া সাহেব হৃষ্টমনে নিজ বাসায় গমন করিলেন এবং ইনিও নিজ নিত্যকৃত্য করিতে গমন করিলেন।

এইদিন হইতে সাহেব বাবাজী মহাশয়কে বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। আমার ডিষ্টিলারির মধ্যে ইন্দারার জল খুব ভাল। আমি একদিন বাবাকে বলিলাম,—"বাবা! আমার ওখানকার জল খুব ভাল। আপনি সেখানে স্নান করিতে যাইবেন কি।" দয়াময় অবিচারে আমার কথায় স্বীকৃত হইয়া একদিন আমার বাসায় স্নান করিতে আসিলেন এবং সমস্ত স্থান ভ্রমণ করিয়া দেখিলেন। আবগারি বলিয়া কোনরূপ ঘৃণা করিলেন না। ইন্দারায় স্নান করিয়া রাস্তায় বাহির হইবামাত্র বোমপাশ সাহেবের সহিত দেখা হইল। উভয়ে উভয়কে সেলাম করিলেন। সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি ডিষ্টিলীরির দিকে কোথায় গিয়াছিলেন?"

বাবাজী। স্নান করিতে গিয়াছিলাম।

সাহেব। এস্থানে সব জায়গার জল ভাল নয়, আপনি আমার বাসার পুষ্করিণীতে স্নান করিবেন।

বাবাজী মহাশয় তাহাই স্বীকার করিয়া বাসায় গমন করিলেন।

সাহেব আমার ডিষ্টিলারি ইন্‌স্পেক্‌সন করিতে আগমন করিলেন। প্রথমে আমি একটু ভীত হইয়াছিলাম যে, আমার ঐরূপ ব্যবহারে সাহেব পাছে কোনরূপ অসন্তুষ্ট হন; কিন্তু বাবার শক্তি-প্রভাবে তিনি কিছুই বলিলেন না। পরদিবস হইতে বাবা সাহেবের পুষ্করিণীতে স্নান করিতে লাগিলেন। বাবা যতক্ষণ স্নান করেন, সাহেব একদৃষ্টে কেবল ইঁহার দিকে তাকাইয়া থাকেন। দুইদিন পরে সাহেব যতীন বাবুকে বলিলেন,—"দেখ বাবু! তোমার এই সাধুকে আমি চিনি, ইঁহার পূর্ব্বের নাম ছিল রাইচরণ বাবু। তুমি ইঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আমার কথা ঠিক কি না জানিবে।" যতীন বাবু এই কথা বাবাজী মহাশয়কে বলিলে, ইনি একটু হাসিলেন।

দুর্গাপূজার পূর্ব্বে চতুর্থীর দিন প্রাতঃকালে বাবা—যোগেনবাবু যতীন বাবু এবং আমাকে বলিলেন—"দেখ! আমার একটী অষ্টপ্রহর, কীর্ত্তন করিবার ইচ্ছা হইতেছে।" আমরা বলিলাম,—"আজ্ঞে! আপনার যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন, আমাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন কি? তবে কি কি যোগাড় করিতে হইবে আমরা ত কিছুই জানি না। একটী ফর্দ্দ করিয়া দিন এবং কবে হইবে, দিন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিন।" বাবা অমনি একখানি ফর্দ্দ করিয়া দিলেন এবং সেই দিনই সন্ধ্যার সময় অধিবাস এবং পরদিবস প্রাতঃকাল হইতে নামকীর্ত্তনের ব্যবস্থা করিলেন।

সন্ধ্যার সময় রামদাস বাবাজী মহাশয়কে অধিবাস কীর্ত্তন করিতে আদেশ করিলেন। অনেক ভদ্রলোক কীর্ত্তন শুনিতে আসিয়াছিলেন। রাত্র প্রায় সাড়ে দশটা পর্য্যন্ত অধিবাস কীর্ত্তন হইল। উপস্থিত শ্রোতাগণ পরমানন্দ লাভ করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে নাম আরম্ভ করা হইল। লোকে লোকারণ্য! অনেক সাঁওতাল আসিয়া নামে যোগ দিতে লাগিল। সকাল বেলায় ডিষ্টিলারির কার্য্যের অনুরোধে আমি নামে যোগ দিতে পারি নাই। বেলা অনুমান দশটার

সময় আমি যাইয়া দেখি যে, বাবার সর্ব্বাঙ্গে ধূলা-কাদা মাখা—উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য করিতে করিতে এক একজনকে জড়াইয়া ধরিতেছেন, আর কাণে কাণে কি বলিয়া এরূপ ভাবে শক্তিসঞ্চার করিতেছেন যে, ছাড়িয়া দিবামাত্র তাহার দেহে অশ্রু, কম্প, পুলক প্রভৃতি সাত্বিক বিকারগণ প্রকাশ পাইতেছে। এরূপ ব্যাপার দর্শনে আমি অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত ভাবে নামে যোগ দিলাম এবং ক্ষণকাল পরেই বাবার কোলে আশ্রয় লাভ করিলাম। বাবা আমাকে বুকে করিয়া কিছুক্ষণ নৃত্য করিতে করিতে আমার কানে আমার গুরুদত্ত মন্ত্র প্রদান করিলেন। মন্ত্র বলিবার সঙ্গে সঙ্গে একটা তড়িত প্রবাহের ন্যায় আমার হৃদয়ে যেন কি একটা অনির্ব্বচনীয় শক্তি সঞ্চারিত হইল। আমি আনন্দে বিভোর হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে আমার কেরাণী মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত পাঁচথুপি নিবাসী শ্রীরমণীমোহন ঘোষের মুখে শুনিলাম যে, বাবা তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক তাঁহার কর্ণে তাঁহার ইষ্ট শক্তিমন্ত্র প্রদান করিয়াছেন। এইরূপে সকলের সঙ্গেই আলাপ করিয়া জানিতে পারিলাম যে, ঐ কীর্ত্তনের মধ্যে দীক্ষিত শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি যে যে উপস্থিত ছিলেন, বাবা সকলকেই আলিঙ্গনপূর্ব্বক তাঁহাদের কর্ণে স্বীয় স্বীয় গুরুদত্ত মন্ত্র শুনাইয়া দিয়াছেন। এই অমানুষিক শক্তি-প্রভাব দেখিয়া সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন।

একদিন বোমপশে সাহেব যতীন বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—বাবু! তোমার ওখানে যে সাধুরা আসিয়াছেন, তাঁহাদের খাওয়া দাওয়া কিরূপে চলে?” তখন যতীন বাবু বলিলেন,—“আমরা কয়েকজন মিলিয়া উঁহাদের খরচ বহন করিতেছি।” সাহেব বলিলেন,—“আজ হইতে উঁহারা যে কয়েকদিন থাকিবেন, তরিতরকারী, তেল প্রভৃতি জেলখানা হইতে আনিবে।” সাহেবের কথা শুনিয়া যতীন বাবু বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। সাহেব যে বাবাজী মহাশয়ের প্রতি এতদূর আকৃট হইয়াছেন, দেখিয়া আমরা বড়ই আনন্দ লাভ করিলাম।

অষ্টপ্রহরের পরদিন বাবা—যতীন বাবু, যোগেন বাবু প্রভৃতি আমাদিগকে ডাকিয়া বলিলেন,—"দেখ, আজ সন্ধ্যার পর নগরকীর্ত্তন বাহির করিতে হইবে।" বাবার কথা শুনিয়া আমরা একটু চিন্তিত হইলাম; কারণ, ইতিপূর্ব্বে রাত্র নয়টার পর সহরে কোনওরূপে গোলযোগ না হয়, সে বিষয়ে সাহেব একটু কড়াকড়ি নিয়ম করিয়াছেন। আমাদিগকে চিন্তিত দেখিয়া বাবা বলিলেন,—"তোমাদের কোন ভয় নাই, আমি রাত্র নয়টার মধ্যে কীর্ত্তন লইয়া ফিরিয়া আসিব। যাহাতে বেলা চারিটার সময় কীর্ত্তন বাহির হইতে পারে, তোমরা সেইরূপ উদ্যোগ কর।" অন্তর্য্যামী বাবা আমাদের মনের দুর্ব্বলতা বুঝিতে পারিয়া তদনুযায়ী ব্যবস্থা করিতে বলায় আমরা পরামানন্দিত ভাবে কীর্ত্তনের যোগাড় করিতে লাগিলাম এবং রাত্র নয়টার মধ্যে কীর্ত্তন ফিরিয়া আসিবে এই কথা সাহেবকে জানান হল।

চারিটার সময় নগর-কীর্ত্তন বন্দনা পাঠ করতঃ "আবার বল হরিনাম আবার বল" এই নাম ধরিয়া কীর্ত্তন বাহির হইল। লোকসংঘট্ট দেখিয়া সাহেব ঘোড়ায় চড়িয়া কীর্ত্তনের অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিলেন। বহুলোক সমবেত হইয়াছে; সকলেই বাবাকে দেখিতে বা ইঁহার মুখের দুই একটী সুমধুর পদ শুনিবার জন্য ব্যাকুল হইতেছেন জানিতে পারিয়াই যেন বাবা এক একটী চৌমাথার কাছে দাঁড়াইয়া নিতাই গৌরাঙ্গের লীলাগুণ সম্বন্ধীয় দুই একটী পদ গান করিতেছেন। সেই গগনভেদী, কীর্ত্তন-ধ্বনিতে দশদিক মুখরিত—দুম্‌কা সহর টলটলায়মান। আনন্দের পাথার বহিয়া যাইতেছে। আবালবৃদ্ধ-যুবা, স্ত্রী-পুরুষ সকলেই আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া স্ব স্ব কার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক উধাও হইয়া কীর্ত্তনের আগে পিছে ছুটিতেছে। বোম্‌পাশ সাহেব বেশ পরিস্কার বাংলা ভাষা শিখিয়াছেন; সুতরাং কীর্ত্তনের আনন্দ তিনিও বিশেষ ভাবে উপভোগ করিতেছেন।

রাত্র অনুমান আটটা, এই সময় বাবা ভাবাবেশে অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। বাবার অবস্থা দেখিয়া আমরা সকলেই বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলাম। কোনওরূপ উপায়ান্তর বুঝিতে না পারিয়া সঙ্গিগণের মধ্যে পাঁচ ছয় জন ইঁহাকে কাঁধে করিয়া যাইতে লাগিলেন। রামদাস বাবাজী মহাশয় অগ্রে অগ্রে কীর্ত্তন করিয়া যাইতেছেন; আমরা সকলে উঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ নাম করিতে করিতে গমন করিতেছি। বোম্‌পাশ সাহেব বাবার ঐরূপ অবস্থা দূর হইতে লক্ষ্য করিয়া ঘোড়া হইতে নামিয়া কীর্ত্তনের মধ্যে আগমনপূর্ব্বক বিস্মিত ভাবে বাবাকে দর্শন করিতে লাগিলেন। অনুরাগের স্রোতে বিধির বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। সময়ের প্রতি আর কাহারও লক্ষ্য নাই। সকলেই আনন্দে মাতোয়ারা! সংকীর্ত্তন সহর ভ্রমণ করিয়া রাত্র প্রায় বারটার সময় বাসায় ফিরিল।

বাবার এইরূপ অলৌকিক প্রভাব দেখিয়া দুম্‌কানিবাসী সকল লোকই বিস্মিত। রাস্তায়, ঘাটে মাঠে—স্বর্বত্র কেবল ইঁহার কথা লইয়া সমালোচনা হইতে লাগিল। অতি বড় পাষণ্ডও মুক্তকণ্ঠে বলিতেছে যে—"এরূপ অলৌকিক শক্তি আমরা আজ পর্য্যন্ত কোথাও দেখি নাই বা শুনি নাই।" এইরূপ ভাবে দুম্‌কায় সাতদিন কাটিয়া গেল। সাতদিনের দিন রাত্রে বাবা বৈদ্যনাথ যাইবার প্রস্তাব করিলেন। অন্ততঃ আর দুই একদিন দুম্‌কায় থাকিবার জন্য সকলে বিশেষ অনুরোধ করিলেও বাবা স্বীকৃত হইলেন না। সুতরাং কিরূপে ইঁহারা বৈদ্যনাথ যাইবেন, যতীনবাবু প্রভৃতি সেই বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরদিবস প্রাতঃকালে এই সংবাদ সাহেবের কর্ণগোচর হইলে, সাহেব যতীনবাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া একখানি টম্ টম্ এবং তিনখানি গরুর গাড়ীর ব্যবস্থা করিলেন। দুম্‌কা হইতে বৈদ্যনাথ প্রায় তেইশ ক্রোশ পথ হইবে। পথে তিনটী ডাকবাংলা পড়ে, ঐ ডাকবাংলায় যাহাতে ইঁহাদের থাকিবার ব্যবস্থাহয়, সাহেব সেইরূপ বন্দোবস্ত করিলেন। বেলা সাতটার

সময় গাড়ী আসিয়া পৌঁছিলে, ইনি উপস্থিত লোগদিগরে নিকট মনপ্রাণ-স্নিগ্ধকারী সুমধুর বাক্যে বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক গাড়ীতে উঠিলেন। যতীনবাবু, যোগেনবাবু প্রভৃতি বহুলোক ময়ূরাক্ষী নদী পর্য্যন্ত বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে সঙ্গে গমন করিলেন। নদীতে বান আসিয়াছে; টম্ টম্ এবং গাড়ী নৌকার উপর উঠিলে বাবাজী মহাশয় মিষ্ট বাক্যে সকলকে বিদায় দিয়া নৌকায় চড়িলেন।

বৈদ্যনাথ-গমনপ্রসঙ্গ।

ময়ূরাক্ষী নদী পার হইয়া বাবাজী মহাশয় টম্‌টমে উঠিলেন; সঙ্গিগণকে গরুর গাড়ীতে উঠিতে বলিলেন ফণী, রাধাবিনোদ, শীতল এবং বিজয়দাদা বলিলেন—"আজ্ঞে! আমাদের ইচ্ছা—আমরা হাঁটিয়া যাই।" শুনিয়া বাবাজী মহাশয় বলিলেন,—"এখান হইতে বৈদ্যনাথ অনেক দূর; যদি তোমাদের কষ্ট না হয়, যাইতে পার।" শুনিয়া হৃষ্ট-চিত্তে বাবাজী মহাশয়কে দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্ব্বক চারিজনে হাঁটিয়া চলিলেন। বাকি সকলেই গরুর গাড়ীতে চড়িয়া রওনা হইলেন। বেলা চারিটার সময় বাবাজী মহাশয় সদলে এক ডাকবাংলায় বিশ্রাম করিলেন। ফণী প্রভৃতি চারিজন কোথাও বিশ্রাম না করিয়া সন্ধ্যা সাতটার সময় গিয়া বৈদ্যনাথ পৌঁছিল। উহাদের সে রাত্রে আর কিছুই আহারাদি হইল না, এক গাছতলায় শয়ন করিয়া রহিল।

পরদিবস প্রাতে উঠিয়াই সদলে বাবাজী মহাশয়ের থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া সদাব্রত হইতে অনুমান ত্রিশজনের পরিমাণ চা'ল, ডা'ল প্রভৃতি আনিয়া রাখিল। বাবাজী মহাশয় পরদিবস মধ্যাহ্নে এক গ্রামে ঠাকুরের ভোগরাগের ব্যবস্থা করিয়া মহাপ্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক সন্ধ্যার সময় গিয়া বৈদ্যনাথ পৌঁছিলেন।

পৌঁছিয়াই ফণী প্রভৃতির পূর্ব্ব বন্দোবস্ত অনুসারে ধর্ম্মশালায় রহিলেন। উদ্ধারণ দাসকে রান্না করিতে আদেশ করিয়া বাবা বৈদ্যনাথের দর্শনে গমন করিলেন। একজন পাণ্ডা সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন, তিনি অতি যত্নের সহিত সকলকে দর্শন স্পর্শন করাইলেন। বাবার মাথায় একটি গর্ত্ত আছে দেখিয়া বাবাজী মহাশয় পাণ্ডাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"পাণ্ডা ঠাকুর! বাবার মাথায় গর্ত্ত কেন?" পাণ্ডা বলিল—"বাবা! এক সময় রাবণ কৈলাস পর্ব্বতে গমন করিয়া মহাদেবের তপস্যা করিতে লাগিল। আশুতোষ তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া যখন বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন, তখন রাবণ বলিল—"বাবা! আমি আপনার নিকট অন্য কোন বর প্রার্থনা করি না, আপনি আমার লঙ্কাপুরীতে গিয়া বাস করিবেন, এই আমার প্রার্থনা।" মহাদেব 'তথাস্তু' বলিয়া বলিলেন—"বাবা! আমি কেমন করিয়া যাইব?" রাবণ করযোড়ে বলিল—"কেন প্রভু! এ দাসের কাঁধে চড়িয়া যাইবেন" বলিয়া মহাদেবকে কাঁধে গ্রহণ করিলে, মহাদেব বলিলেন—"বাবা! আমার এই প্রতিজ্ঞা রহিল—আমাকে যে স্থানে নামাইবে আমি সেই স্থানেই থাকিব।" রাবণ এই কথাতেই স্বীকৃত হইয়া অতিশয় দ্রুতগতি গমন করিতে লাগিল। এই স্থানে আসিবামাত্রই রাবণের ভয়ানক প্রস্রাবের বেগ হইল; এমন কি আর এক পাও চলিতে না পারিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল—"প্রভুকে কাঁধে রাখিয়া প্রস্রাব করা সম্পূর্ণ অবিধি, আবার নামাইলেও হয় ত ঠাকুর আর উঠিবেন না। কি করি? আর ত স্থির থাকিতেও পারিতেছি না।" ভাবিয়া অগত্যা ঠাকুরকে নামাইতে বাধ্য হইল। প্রস্রাব করিয়া আবার যখন ইঁহাকে উঠাইতে চায়, ইনি আর কিছুতেই উঠেন না—তখন উঠাইতে না পারিয়া রাবণ ক্রোধে বাবার মাথার উপর বজ্র প্রহারবৎ এক মুষ্ঠ্যাঘাত করিল। বাবা পুস্পপ্রহারবৎ ভক্তের সেই প্রহার অঙ্গীকার করতঃ ভক্তবৎসলতার পরিচায়ক সেই চিহ্নটী মস্তকে ধারণ করিলেন।"

বাবাজী মহাশয় পাণ্ডা ঠাকুরের কথায় হো হো করিয়া উচ্চ হাস্য করিতে করিতে বলিলেন—"বা বেশ জব্দ! চিরকালই ভক্তের মার খাইতে হইয়াছে। ভক্ত ছাড়া কার সাধ্য এরূপ করে? ইত্যাদি নানারূপ রসপরিপূর্ণ কথাবার্ত্তার পর বাবাকে দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক ধর্ম্মশালায় আগমন করতঃযথাসময়ে মহাপ্রভুর ভোগান্তে মহাপ্রসাদ গ্রহণ পূর্ব্বক বিশ্রাম করিলেন।

পরদিবস প্রভাতে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনপূর্ব্বক "নিতাই এনেছে নাম হরিবোল হরিবোল" এই নাম ধরিয়া সদলে নগরকীর্ত্তনে বাহির হইলেন। বহুলোক সমবেত হইল। ক্রমে সহর ভ্রমণ করিয়া বাবা বৈদ্যনাথের মন্দিরে প্রবেশপূর্ব্বক নানারূপ ভাবের পদে বৈদ্যনাথের গুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। আগন্তুক লোকসকল এবং পাণ্ডাগণ অতিশয় আগ্রহ সহকারে কীর্ত্তন শ্রবণ করিতেছে; কিন্তু বাংলা ভাষা বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছে না, ইহা বুঝিতে পারিয়াই যেন বাবাজী মহাশয় "ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। গৌরী শঙ্কর সীতারাম" এই নাম ধরিলেন। বলিতে কি, দুই চারিবার এই নাম করিতেই পাণ্ডাগণ একেবারে উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য করিতে লাগিলেন। বাবা বৈদ্যনাথের সম্মুখে যেন আনন্দের উৎস ছুটিল। একদল "নিতাই গৌর রাধে শ্যাম" বলিতেছে, অপর দল "গৌরী শঙ্কর সীতারাম" বলিতেছে। সকলেই আত্মহারা, বাহ্যজ্ঞান-রহিত—নামানন্দে বিভোর নৃত্য করিতেছে। নামের রোলে দশদিক্ মুখরিত। কীর্ত্তনের ধ্বনি শুনিয়া বোধ হইতে লাগিল—যেন পঞ্চানন পঞ্চমুখে ডমরু বাজাইয়া গান করিতেছেন, আর উন্মত্তভাবে নৃত্য করিতেছেন।

এইরূপে বহুক্ষণ কাটিয়া গেল। সেবার কাল অতিক্রম হইয়া যায় দেখিয়া, পাণ্ডা পূজারীগণের অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাবাজী মহাশয় কীর্ত্তন লইয়া বাহির হইলেন। যথাসময়ে কীর্ত্তন ধর্ম্মশালায় আসিয়া পৌঁছিল। বেলা আন্দাজ সাড়ে এগারটার

সময় কীর্ত্তন সমাপ্তি করিয়া উপবেশন করিলেন। এই সময় দুই মূর্ত্তি বৈষ্ণব ইঁহার সম্মুখে আসিয়া প্রণাম করিলেন। দুই মূর্ত্তিরই যুবা অবস্থা; এক মূর্ত্তির একখানি পা খোঁড়া, অপর এক মূর্ত্তির মাথার চুল ও গায়ে আলখাল্লা। বাবাজী মহাশয় চুলওয়ালা সাধুটীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবা! তোমার নাম কি?"

সাধু। আজ্ঞে! আমার নাম কৃষ্ণদাস।

বাবাজী। তোমার বাড়ী কোথায়?

কৃষ্ণ। বরিশাল জেলায়।

বাবাজী। তোমরা কোন্ সম্প্রদায়?

কৃষ্ণ। আজ্ঞে! আমরা বাউল সম্প্রদায়ভুক্ত।

বাবাজী। তোমাদের সঙ্গে প্রকৃতি আছে কি?

কৃষ্ণ। আজ্ঞে! না।

বাবাজী। রাখিবার ইচ্ছা আছে কি?

কৃষ্ণ। কই? গুরুদেব ত সেরূপ কোনও আদেশ করেন নাই।

বাবাজী মহাশয় একটু মৃদু হাসিয়া অপরটীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবা! তোমার নাম কি?

সাধু। আজ্ঞে! আমার নাম রূপদাস।

বাবাজী। তোমার বাড়ী কোথায়?

রূপ। আজ্ঞে! আমার বাড়ী রাণীগঞ্জ।

বাবাজী। তোমরা দুইজনে কি এক সঙ্গেই থাক?

রূপ। আজ্ঞে! এই দুই তিন দিন মাত্র এই স্থানে আসিয়াছি। এইখানে দুইজনের দেখা শুনা।

বাবাজী। এখানে কোথায় থাক?

রূপ। আজ্ঞে! থাকার কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই। কখনও মন্দিরে, কখনও

কোন গাছতলায়ই কাটিয়া যাইতেছে। তিনদিনের মধ্যে একবেলা মহাপ্রসাদ মিলিয়াছে; বাকী দুই দিন প্রভু আর ভাগ্যে কিছু জোটান নাই।

বাবাজী। আজ আমাদের ঠাকুরের এইখানে মহাপ্রসাদ পাইতে আপত্তি আছে কি?

রূপ। আজ্ঞে! এ ত আমাদের পরম সৌভাগ্য। আপনি কৃপা-কটাক্ষ করিলে আমরা উদ্ধার হইতে পারিব।

বাবাজী। তোমাদের এখন কোথায় যাইবার ইচ্ছা?

রূপ। বাবা! আমাদের কোনও স্থিরতা হয় নাই। তবে মনে একটী বাসনার উদয় হইয়াছে, যদি আপনি দয়া করিয়া পূরণ করেন

বাবাজী। বাবা! বাঞ্ছাকল্পতরু নিতাইচাঁদ ত কাহারও বাসনা অপূর্ণ রাখেন না। তোমার মনের ভাব খুলিয়া বল।

রূপ। আজ্ঞে! আমার বড় সাধ যে, চিরজীবনের মত আপনার শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করিয়া আপনার সঙ্গে থাকি।

বাবাজী। তোমাকে নিতাইচাঁদ আমাদের সঙ্গে রাখিবেন, এ ত আমার পরম সৌভাগ্য। বেশ ত স্নানাদি করিয়া আইস।

শুনিয়া রূপদাস হৃষ্টচিত্তে স্নান করিতে গমন করিল। রূপদাস স্নান করিতে চলিয়া গেলে কৃষ্ণদাস বলিল—"আজ্ঞে! আমি কয়েকটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি।"

বাবাজী। স্বচ্ছন্দে বল বাবা।

কৃষ্ণদাস। আজ্ঞে! বাউলের ধর্ম্মটা কি?

বাবাজী। বাবা! বাউল শব্দের অর্থ "পাগল"। কৃষ্ণের প্রতি অনুরাগে বা কৃষ্ণপ্রেমে যে জন পাগল হইয়াছে, তাহাকেই "বাউল" বলা হয়। শ্রীঅদ্বৈত প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুকে বলিয়াছেন—"আমি বাউল তুমি দ্বিতীয় বাউল।" যে

জন কৃষ্ণপ্রেমে পাগল, সে যে কি ভাবে উপাসনা করে; তাহার চাল-চলন, আচার-ব্যবহার যে কিরূপ, তাহা কে বলিবে? তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে—প্রকৃত প্রেমোন্মত্ত ভাব না আসিলে কেবল সাজিলেই বাউল হওয়া যায় না। বাউলের ধর্ম্ম অপরকে উপদেশ কার যায়না। নিজ বিদ্যা-বুদ্ধির বলে বাউল অর্থাৎ পাগল সাজিলে লোকে তাহাকে সেয়ানা পাগল বলে। আচ্ছা, তুমি এই যে দাড়ি চুল রাখিয়াছ, ইহার উদ্দেশ্য কি?

কৃষ্ণদাস। উদ্দেশ্য আমি কিছুই বুঝি নাই, তবে গুরুপরম্পরায় দেখিতে পাই, তাই রাখিয়াছি।

বাবাজী। আচ্ছা! ইহাতে তুমি কি বুঝিয়াছ?

কৃষ্ণদাস। বুঝিয়াছি যে, দাড়ি চুল রখিলেই তাহাকে বাউল বলে।

বাবাজী। দেখ দেখি বাবা কি ভুল! প্রকৃত বাউল হওয়ার পরিণাম হইল দাড়ি চুল এবং প্রকৃতি রাখা, আর স্বেচ্ছামত ব্যবহার করা! অবশ্য আমি কোনও ধর্ম্মকে নিন্দা করিতে চাই না। অধিকারী যিনি হইবেন, তিনি কি করিতেছেন তাহা দেখিবার কাহারও অধিকার নাই; কিন্তু সর্ব্বসাধারণের প্রতি এইরূপ ধর্ম্ম প্রচার করা কেবল ধর্ম্মের বিপ্লব ঘটান ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই সমস্ত উপধর্ম্ম জগতে প্রচার হইয়াইত মহাপ্রভুর বিশুদ্ধ ধর্ম্মের উপর শিক্ষিত ভদ্রলোকদিগের বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে। আমি আর কি বলিব? দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম পাইয়াছ। কেবল লোকদেখান সাজ না সাজিয়া ভগবদুপাসনা কর; নিজেও শান্তি পাইবে, জগতেরও উপকার হইবে।

ইত্যাদি নানারূপ উপদেশ শ্রবণ করিয়া, কৃষ্ণদাস ব্যাকুল ভাবে বাবাজী মহাশয়ের চরণ ধরিয়া সাশ্রুগদগদকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—"বাবা! অতি অল্প দিন হইল আমি ঘর ছাড়িয়া আসিয়াছি। আমি কিছুই বুঝি না, অনেক লোককে এইরূপ বেশ করিতে দেখি, তাই আমিও করিয়াছি। আমি আপনার

চরণে শরণাপন্ন হইলাম। যাহাতে প্রকৃত পথে অগ্রসর হইয়া বিশুদ্ধ ভাবে মানবজীবনের কার্য্য করিতে পারি, আমায় সেই উপদেশ করুন।

বাবাজী। বাবা! আমি আর কি বলিব! যাহাতে তোমার মন বিশুদ্ধ ভাব ধারণ করে—প্রকৃত শান্তিলাভ করিতে পার, তাহাই কর। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, এই সমস্ত বেশভূষা পরিত্যাগ কর।

কৃষ্ণদাস আর কোন কথা না বলিয়া দ্রুতগতিতে চলিয়া গেল। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই রূপদাস এবং নিজে ক্ষৌর হইয়া স্নান করতঃ ভিজা কাপড়ে ইঁহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলে, ইনি দুইজনকে সাদা ডোর-কৌপীন বহির্ব্বাস দিয়া তিলক করিতে বলিলেন। সঙ্গিগণ উহাদিগকে তিলক করিয়া দিলে, বাবাজী মহাশয় বলিলেন—"বাবা! এই আয়নাখানি দিয়া একবার নিজ মুখখানি দেখ দেখি, আগে সুন্দর ছিল, না এখন সুন্দর হইয়াছে?" তখন উভয়ে দর্পণে নিজ নিজ রূপ দেখিয়া ব্যাকুলচিত্তে বলিল—"বাবা! এতই যখন করিলেন, এইবার মন্ত্র প্রদান করিয়া আমাদিগকে উদ্ধার করুন।" এইরূপ উহাদের বিশেষ আগ্রহে উঁহাদিগকে মন্ত্র প্রদান করিলেন। সেই হইতে উহারা সঙ্গেই রহিল। যথাসময়ে সকলে মহাপ্রসাদ পাইয়া অপরাহ্ণ চারিটার সময় "ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।" এই নাম করিতে করিতে বৈদ্যনাথ জংসনে আসিয়া একটী গাছতলায় বসিলেন। ক্রমে নানারূপ ভাবের লোক আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। একটী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আসিয়া বাবাজী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাবা! তোমাদের বাড়ী কোথায়?"

বাবাজী মহাশয় করযোড়ে প্রণাম করিয়া বলিলেন;—"বাবা! আমাদের বাড়ীঘর নাই! আমরা এইরূপ দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াই। নিতাই চাঁদ যখন যেখানে রাখেন, সেইখানেই থাকি।

বৃদ্ধ। নিতাই কোন্ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন?

বাবাজী। আজ্ঞে! তিনি রাঢ় শ্রেণী ব্রাহ্মণ ছিলেন।

বৃদ্ধ। তিনি কি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন?

বাবাজী। আজ্ঞে! এই ত প্রকাশ যে, তিনি অবধূত সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বৃদ্ধ। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া আবার বিবাহ করিলেন কিরূপে?

বাবাজী। বাবা! এ কথার আমি কি উত্তর দিব? তাঁহারা ঈশ্বর—স্বতন্ত্র পুরুষ; তাঁহাদিগের ক্রিয়াকলাপ জীব কি বুঝিবে? সমর্পিত দেহের কর্ত্তব্য কি; একজনের নিকটে বিক্রী হইলে তাঁহাকে কিরূপ আচরণ করিতে হয়, কিরূপ আজ্ঞা পালন করিতে হয়, নিতাই তাঁহার আদর্শস্থানীয় হইলেন। নিতাই নিজে আচরণ করিয়া জগৎকে দেখাইলেন। "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" এই শ্লোকের সম্পূর্ণ দৃষ্টান্তস্থল নিতাই। নিতাই বর্ণধর্ম্ম, আশ্রমধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম, কর্ম্ম যাবতীয় বস্তু মহাপ্রভুতে সমর্পণ করিয়াছেন। মহাপ্রভুর যেরূপ আদেশ, সেইরূপ করিলেন।

বৃদ্ধ। মহাপ্রভুও ত সন্ন্যাসী। তিনি নিজ সন্ন্যাস রক্ষা করিবার জন্য কত সাবধান থাকিতেন, আর অপর একজন সন্ন্যাসীর সন্ন্যাস ত্যাগ করাইলেন, এ কিরূপ কথা?

বাবাজী। মহাপ্রভু পূর্ণ পূর্ণতম সাক্ষাৎ ঈশ্বর। তাঁহার গভীর আশয় কে বুঝিবে? তিনি যদি তাহার নিজের লোক দ্বারা আদর্শ না দেখাইবেন, তবে আর আদর্শ কোথায় পাওয়া যাইবে? নিতাই তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ, অভিন্ন দেহ, জীব নিস্তারের মুখ্য অঙ্গ। ঈশ্বরের অপৌরুষের বাক্য কিরূপে পালন করিতে হয়, এইটী দেখাইবার জন্যই নিতাইকে আদর্শ স্থানীয় করিলেন। 'ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরণং ক্বচিৎ।" সকল ছাড়িয়া শেষ আজ্ঞা বলবান্। ঈশ্বর কি উদ্দেশ্যে কাহার দ্বারা কি করিতেছেন, তিনিই জানেন।

এইরূপ নানা কথা বলিলে, বৃদ্ধ সাশ্রুনয়নে বলিলেন—"বাবা! আমি এতদিন জানিতাম যে, এই বৈষ্ণব ধর্ম্মটা নেড়া নেড়ীর ধর্ম্ম; বোধ হয় ইহার মধ্যে কোনও শিক্ষিত লোক নাই। আজ তোমার কথাবার্ত্তা শুনিয়া বড়ই সুখী হইলাম। আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, আশীর্ব্বাদ করি—তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হউক।"

বাবাজী মহাশয় ব্রাহ্মণকে বিশেষ ভক্তি সহকারে প্রণাম করিলেন। গাড়ী আসিবার সময় হইল দেখিয়া একজন জিজ্ঞাসা করিল,—"আজ্ঞে! কোথাকার টিকিট করা হইবে?" বাবাজী মহাশয় বলিলেন,—"শ্রীধাম কাশীর টিকিট কর।" তাহাই হইল। যথাসময়ে গাড়ী আসিলে সকলে গাড়ীতে উঠিলেন।

শ্রীধাম কাশী গমন

বিজয়া দশমীর দিন বেলা অনুমান সাতটার সময় বাবাজী মহাশয় সগণে শ্রীধাম কাশীতে আসিয়া পৌঁছিলেন। ঘাটের নিকটবর্ত্তী একটী বাসায় সকলের থাকিবার ব্যবস্থা হইল। **মা অন্নপূর্ণার** ইচ্ছায় সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের ভোগের চা'ল, ডা'ল প্রভৃতি যোগাড় হইয়া গেল। দুই তিন জনকে ভোগের রান্নার ব্যবস্থার জন্য রাখিয়া আর সকলে নাম করিতে করিতে **শ্রীবিশ্বনাথের দর্শনে** গমন করিলেন। বিশ্বনাথের মন্দিরের মধ্যে মারবেল পাথরের উপর টাকা বসান আছে দেখিয়া বাবাজী মহাশয় বলিলেন—"তোমরা যে যে ইচ্ছা কর বিশ্বনাথ দর্শনে গমন কর, আমাকে বোধ হয় বিশ্বনাথ দর্শন দিবেন না!" একজন সঙ্গী জিজ্ঞাসা করিল—"আজ্ঞে! আপনি ভিতরে যাইবেন না কেন?" বাবাজী মহাশয় বলিলেন, —"দেখ, এই যে টাকা বসান আছে; ইহাতে একে ত ভারতেশ্বরী মহারাণীর মূর্ত্তি আছে, তাহাতে আবার টাকার উপর পা দিলে শ্রীলক্ষ্মীদেবীর অমর্যদ্যা করা হয়।" তখন সে বলিল—"আজ্ঞে! আসুন, আমি

আপনাকে কোলে করিয়া লইয়া যাই।” এই বলিয়া বাবাজী মহাশয়কে কোলে করিয়া শ্রীবিশ্বনাথের সম্মুখে লইয়া গেল। বিশ্বনাথের সম্মুখে গিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। প্রায় তিন ঘণ্টা মাতামাতি উদ্দণ্ড নৃত্য-কীর্ত্তন হইল। লোকে লোকারণ্য—কাহারই বাহ্যস্মৃতি নাই। বিশ্বনাথের পাণ্ডাগণ আসিয়া কীর্ত্তনে যোগ দিতে লাগিলেন। বেলা অতিরিক্ত হইয়াছে। পাছে সেবার অসুবিধা হয়, এই ভাবিয়াই যেন সকলের অনিচ্ছাসত্ত্বেও কীর্ত্তন লইয়া বাহিরে আসিতে মনস্থ করিলেন। পূর্ব্ববৎ ইঁহাকে একজন কোলে করিয়া বাহিরে আনিলে নাম করিতে করিতে বাসায় প্রত্যাগমন করতঃ যথাসময়ে স্নান, আহ্নিকাদি শেষ করিয়া মহাপ্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিলেন। অপরাহ্ন চারিটার সময় সঙ্গিগণকে বলিলেন—“দেখ, আজ বিজয়া দশমীর দিন কাশীধাম পরিক্রমা করা দরকার। কীর্ত্তনের যোগাড় কর।” সঙ্গিগণ হৃষ্টচিত্তে খোল-করতাল লইয়া প্রস্তুত হইলে বাবাজী মহাশয় নগরকীর্ত্তনের বন্দনা করিয়া পদ ধরিলেন ঃ—

দেখ দেখ আসি, যত কাশী বাসী,
আমার গৌরাঙ্গ চাঁদে।
হরি হরি বলি, দুটী বাহু তুলি,
ফুকারি ফুকারি কাঁদে॥
হেরি বিশ্বেশ্বর, প্রভু বিশ্বম্ভর,
ভাবে গর গর মন।
(বলে) প্রভু গোপেশ্বর, এই কৃপা কর,
দেহ ব্রজেন্দ্র নন্দন॥
(গোরার) সঙ্গে অগণন, সন্ন্যাসীর গণ,
সবাই প্রেমেতে ভোরা।

(সবাই) হরি হরি বলি, নাচে কুতূহলী,
নয়নে বহয়ে ধারা॥
মিশ্র তপন, আদি ভক্তগণ,
আনন্দে বিভোর হইয়া॥
(বলে) দেখ আঁখি ভরি, প্রাণ গৌরহরি,
নাচয়ে সন্ন্যাসী লইয়া॥
(যত) মায়া-বাদীগণ লইয়া শিষ্যগণ,
অজ্ঞানে মোহিত ছিল।
(তারা) হেরিয়া চৈতন্য, পাইল চৈতন্য,
সবেই ভকত ভেল॥
(এবে) ভজয়ে চৈতন্য, জপয়ে চৈতন্য,
কহয়ে চৈতন্য নাম।
বিনা শ্রীচৈতন্য, নাহি জানে অন্য,
শ্রীচৈতন্য ধন প্রাণ॥
কি মধুর লীলা, প্রভু প্রকাশিলা,
ধন্য ধন্য কাশীধাম॥
ওগো নর নারী, গাও প্রাণ ভরি,
নিতাই চৈতন্য নাম॥

এইরূপ ভাবে নিজ হৃদয়ের স্ফুর্ত্তি অনুসারে স্বকৃত পদাবলী দ্বারা কাশীবাসী বালক-বৃদ্ধ-যুবা স্ত্রী-পুরুষ সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করতঃ রাত্র অনুমান আটটার সময় দশাশ্বমেধ ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চারিদিকে লোকে লোকারণ্য। ঘাটে আর লোক ধরে না। "ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম, জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম, গৌরীশঙ্কর সীতারাম" এই নাম করিয়া প্রায় দুই ঘণ্টা উদ্দণ্ড নৃত্য

হইতেছে। সকলেই অসামাল, কে কোথায় পড়ে, কে কাহাকে ধরে ঠিক নাই। বাবাজী মহাশয় এক একবার **জয় নিত্যানন্দ রাম** বলিয়া যেমন হুঙ্কার করিতেছেন অমনি হরিধ্বনি, উলুধ্বনিতে দশদিক্ কম্পিত হইতেছে। আনন্দের পাথার বহিয়া যাইতেছে। রাস্তা হইতে ঘাট ও নীচে পর্য্যন্ত এক তিল স্থান নাই, সকলেই হাতে তালি দিয়া নাম করিতেছে। রাত্র অধিক হইয়াছে দেখিয়া সকলের অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাবাজী মহাশয় নাম সমাপ্ত করিয়া বাসায় প্রত্যাগমন করিলেন। পরমানন্দে সে রাত্র কাটিয়া গেল। পরদিবস অতি প্রত্যুষে উঠিয়া নিত্যকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক সকলকে প্রাতঃস্নান করিতে আদেশ করিয়া নিজে স্নানার্থ মণিকর্ণিকায় গমন করিলেন। ঘাটেই অনেক ভদ্রলোকের সহিত নানারূপ ভগবৎ-প্রসঙ্গ হইতে লাগিল। সকলেই একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন—"বাবা! আপনি কোথায় বাসা করিয়াছেন? আমরা অনেক অন্বেষণ করিয়াছি; চলুন, আপনার বাসায় যাই।" বাবাজী মহাশয় হৃষ্টচিত্তে সকলকে সঙ্গে করিয়া প্রত্যাগমন করিলেন। নানারূপ তত্ত্বকথার আলোচনা হইতে লাগিল। ইঁহার সিদ্ধান্তে কোনওরূপ সাম্প্রদায়িকতা নাই দেখিয়া সন্ন্যাসী, গৃহস্থ, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, প্রভৃতি সকলেই হৃষ্টচিত্তে প্রাণ খুলিয়া প্রশ্ন করিতেছেন; ইনিও সরল ভাষায় হাসি মুখে সকলের প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন। একজন ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবা। শ্রীধাম কাশীতে কতদিন থাকা হইবে?"

বাবাজী। বাবা! নিতাইচাঁদ আনিয়াছেন, কতদিন রাখিবেন তিনিই জানেন।

ভদ্র। এই স্থান হইতে কোথায় যাইবার ইচ্ছা?

বাবাজী। বাবা! আমি কাঠের পুতুলের ন্যায় পরাধীন। আমার স্বতন্ত্র কোন ইচ্ছা নাই বা হইতেও পারে না। **নিতাইচাঁদ** কোথায় লইয়া যাইবেন, কি কার্য্যে আনিয়াছেন তিনিই জানেন।

ভদ্র। আচ্ছা, এই যাতায়াতের খরচ কে বহন করেন?

বাবাজী। নিতাইচাঁদ।

ভদ্র। তবু একটা নিমিত্ত চাই ত!

বাবাজী। বাবা! আমি জীব, আমার সংকীর্ণ হৃদয় এবং পরিচ্ছিন্ন বুদ্ধি। প্রভু কাহাকে নিমিত্ত করিয়া কোন্ কার্য্য সম্পন্ন করিবেন, আমি কিরূপে জানিব? একজনকে নিমিত্ত করিয়া কাশীধাম পর্য্যন্ত আনিয়াছেন, অসিয়াছি এবং সঙ্গে যাঁহারা তাঁহার অন্তরঙ্গ পরিকরগণ আছেন, তাঁহাদিগকে নিমিত্ত করিয়া ভিক্ষালব্ধ বস্তু দ্বারা নিজ ভোগরাগের ব্যাপার নির্ব্বাহ করিতেছেন, আবার কাহাকে নিমিত্ত করিয়া কোথায় লইয়া যাইবেন, সে সমস্ত আমাদের ভাবিবার কোনই প্রয়োজন নাই।

ইঁহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া ভদ্রলোকটি বিস্মিতভাবে বসিয়া আছেন, ইত্যবসরে শ্রীযুক্ত কামাখ্যাদাস বাবাজী কলিকাতা হইতে আসিয়া ইঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। উঁহাকে দেখিবামাত্র বাবাজী মহাশয় বলিলেন—“কি হে, তুমি কি মনে করিয়া?”

কামাখ্যা। আজ্ঞে! আপনার কৃপাকর্ষণ। গতকল্য দর্জ্জিপাড়ানিবাসী যোগেনবাবু আমার নিকট গিয়া বলিলেন—“দাদা। বাবাজী মহাশয় সদলে কাশীতে আছেন; আপনি তাঁহাদের **বৃন্দাবন** যাইবার রাস্তা খরচ বাবদ এই দুই শত টাকা দিয়া তাঁহাকে এ দাসের সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ জানাইবেন।”

বাবাজী। আমি যে কাশীতে আছি, যোগেন কিরূপে জানিল?

কামাখ্যা। আজ্ঞে! আপনিই জানেন।

বাবাজী মহাশয়ের চক্ষু দুইটী রক্তবর্ণ হইল—সাশ্রুগদগদকণ্ঠে বলিলেন—“আহা মরি **নিতাইচাঁদের** কি করুণা! আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র জীবের আনন্দের জন্য তিনি অলক্ষিত ভাবে কতই কি না করিতেছেন! হায় রে, না ভজিতে তাঁহার এত দয়া। না জানি ভজিলে কি বা হইত! আমার ন্যায় অবিশ্বাসী

জীব পাছে ভ্রমে পড়িয়া যায় এই ভয়ে দয়াময় পূর্ব্ব হইতেই বন্দোবস্ত করিয়াছেন।" এইরূপবলিতে বলিতে বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। আগন্তুক ভদ্রলোকগণ উপস্থিত ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া একেবারে স্তম্ভিত ভাবে পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন—"দৃঢ় বিশ্বস্ত ভাবে সামান্য জীবও যদি কোনও ইচ্ছা করে, ঈশ্বর তাহা পূরণ করেন; আর ইনি একজন সিদ্ধ মাহত্মা, ইঁহার আর কথা কি?" কেহ বলিতেছেন—'ইহাতে যেরূপ অলৌকিক ভাব দেখা যায়, এরূপ ভাব ত আমরা আর কখনও দেখি নাই।" ইত্যাদি যাঁহার যেরূপ মনের ধারনা তিনিসেইরূপ বলিয়া পরস্পর প্রণাম প্রতিপ্রণাম পূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। এদিকে বাবাজী মহাশয় "আজই অপরাহ্নে **শ্রীধাম বৃন্দাবন** যাত্রা করিতে হইবে, সুতরাং যত শীঘ্র হয় মহাপ্রসাদাদি পাইয়া সকলে প্রস্তুত হও" সঙ্গিগণকে এইরূপ আদেশ করিয়া নিজে আহ্নিকাদি শেষ করতঃ যথাসময়ে মহাপ্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ বিশ্রামান্তে ষ্টেশনে গমন করিলেন।

শ্রীধাম বৃন্দাবন গমন ও কড়লীর কুঞ্জে অবস্থিতি।

কাশীবাসী অনেক ভদ্রলোক ইঁহার সঙ্গে কাশী ষ্টেশনে আসিলেন। গাড়ীর সময় হইলে সকলকে মধুর বাক্যে বিদায় দিয়া শ্রীধাম বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। যথাসময়ে ট্রেণ হাতরাস ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিলে সগণে গাড়ী হইতে নামিয়া একটী ধর্ম্মশালায় অবস্থান পূর্ব্বক সঙ্গিগণকে ঠাকুরের ভোগের ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। ভোগরাগের যোগাড় হইতে লাগিল, ইত্যবসরে শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে কালনার সিদ্ধ ভগবান দাস বাবাজী মহাশয়ের শিষ্য মহাত্মা শ্রীজগদীশ দাস বাবাজী মহাশয়ের চেলা শ্রীযুক্ত শচীনন্দন দাস বাবাজী মহাশয় আসিয়া

উপস্থিত হইলেন। জানি না ইতি পূর্ব্বে ইঁহাদের দেখাশুনা ছিল কি না; সাক্ষাৎ মাত্রই পরস্পর পরস্পরকে প্রণাম আলিঙ্গন পূর্ব্বক উপবেশন করিলেন। বাবাজী মহাশয়ই অগ্রে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি মনে করিয়া এস্থানে আসিলেন?"

শচী। আমি শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে গৌড়মণ্ডলে যাইতেছিলাম, কেন যেন এই দিকে খুব আকর্ষণ হইল। আসিয়া দেখি আপনি এস্থানে আছেন। আজ আমার পরম সৌভাগ্য! আমি আপনাকে দর্শন করিব বলিয়া বহুদিন হইতে বাসনা করিয়া আসিতেছি। এবার একেবারে দৃঢ় সংকল্প করিয়াছিলাম যে, আগত্যা শ্রীপুরুষোত্তম গিয়া আপনার চরণ দর্শন করিব। যাহা হউক, প্রভু আমাকে এই স্থানেই মিলাইয়া দিলেন।

বাবাজী। ভাই! আমার বিশ্বাস—তোমরা বৃন্দাবনবাসী; সুতরাং রাধারাণীর বিশেষ কৃপার পাত্র। এ অধম বর্হির্মুখী, কাজেই অধমকে বৃন্দাবন লইয়া যাইবার জন্য রাধারাণী তোমাকে পাঠাইয়াছেন।

শচী। আচ্ছা, বৃন্দাবনে আপনার যাইবার বিষয়ে কহাকেও সংবাদ দেওয়া হইয়াছে কি?

বাবাজী। নিতাইচাঁদ জানেন, আমার ত সংবাদ দিবার কোনই প্রয়োজন বোধ হয় নাই।

শচী। আমার ইচ্ছা নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারীকে একখানি টেলিগ্রাম করি।

বাবাজী। ভাই, আমি তোমাদের ওসমস্ত বিষয়ে কিছুই জানি না; তোমাদের যাহা ইচ্ছা হয় করিতে পার, আমার কোন আপত্তি নাই।

শচীনন্দন দাস বাবাজী মহাশয় হৃষ্টচিত্তে নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারীকে একখানি টেলিগ্রাম করিলেন। তাঁহার সঙ্গে প্রায় পাঁচ ছয় সের পেঁড়া ছিল, উহা আনিয়া বাবাজী মহাশয়ের সম্মুখে রাখিলেন। বাবাজী মহাশয় বলিলেন—"এ কি হইবে?"

শচী। মহাপ্রভুর ভোগ দিয়া সকলে প্রসাদ গ্রহণ করিবেন।

বাবাজী মহাশয় মৃদু হাসিয়া "বেশ হইয়াছে! মহাপ্রভু ভৃত্যগণসহ বহুদূর হইতে আসিতেছেন, ক্ষুধা হইয়াছে" বলিয়া প্রেমদাদাকে ভোগ লাগাইবার আদেশ করিলেন। যথাসময়ে ভোগ হইয়া গেলে বাবাজী মহাশয়, শচীনন্দন দাস বাবাজী মহাশয়কে বলিলেন—"এস ভাই! এক সঙ্গে মহাপ্রসাদ পাওয়া যাক্।" শচীনন্দন দাস বাবাজী মহাশয় প্রথমে একটু আপত্তি করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই বাবাজীমহাশয়ের হাত এড়াইতে না পারিয়া অগত্যা প্রসাদ পাইতে বসিলেন। বাবাজী মহাশয় প্রথমেই ইঁহার মুখে একটী পেঁড়া প্রসাদ তুলিয়া দিলে তিনিও একটী পেঁড়া হাতে করিয়া বাবাজী মহাশয়ের মুখে দিলেন। ক্রমে সঙ্গিগণকে ডাকিয়া ডাকিয়া উভয়েই তাহাদের হাতে পেঁড়া প্রসাদ দিতে লাগিলেন। পরমানন্দে পেঁড়া প্রসাদ পাওয়া শেষ হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে মহাপ্রভুর অন্নভোগ হইল। শচীনন্দন দাস বাবাজী মহাশয়ের মহাপ্রসাদ পাইবার ইচ্ছা না থাকিলেও বাবাজী মহাশয়ের অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না। পূর্ব্ববৎ পরমানন্দে মহাপ্রসাদ পাওয়া শেষ হইয়া গেল? অতি অল্প সময়ের মধ্যে ইঁহাদের পরস্পর এমনই একটী প্রীতির বন্ধন হইয়া গেল যে, শচানন্দন দাস বাবাজী মহাশয়ের আর গৌড়মণ্ডলে যাওয়া হইল না। বেলা আন্দাজ সাড়ে চারিটার সময় বৃন্দাবনের গাড়ী আসিলে সকলে গাড়ীতে উঠিলেন।

এদিকে টেলিগ্রাম পাইয়া নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী, গনেশবাবু এবং গোবিন্দ দাদাকে সঙ্গে লইয়া বাবাজী মহাশয়ের থাকিবার ব্যবস্থা এবং ভোগরাগের যোগাড় করিতে লাগিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বাবাজী মহাশয়ের বৃন্দাবনে আগমন বার্ত্তা চারিদিকে প্রচার হইয়া পড়িল। সকলেই পরমানন্দিত। কতক্ষণে বাবাজী মহাশয় পৌঁছিবেন, কতক্ষণে তাঁহার দর্শন পাইব ভাবিয়া

সকলেই উৎকণ্ঠিত। শ্রীযুক্ত রামহরি দাস বাবাজী মহাশয়, শ্রীমাধব দাস বাবাজী মহাশয়, নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী, গনেশ ভট্টাচার্য্য, অটল দাদা, গোবিন্দ দাদা প্রভৃতি অনেক লোক বাবাজী মহাশয়কে আনিবার জন্য বৃন্দাবন ষ্টেশনে গমন করিলেন। বৃন্দাবনের গাড়ীতে উঠিয়াই, বাবাজী মহাশয়ের যেন কেমন একরকম অবস্থা রইল। কাহারও সহিত কথাবার্ত্তা নাই। আরক্তিম নয়ন হইতে দরদরিত ধারে অশ্রু ঝরিতেছে। ক্ষণে ক্ষণে সর্ব্বাঙ্গে পুলকাবলী বিভূষিত, ক্ষণে ক্ষণে বা কম্প হইতেছে। ইনি যেন এ রাজ্যে নাই। সঙ্গিগণ আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া কীর্ত্তন করিতেছেন। গাড়ী যখন মথুরা ষ্টেশনের নিকট পুলের উপর আসিল, আমনি শচীনন্দন দাস বাবাজী মহাশয় বলিলেন,— "দাদা! এই যে **মথুরা**, একবার দর্শন করুন।" শুনিবামাত্র বাবাজী মহাশয় উঁহার গলা ধরিয়া ঠিক বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। গাড়ীর মধ্যে অন্যান্য যত লোক ছিল, সকলেই ইঁহার অবস্থা দর্শন করিয়া অবাক্ হইয়া গেল। ঐরূপ অবস্থাতেই বহুক্ষণ কাটিয়া গেল। যথাসময়ে গাড়ী আসিয়া বৃন্দাবন ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। বৃন্দাবনবাসিগণ কীর্ত্তনধ্বনি শুনিয়া বাবাজী মহাশয়ের গাড়ী অনুমান করতঃ নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সঙ্গিগণ একে একে গাড়ী হইতে নামিলেন। বাবাজী মহাশয় কিন্তু নিশ্চল নিঃশব্দ ভাবে বসিয়া আছেন। একেবারে বাহ্যজ্ঞানরহিত। শচীনন্দন বাবাজী মহাশয় ইঁহাকে ধরিয়া বসিয়া আছেন। এই সময় অটল দাদা বলিলেন, "আজ্ঞে! এই যে বৃন্দাবন ষ্টেশন! গাড়ী হইতে নামিতে হইবে যে?" "**বৃন্দাবন**" শব্দ কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র ইনি সিংহের ন্যায় হুঙ্কার ধ্বনি করতঃ এক লম্ফে প্লাটফরমে পড়িয়াই ব্যাকুল ভাবে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। কার সাধ্য সামলে? সর্ব্বাঙ্গ ধূলি-ধূসরিত। চোখের জলে এবং রজে মুখ বুক কর্দ্দমাক্ত। নামকীর্ত্তন পূর্ব্ববৎ চলিতেছে। লোকে লোকারণ্য। বহু সন্তর্পণে

অনেক সময় পরে কিঞ্চিৎ স্থিরতা লাভ করিলেন। চারি দিকে বহু লোকসংঘট্ট দেখিয়া ইনি করযোড়ে সকলকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। উপস্থিত সকলেই প্রতিপ্রণাম করিলেন। অবকাশ পাইয়া নিত্য স্বরূপ একে একে সকলের সহিত পরিচয় করাইয়া দিতে লাগিলেন—'ইনি আমাদের মাধব দাদা, ইনি আমাদিগকে এতই স্নেহের চক্ষে দেখেন যে, তাহা বলা যায় না। নবদ্বীপ দাদার সহিত বিশেষ ভালবাসা ছিল। গোবিন্দদাদা ইঁহারই সঙ্গে শ্রীরাধাকুণ্ডে বাস করেন। ইনি আমাদের কাকাগুরু, ইঁহার নাম শ্রীযুক্ত রামহরি দাস বাবাজী মহাশয়, সিদ্ধ জগন্নাথ দাস বাবাজী মহাশয়ের শিষ্য। শুনিবামাত্র বাবাজী মহাশয় সাষ্টাঙ্গে উঁহার চরণতলে পতিত হইলেন। তিনিও আস্তেব্যস্তে অতি আদরের সহিত ইঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন—"এস এস, আমার সোনার চাঁদ, আজ আমি একটী রত্ন পাইলাম। আমার সিদ্ধ বংশের মধ্যে এরূপ না হইলে কি শোভা পায়? আর আমার ভাবনা নাই চল বাবা! রাত্র হইয়াছে, বাসায় চল।" বলিয়া বাবাজী মহাশয়ের কাঁধে হাত দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। সঙ্গিগণ সকলেই কাকা বাবাজী মহাশয়, মাধব দাস বাবাজী মহাশয় প্রভৃতিকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। উঁহারাও সকলকে প্রেমালিঙ্গন দানে আপ্যায়িত করতঃ আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। বাবাজী মহাশয় শ্রীযুক্ত রামহরি দাস বাবাজী মহাশয়কে অগ্রে করিয়া মাধব দাদার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক কীর্ত্তন করিতে করিতে **গোবিন্দজীউর** মন্দির পরিক্রমা করতঃ **গঙ্গাজীউর** মন্দিরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। গঙ্গাজীউর মন্দিরেই ইঁহাদের থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। জানি না কেন যে গোবিন্দ দাদা একটু দূরে দূরে থাকিয়া সেবার যোগাড় করিতেছেন,—প্রত্যক্ষ ভাবে বাবাজী মহাশয়ের সহিত দেখাশুনা করেন নাই। প্রেমের বক্রগতি। যে স্থানে যত প্রীতি, সেই স্থানে তত অভিমান। নিত্যস্বরূপ দাদা গোবিন্দ দাদাকে বাবাজী মহাশয়ের

নিকট লইয়া গেলে ইনি আগ্রহাতিশয্যে উহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক প্রেমগদগদকণ্ঠে বলিলেন, 'হ্যারে গোবিন্দ! তুই এতদিন কিরূপে আমায় ফেলে এখানে আছিস্? তোর কি কঠিন হৃদয়! যা, কি কি বাল্য ভোগ করিয়াছিস্ নিয়ে আয়, বড়ই পিপাসা হইয়াছে।" গোবিন্দ দাদা-রহস্য ব্যঞ্জক স্বরে "হ্যাঁ হ্যাঁ জানি, বড়ই প্রেমিক ভদ্রলোক।" বলিয়া দ্রুতগতি সরবৎ এবং বাল্যভোগের প্রসাদ লইয়া আসিলে ইনি শ্রীরামহরি দাস বাবাজী মহাশয়, মাধবদাস বাবাজী মহাশয় প্রভৃতি মহাত্মাগণকে সঙ্গে লইয়া বাল্যভোগ প্রসাদ পাইতে লাগিলেন। আতি অল্প সময়ের মধ্যেই অন্নভোগ হইয়া গেলে পূর্ব্ববৎ সকলে মিলিয়া পরমানন্দে মহাপ্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন, ইঁহারাও বিশ্রাম করিলেন।

শ্রীযুক্ত রামহরি দাস বাবাজী, শ্রীমাধব দাস বাবাজী মহাশয় প্রভৃতি কেবল নামমাত্র নিজ নিজ ভজনকুটীরে গমন করেন; মনটী সর্ব্বদাই বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে থাকে। গঙ্গাজীউর মন্দিরটী শ্রীযমুনার সন্নিকটে। বাবাজী মহাশয় অবসর পাইলেই **ভ্রমর ঘাটের** উপর গিয়া বাসিয়া থাকেন। কখন ব্রজমায়ীগণ মণ্ডলী বন্ধনে নৃত্য করিতে করিতে গমন করিতেছেন দেখিয়া ভাবাবিষ্ট! অমনি সখীমঞ্জরীগণ পরিবেষ্টিত শ্রীরাধারাণীর রূপের উদ্দীপনা হওয়ায় সেই অনুযায়ী লীলামাধুরী, কথায় বা পদে বর্ণনা করিতে থাকেন। কখন বা ময়ূরের ডাকে, কখন বা ভ্রমরের গুঞ্জনে, কখন বা কোকিলগণের শব্দে, আবার কখনও বা প্রফুল্লিত তরুলতার শোভা দর্শনে বিমুগ্ধভাব অবলম্বন করেন।

একদিন বেলা চারিটার সময় বাবাজী মহাশয় প্রভুপাদ রঘুনন্দন গোস্বামী, পূজ্যপাদ রামহরিদাস বাবাজী মহাশয় এবং অন্যান্য মহাত্মাগণের সঙ্গে ভ্রমর ঘাটের উপর বসিয়া যমুনার শোভা দর্শন করিতেছেন, এই সময় নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী একখানি ফটো তুলিয়া লইলেন।

গঙ্গাজীউর মন্দিরে চার পাঁচ দিন থাকিয়া নিত্যস্বরূপ দাদা, অটল দাদা প্রভৃতির বিশেষ আগ্রহে বাবাজী মহাশয় শ্রীশ্রীমদনমোহনের পাড়ায় **কড়লীর কুঞ্জে** গমন করিলেন। বাবাজী মহাশয়ের অপূর্ব্ব কীর্ত্তন, অভাবনীয় ভাবাবেশ, অদৃষ্টপূর্ব্ব সুমধুর সরল ব্যবহার প্রভৃতিতে ক্রমেই বৃন্দাবনবাসী আবাল বৃদ্ধ-যুবা সকলে আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন; প্রায় সর্ব্বদাই নানারূপ ভাবের লোক আসিয়া নানারূপ আলাপাদি দ্বারা পরিতৃপ্ত হইতেছেন ও ইঁহাকে পরিতৃপ্ত করিতেছেন। একদিন একজন বৃদ্ধ ভক্ত আসিয়া ইঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবা! আমার কয়েকটী কথা জিজ্ঞাসা আছে,অনুমতি করেন ত বলি।"

বাবাজী। বাবা! কোনই আপত্তি নাই।

বৃদ্ধ। শ্রীরাধাগোবিন্দ প্রাপ্তির সহজ উপায় কি?

বাবাজী। একমাত্র কৃপা ভিন্ন কলির জীবের পক্ষে আর অন্য উপায় নাই।

বৃদ্ধ। কাহার কৃপা?

বাবাজী। আব্রহ্মস্তম্ভ হইতে ব্যষ্টি সমষ্টি ভাবে রাধাগোবিন্দ পর্য্যন্ত সকলের কৃপা।

বৃদ্ধ। বাবা! এক জীবনে কিরূপে সকলের কৃপালাভ হইতে পারে?

বাবাজী। বাবা! একটী বৃক্ষের মূলে জল দিলে যেমন শাখাপল্লবাদি সকলেই পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ মূলের কৃপা হইলেই সকলের কৃপা হইবে।

বৃদ্ধ। এই মূলে কে এবং কিরূপেই বা কৃপা হইবে?

বাবাজী। যিনি যাঁহার প্রপ্তির জন্য লালায়িত, তাঁহার পক্ষে তিনিই মূল; তাঁহার কৃপা হইলেই তাঁহার প্রপ্তি হইবে।

বৃদ্ধ। বাবা! আমি কথাটি বেশ ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না; একটু

স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে। ধরুন, আমার শ্রীরাধাগোবিন্দ প্রাপ্তির বাসনা। আমি কি উপায়ে তাঁহাদিগকে লাভ করিতে পারিব?

বাবাজী। প্রাপ্তির কামনাটী যদি আপনার আন্তরিক এবং বিশুদ্ধ হয়, তবে শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করিয়া শ্রীগুরু রূপে সাক্ষাৎ হইয়া প্রপ্তির উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া দিবেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলিয়াছেন ঃ—"গুরুরূপে কৃষ্ণকৃপা তত্ত্বের অবধি।" স্তানান্তরে—"গুরু অর্ন্তয্যামিরূপে শিখান আপনি।" আবার গীতায় অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—"দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে।" কৃপাই একমাত্র সম্বল। জীবের প্রতি ভগবানের অসীম কৃপা। যিনি যতই সাধন ভজনের গর্ব্ব করুন না কেন, মূলে তাঁহার কৃপা ভিন্ন জীবের কিছুমাত্র সাধ্য নাই। এতই কৃপা! "জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরু চৈত্ত্যরূপে।" পাছে অবিশ্বাস জন্মে, তাই চৈত্ত্যরূপে অধিষ্ঠিত হইয়া জীবের বুদ্ধি পরিমার্জ্জত করেন।

বৃদ্ধ। এই কৃপা পাইবার উপায় কি?

বাবাজী। কৃপা পাইবার উপায় তাঁহার কৃপা। তিনি কৃপাপরবশ। কৃপা তাঁহাকে যেমন করাইবে তিনি তেমনি করবেন। আহারে, বিহারে শয়নে, স্বপনে, জাগরণে তাঁহার বিন্দুমাত্র স্বতন্ত্রতা নাই, তিনি সম্পূর্ণ কৃপাপরতন্ত্র। কৃপা তাঁহাকে যে স্থানে যে ব্যক্তির নিকট পাঠাইবে, তাহার কুল, শীল, রূপ, গুণ, জাতি, বিদ্যা, ভজন, সাধন কোন কিছুরই অপেক্ষা থাকে না; তিনি অবিচারে যন্ত্রারূঢ় পুত্তলিকাবৎ তাহার নিকট গিয়া উপস্থিত হন—না চাহিতে দয়া করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন—"আহো বকী যং স্তনকালকুটং জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী। লেভে গতিং খাত্র্যচিতাং ততোহন্যং কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজাম॥" ভবিয়া দেখুন, পূতনার কৃপা পাইবার কি হেতু ছিল? কংসের আদেশে ক্রুরা রাক্ষসী কৃষ্ণকে মারিবার মানসে স্তনে কালকূট

বিষ মাখাইয়া সেই স্তন তাঁহার মুখে দিয়াছিল। কৃপাময় কৃষ্ণ তাহাকে ধাত্রীজনোচিত গতি প্রদান করিলেন। তাই বলি বাবা! কৃপা ভিন্ন এমন কোন উপায় নাই—যাহার দ্বারা কৃষ্ণপ্রাপ্তি হইতে পারে।

বৃদ্ধ। বেশ কথা! যদি তিনি অবিচারেই কৃপা করেন, তবে সকলের উপর সমান ভাবে কৃপা হয় না কেন? কেহ বা সর্ব্বদা পরিপূর্ণ আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইয়া ভগবদ্ধামে ভক্তগঙ্গে ভগবৎ-সান্নিধ্যসুখ অনুভব করিতেছেন কেন? আবার কেহ বা সর্ব্বদা অসৎসঙ্গে অসৎ কার্য্যে রত থাকিয়া অশেষ যন্ত্রণাদায়ক নরক ভোগ করিতেছে কেন? যদি বলেন, নিজ নিজ সুকৃতি দুস্কৃতির ফলভোগ করিতেছে, তাহা হইলে আর তাঁহার কৃপা হইল কি? যাহার সুকৃতি আছে সে ত নিজ শক্তি প্রভাবেই ভগবদ্ভক্তি বা সান্নিধ্য লাভ করিবে। তাহাতে আবার কৃপার কি হইল? যদি পূতনার ন্যায় যাবতীয় অসুর প্রকৃতি স্ত্রীলোকদিগকে ধাত্র্যচিত গতি দান করেন, তবে ত আমি তাঁহার নির্হেতুকী কৃপা স্বীকার করিব। নচেৎ কেন বলিব না যে ভগবানে পক্ষপাতিত্ব দোষ আছে?

বাবাজী। বাবা! যে কোন ভাবেই হউক, পূতনা যেমন কৃষ্ণ পাইবার জন্য কৃষ্ণকে কোলে করিয়া তাঁহার মুখে নিজ স্তন প্রদান করিবার জন্য তন্মনস্কা এবং তদালাপা হইয়াছিল, ঐরূপ লোভ-পরবশ বা হইলে কৃপা গ্রহণ করিবে কে? বিকারগ্রস্ত রোগীদিগকে সদ্বৈদ্য কৃপা-পরবশ হইয়া ঔষধ প্রদান করিলেও তাহারা যেমন অগ্রাহ্য করে বা উহা দূরে নিক্ষেপ করে, তদ্রূপ ভগবৎ-প্রাপ্তিকামী না হইলে কখনও কৃপা গ্রহণ করিতে পারিবে না। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন—"কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ ক্রিয়তাং যদি কুতেঽপি লভ্যতে। তত্র মূল্যমেব লৌল্যমেকলং জন্মকোটিসুকৃতৈর্ন লভ্যতে।" তাঁহাকে বা তাঁহার কৃপাকে পাইবার জন্য যে লোভ অর্থাৎ প্রবল ইচ্ছা, সেটাটীই একমাত্র সোপান।

বৃদ্ধ। বেশ বুঝিলাম, আচ্ছা এই লোভটী কিরূপে জন্মে?

বাবাজী। বাবা! এই লোভটী নিত্যসিদ্ধ। জীব কর্ম্মানুযায়ী যেরূপ দেহই ধারণ করুক না কেন, লোভটী সহজাত। "সুখং মে ভুয়াং দুঃখং মাভুৎ" এই বাসনা জীবমাত্রেরই বর্ত্তমান। জীব সুখলোভে ধাবমান হইয়া নানা কার্য্যে করিতে থাকে; এমন কি লোভের বলে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া যায়। তখন রূপলোভী পতঙ্গগণ যেমন সুন্দর, সুখস্পর্শ এবং প্রাণরাম জ্ঞানে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া অতিকষ্টে জীবন ত্যাগ করে, শত শত প্রাণী ছট ফট করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, কেহ কেহ বা দগ্ধ পক্ষ দগ্ধ হস্তপদের যন্ত্রণায় ভীষণ চীৎকার করিতেছে, তথাপি অপরাপর দর্শক পতঙ্গগণ চৈতন্যলাভ করিতেছে না, তাহারাও গিয়া ঐ কুণ্ডে ঝাঁপ দিতেছে, সেইরূপ জীবগণ সুখের লোভে অন্ধ হইয়া প্রকৃত সুখময় পর্দাথকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক কামসাগরে বা ক্রোধাগ্নি প্রভৃতির আকর সংসারকূপে ঝাঁপ দেয়; সুতরাং দুঃখ ভিন্ন ভাগ্যে সুখ লাভ হয় না। ইহাতে ভগবানের কি দোষ? তিনি ত সংসার-ক্ষেত্রকে বিষময় করিয়া প্রস্তুত করেন নাই! জীব শিক্ষাভূমিকে বিলাস-ভূমি মনে করিয়া অভক্ষ্য ভক্ষণ, অগম্য গমন, অবাচ্য ভাষণ, অস্পৃশ্য স্পর্শন, অদৃশ্য দর্শন প্রভৃতি কার্য্য করিয়া অনাদিকাল বন্ধনযন্ত্রণা ভোগ করে। ভগবান প্রকৃত আনন্দময় পদার্থ প্রদান করিতে গেলেও জীব দুঃখময় জ্ঞানে উহা দূরে পরিহার করে। যদি দৈবাৎ মহৎকৃপায় একবার চৈতন্যলাভ হয়, তবে এই কামই প্রেমে পরিণত হইয়া কৃষ্ণকর্ম্মে, ক্রোধ ভক্তি বা ভক্তের প্রতিকূল পদার্থে, মোহ এবং মদ ইষ্ট গুনগানে, মাৎর্সয্য প্রভুর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া লোভকে প্রকৃত লোভনীয় পরম সুখময় পদার্থে নিযুক্ত করে। তখন এই সংসারই ভগবৎকৃপা প্রাপ্তির সহায়তা করে। এই স্ত্রীপুত্রাদি শিক্ষাগুরুরূপে পরিণত হইয়া থাকে।

বৃদ্ধ। তবে এতক্ষণে বুঝিলাম যে, মহ্য কৃপাই ভগবৎ প্রাপ্তি বা তৎকৃপাপ্রপ্তির মূল কারণ।

বাবাজী। আতি সুসত্য কথা। "মহৎকৃপা বিনা কোন কার্য্য সিদ্ধ নয়। কৃষ্ণকৃপা দূরে রহু সংসার না যায় ক্ষয়॥"

বৃদ্ধ ভক্তটী এতক্ষণে এক রকমভাবে ইঁহার কথা শুনিতে বা বলিতেছিলেন, যেমন ইনি বলিলেন—"মহৎকৃপা একমাত্র অবলম্বনীয়" আমনি সাশ্রুগদগদকণ্ঠে ইঁহার চরণ ধারণ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন—"বাবা! এ অপটু বিকলেন্দ্রিয় বৃদ্ধকে কৃপা করিতে হইবে। আমি এতকাল বৃথা অভিমানে কাটাইয়াছি। প্রকৃত তত্ত্বের প্রতি লক্ষ্য করিতে পারি নাই। আমি মনে করিতাম ভজন করিলেই ভগবৎপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। আজ আপনার সঙ্গ প্রভাবে বুঝিলাম, একমাত্র কৃপা ভিন্ন কোন উপায়ান্তর নাই। আগাগোড়া কেবল কৃপাই একমাত্র সম্বল। তাই বলি—আমায় কৃপা করিতে হইবে।" বৃদ্ধের অবস্থা দর্শনে বাবাজী মহাশয় আস্তে ব্যস্তে উঁহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন দানে কৃতার্থ করতঃ নানারূপ প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা করিলেন। এইরূপ পরমানন্দে দিন যাইতে লাগিল।

বাবাজী মহাশয় শ্রীধাম বৃন্দাবনে আগমন করিয়াছেন, এ কথা ভক্ত এবং বৈষ্ণবমণ্ডলীর মধ্যে বিশেষ ভাবে প্রচারিত হইল। সিদ্ধ ভগবান দাস বাবাজী মহাশয়ের প্রিয় শিষ্য মহাত্মা শ্রীযুক্ত জগদীশ দাস বাবাজী মহাশয়ও শুনিয়াছেন। উঁহার বৃদ্ধাবস্থা। বাবাজী মহাশয়ের বৃন্দাবন অবস্থানকালে আগ্রহসত্ত্বেও দূরত্ব হেতু পরস্পরের সম্মিলন ঘটে নাই। সম্প্রতি ইঁহারা কড়লীর কুঞ্জে আসিয়াছেন। শ্রীযুক্ত জগদীশ দাস বাবাজী মহাশয় কালীদহে থাকিয়া ভজন করেন। কালীদহ হইতে কড়লীর কুঞ্জ অতি নিকটবর্ত্তী। একদিন বেলা অনুমান আটটার সময় শ্রীযুক্ত জগদীশ বাবাজী মহাশয় কয়েক মূর্ত্তি ভক্ত সঙ্গে কড়লীর কুঞ্জে আসিয়া

উপস্থিত হইলেন। বাবাজী মহাশয় উপরতলার ঘরে বসিয়াছিলেন; সংবাদ পাইবামাত্র দ্রুতগতি আসিয়া উঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবামাত্র তিনি ইঁহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন দিলেন। তখন অতিশয় আগ্রহসহকারে তাঁহাকে উপর তলায় লইয়া গিয়া বসিতে আসন দেওয়া হইলে তিন ভক্তগণ সহ উপবেশন পূর্ব্বক ইষ্টালাপ করিতে লাগিলেন। পরমার্থ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত জগদীশ দাস বাবাজী মহাশয় ইঁহার কাকা; সুতরাং তিনি বাৎসল্যভাবেই বলিলেন—"বাবা! তুমি বৃন্দাবনে আসিয়াছ শুনিয়াও আমি তোমার সহিত দেখা করিতে পারি নাই। কারণ আমি বৃদ্ধ, বৃন্দাবনে গিয়া দেখা করা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। সম্প্রতি নিকটে আসিয়াছ শুনিয়া আজ আসিতে বড়ই ইচ্ছা হইল। যাহা হউক ভাল আছ ত?" ইনি করযোড়ে বলিলেন "বাবা! আপনাদের কৃপায় বেশ আনন্দেই আছি। আপনি এত কষ্ট স্বীকার করিয়া আসিলেন কেন! আমিই ত একবার আপনাকে দর্শন করিতে যাইব মনে করিয়াছিলাম। সন্তানের উপর এত বাৎসল্য না হইলে চলিবে কেন?" তখন জগদীশ দাস বাবাজী মহাশয় বলিলেন—"বাবা! তুমি আমাদের আদরের বস্তু। নিতাই গৌরাঙ্গের কৃপায় তুমি পরম ধন লাভ করিয়াছ; তোমার গৌরবে আমরা গৌরবান্বিত। প্রর্থনা করি দিন দিন আরও উন্নতি লাভ কর। ভক্তিপথে বহু উপশাখার প্রাবল্য হেতু নানারূপ বিভ্রাট ঘটিতেছে। বিশুদ্ধ পথে চালাইবার লোক অতি বিরল। নিরপরাধে দীর্ঘ জীবন লাভ করতঃ আপামর সাধারণকে বিশুদ্ধ প্রেমভক্তি-সম্বলিত মহাপ্রভুর অভিপ্রেত গোস্বামিপাদগণের প্রচারিত পন্থা বুঝাইয়া দাও। লোকসকল ধন্য হউক।" এইরূপ ভাবে প্রায় দুই ঘণ্টা কাল ইষ্টগোষ্ঠী করিয়া মাধুকরীর সময় অতিবাহিত হয় জানিয়া নিজ ভজনকুটীরে যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, বাবাজী মহাশয় করযোড়ে বলিলেন,—"বাবা! আমার বাসনা—আমি যে কয়েকদিন এস্থানে থকিব আমার এইস্থানে

প্রত্যহ মাধুকরী করা হয়। যদি অনুমতি করেন, না হয় ভজনকুটীরে মহাপ্রসাদ পাঠাইয়া দেবার ব্যবস্থা করিয়া দিব।" শুনিয়া শ্রীযুক্ত জগদীশ দাস বাবাজী মহাশয় বলিলেন—"বাবা! আমি ত কোথাও নিমন্ত্রণ খাই না বা কোথাকার পারশও লই না। আচ্ছা, একদিন তোমার সঙ্গে একত্র বসিয়া মহাপ্রসাদ পাইব, আজ আর বাধা দিও না। আমি চলিলাম" বলিয়া কালীদহে গমন করিলেন। বাবাজী মহাশয় উহার সঙ্গে সঙ্গে কিছুদূর অগ্রসর হইলে তিনি ইঁহাকে বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আদেশ করায় ইনি প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। কখনও ইনি কালীদহে যান, আবার কোনও দিন বা তিনি এই স্থানে আগমন করেন। এইরূপ ভাবে প্রায় প্রত্যহই পরস্পরের সম্মিলন হইয়া ইষ্টগোষ্ঠী হইতে লাগিল।

শ্রীযুক্ত রামহরিদাস বাবাজী মহাশয় এবং মাধবদাস বাবাজী মহাশয় প্রায় সর্ব্বদাই বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে থাকেন। যদিও পরমার্থ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রামহরিদাস বাবাজী মহাশয় ইঁহার কাকা হন, কিন্তু তাঁহার এতই সরল ব্যবহার যে, কেহই তাঁহার সঙ্গে গুরুত্বভাব রাখিতে সমর্থ হন না; ঠিক বালকের ন্যায় সর্ব্বদা হাস্য-রসালাপে সঙ্গিগণকে আনন্দিত করেন। অবসর পাইলেই বাবাজী মহাশয় কয়েকজন অন্তরঙ্গ সঙ্গী লইয়া উঁহার নিজকৃত চৈতন্যমঙ্গল আস্বাদন করেন। সে এক অপূর্ব্ব রহস্য। যত কিছু রস-পরিহাস, রসবিলাস, রসমাধুর্য্যবার্ত্তা, কেবল গৌরাঙ্গকে লইয়া; সে সমস্ত রসকাব্য শ্রবণ করিয়া সকলেই আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়া যান। তাঁহার প্রতি কথায় যেন হাসির উৎস ছুটীতে থাকে। কাকা-ভাইপো যেন এক প্রাণ।

শ্রীঅদ্বৈত-বংশোদ্ভব শ্রীযুক্ত রঘুনন্দন গোস্বামী প্রভুপাদ প্রায়ই মাঝে মাঝে আগমন করেন। একদিন আসিয়া বলিলেন—"দেখুন, কাল হইতে আমার রাধামাধবের প্রসাদ পাইতে হইবে। আমি এইস্থানে প্রসাদ আনিয়া দিব।

আপনি অঙ্গীকার করুন, আর কোথাও হইতে প্রসাদ আসিলে তাহা গ্রহণ করিবেন না। বাবাজী মহাশয় একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"দেখুন, যেমন প্রভুর আজ্ঞা, তেমনি মহাপ্রসাদ, উভয়ই বন্দনীয়; এ অবস্থায় আমার কি কর্ত্তব্য? আমি কাহার অমর্য্যাদা করিব? তবে এই মাত্র বলিতে পারি—যাঁহার আগে দর্শন পাইব, তাঁহাকেই প্রথম বন্দনা করিব।" প্রভুপাদ হৃষ্টচিত্তে এই কথা স্বীকার করিয়া বাসায় গমন করিলেন। তাঁহার ধারণা যে তাঁহার অগ্রে কেহই মহাপ্রসাদ লইয়া যাইতে পারিবে না। এদিকে গোবিন্দদাদা রাত্র অনুমান তিনটা হইতে রান্না করিয়া ভোরে ঠাকুরের ভোগ দিলেন। যদিও বাবাজী মহাশয় স্নান, আহ্নিকাদি করিতে একটু বিলম্ব করিতেছেন—ইঁহার মনের ভাব প্রভুপাদের প্রসাদ আসিলে তবে পঙ্গত করিবেন; কিন্তু সখ্যরসাবিষ্ট, সেবাপরায়ণ, গোবিন্দদাদার আগ্রহে আর বিলম্ব করিতে পারিলেন না; সকলে মহাপ্রসাদ পাইতে বলিলেন। ইনি নিজের পার্শ্বে একটু আল্‌গা ভাবে একখানি পাতা করিলেন। পরিবেশন করা হইতেছে, ইত্যবসরে গোস্বামী প্রভু পূজারীর হাতে অনুমান দশজনের পরিমিত মহাপ্রসাদ লইয়া আসিলেন। আসিবামাত্র ইনি বলিয়া উঠিলেন,—"আসুন! আসুন প্রভু! এই মাত্র আপনার কথা মনে করিতেছিলাম।" প্রভু ইঁহাদিগকে মহাপ্রসাদ পাইতে বসা দেখিয়া একটু বিস্মিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এত সকালে কে মহাপ্রসাদ আনিল?

বাবাজী। এই গোবিন্দ ঘরে রান্না করিয়া ঠাকুরের ভোগ দিয়াছে।

গোবিন্দের রান্নার কথা শুনিয়া প্রভু আনন্দিত চিত্তে বললেন—"তা বেশ, রান্না হইয়াছে ত, বড়ই সুখের বিষয়।" তখন বাবাজী মহাশয় পূর্ব্বোক্ত পাতা খানিতে প্রভুপাদকে বসাইয়া পরমানন্দে প্রভুপাদের আনীত রাধামাধবের মহাপ্রসাদ এবং ঠাকুরের মহাপ্রসাদ একত্রিত করিয়া সেবা করাইতে লাগিলেন। পরমানন্দে মহাপ্রসাদ পাওয়া শেষ হইলে, প্রভুপাদ পরদিবস রাধামাধবের বাড়ীতে গিয়া মহাপ্রসাদ পাইবার জন্য ইঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন।

এইরূপ পরমানন্দে দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। একদিন অপরাহ্ন সময় শ্রীযুক্ত কেশবানন্দ স্বামিজী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বহুদিন হইতেই ইঁহাদের পরস্পর ভ্রাতৃভাব। বাবাজী মহাশয় কেশবানন্দ স্বামিজীকে দাদা সম্বোধন করেন। স্বামিজী বলিলেন—"ভাই! তুমি বৃন্দাবনে আসিয়াছ শুনিয়াও আমি নানা কার্য্য বশতঃ তোমার সহিত দেখা করিতে পারি নাই। সেজন্য আমার অপরাধ লইও না।"

বাবাজী। আপনি যে বৃন্দাবনে আছেন আমি ত জানি না, জানিলে আমিই গিয়া আপনাকে দর্শন করিতাম।

স্বামিজী। ভাই! আমি রাধাবাগে একটী আশ্রম করিয়াছি; সেই আশ্রমের কার্য্যেই ব্যস্ত ছিলাম, তাই আসিতে পারি নাই।

বাবাজী। কার্য্যে শেষ হইয়া গিয়াছে?

স্বামিজী। সম্প্রতি যতদূর হইবার কথা ছিল, তাহা শেষ হইয়াছে। কাল তাহার প্রতিষ্ঠাকল্পে কিছু হোম, জপ, পূজাদি হইবে। তোমাকে সদলে সেই স্থানে যাইতে হইবে। নিমন্ত্রণ করিবার জন্যই আমি আসিয়াছি। নিশ্চয় যাইতে হইবে।

বাবাজী। দাদা! সে ত আমার নিজের আশ্রম; সে জন্য আর আপনার নিমন্ত্রণ করিবার প্রয়োজন কি?

স্বামিজী। না না, আগামী কল্য আশ্রমে কীর্ত্তন করিতে হইবে এবং আশ্রম প্রতিষ্ঠা হইবে, এই সংবাদটী তোমাকে দিতে আসিয়াছি। নিমন্ত্রণ আর কি করিব? তোমাদের আশ্রমে তোমরা যাইবে ভাই! আমি ত কেবল নিমিত্তমাত্র।

ইত্যাদি নানারূপ ইষ্টালাপ করিয়া স্বামিজী গমন করিলেন। অটলদাদা বাবাজী মহাশয়কে বলিলেন—"আপনি যে স্বামিজীর আশ্রমে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। উঁহারা ত জ্ঞানমার্গাবলম্বী; সুতরাং উঁহারা ঠাকুর দেবতা মানেন

না—কাহারও ভোগ দেন না। তবে আমাদের কিরূপে প্রসাদ পাওয়া হইবে?"

বাবাজী। আচ্ছা, সে সব বিচার তোমাদের করিতে হইবে না। তোমরা কেশবানন্দ দাদাকে চেন না, উনি একজন পরমভক্ত; গৌরাঙ্গ দেবে উহার সুদৃঢ় ভক্তি-বিশ্বাস রহিয়াছে। কেবল বেশের প্রতি লক্ষ্য করিয়া লোক চিনিতে যাইও না। মহাপুরুষগণ কে কোন্ বেশে, কে কোন্ ভাবে থাকেন, কে তাহা স্থির করিবে? অনেক মহাত্মা প্রতিষ্ঠার হাত হইতে নিজেকে বাঁচাইবার জন্য ঘোর পাষাণ্ডের বেশে থাকেন। কাল দেখিবে—আমার সঙ্গে যে মহাপ্রভু আছেন, এই মহাপ্রভু সেইস্থানে গিয়া তাঁহার যজ্ঞেশ্বর রূপে অধিষ্ঠিত হইয়া সমস্ত ভোগ অঙ্গীকার করিবেন।

ইত্যাদি নানা কথাবার্ত্তায় রাত্র হইল; যথাকালে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিয়া সকলে বিশ্রাম করিলেন। পরদিবস বেলা অনুমান দশটার সময় বাবাজী মহাশয় সগণে নাম করিতে করিতে মহাপ্রভুর চিত্রপট সঙ্গে করিয়া রাধাবাগে স্বামিজীর আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হইলেন। অপূর্ব্ব কৌতুহল! কীর্ত্তন আশ্রমের নিকটবর্ত্তী হইতে না হইতে স্বামিজী সশিষ্যে আসিয়া সংকীর্ত্তন ভিতরে লইয়া গেলেন। ইঁহারা আশ্রমে প্রবেশ করিয়াই যে স্থানে হোমের জন্য বেদী প্রস্তুত হইয়াছিল, বাবাজী মহাশয়ের আদেশে ঐ বেদীর উপর মহাপ্রভুর চিত্রপট বসাইলেন। এদিকে স্বামিজীর শিষ্যবর্গ এবং ইঁহারা উভয় দলে একত্রিত হইয়া প্রায় দুই ঘণ্টা সময় খুব মাতামাতি উদ্দণ্ড কীর্তন করতঃ কীর্ত্তন সমাপ্ত করিলেন। স্বামিজী হৃষ্টচিত্তে বলিলেন,—"যখন সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর শ্রীমন্মহাপ্রভু আসিয়া যজ্ঞবেদী অঙ্গীকার করিয়াছেন, তখন সকল যজ্ঞ পূর্ণ হইয়া গেল। আর আমার পৃথক যজ্ঞের প্রয়োজন কি?" এই কথা শুনিয়া সকলেই হরিবোল ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। বাবাজী মহাশয় আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে গিয়া

স্বামিজীকে অলিঙ্গন প্রদান করিলেন। উভয়ে উভয়কে কোলে ধরিয়া প্রেমভরে হাস্য, রোদন এবং নৃত্য করিতে লাগিলেন। উভয় দেহে সমকালীন অশ্রু, কম্প, পুলকাদি সাত্ত্বিক বিকার প্রকাশ পাইতে লাগিল। উভয় মহাপুরুষের শিষ্যগণ দেখিয়া শুনিয়া অবাক! বাহ্যিক বেশে উভয় মহাপুরুষের সঙ্গিগণ মনে ভবিয়াছিলেন যে, বোধ হয় উভয় মহাত্মারই উপাসনাগত বা আন্তরিক ভাবগত অনেক পার্থক্য রহিয়াছে; কিন্তু উভয়ের মিলন প্রসঙ্গে যাহা দেখিলেন সেটী সম্পূর্ণ বিপরীত। কে বলিবে যে উভয়ের উপাসনাগত বা আন্তরিক ভাবগত কোনরূপ পার্থক্য আছে? কিছুক্ষণ পরে উভয়ে কিঞ্চিৎ স্থির হইয়া উপবেশন করিলেন। উভয় দল চারিদিকে ঘেরিয়া মহাপুরুষদ্বয়ের শ্রীমুখনিঃসৃত ভগবৎ-লীলাকথামৃত পানে কর্ণচকোরের পরিতোষ বিধান করিতে লাগিলেন। নানারূপ ভগবৎপ্রসঙ্গ হইতেছে, ইত্যবসরে স্বামিজীর একজন প্রিয়শিষ্য আসিয়া বলিলেন,—"আজ্ঞে! রান্না শেষ হইয়া গিয়াছে। এখন কি করিতে হইবে?" স্বামিজীও বাবাজী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলে ইনি বলিলেন—"যজ্ঞবেদীর উপর যে যজ্ঞেশ্বর শ্রীগৌরাঙ্গদেব অধিষ্ঠান করিয়াছেন, যাবতীয় বস্তু তাঁহার ভোগ হইবে" বলিয়া একজনকে সেই ভোগের ব্যবস্থা করিতে বলিয়া অপরাপর সঙ্গিগণের প্রতি ভোগ আরতি কীর্ত্তনের আদেশ করিলেন। যথা-নির্দ্দিষ্ট সময়ে ভোগ আরতি কীর্ত্তন শেষ হইলে মহাপুরুষদ্বয় উপস্থিত ভক্তবৃন্দসমভিব্যাহারে মহাপ্রসাদ লইয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিলেন। স্বামিজীর অভিপ্রায় যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুকে সঙ্গে লইয়া সগণে বাবাজী মহাশয় সেদিন সেই আশ্রমেই থাকেন। সেইরূপ ভাবের প্রস্তাব করায় বাবাজী মহাশয় বলিলেন,—"দাদা! এ ত আমার নিজের আশ্রম; আবার যখন ইচ্ছা আসিব বা থাকিব সেজন্য কোন চিন্তা নাই, তবে আজ আর এস্থলে থাকিলে চলিবে না, ক্ষমা করুন।" বলিয়া দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক নাম করিতে করিতে অনুমান সাড়ে

চারিটার সময় কড়লীর কুঞ্জে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এদিকে শ্রীরামহরিদাস বাবাজী, শ্রীমাধবদাস বাবাজী প্রভৃতি কয়েক মূর্ত্তি মহাত্মা বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, বাবাজী মহাশয় আসিবামাত্র সকলে হৃষ্টচিত্তে গিয়া মিলিত হইলেন। ইনি দণ্ডবৎ প্রণামাদি করিয়া সকলের সঙ্গে হৃষ্টগোষ্ঠী করিতে লাগিলেন। এদিকে সঙ্গিগণকে আরতি-কীর্ত্তন করিতে আদেশ করিলে সকলে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

রাজর্ষি বনমালীবাবুর সহিত মিলন ও তত্ত্ব-আলোচনা *

একদিন রাজর্ষি বনমালী বাহাদুরের আদেশে অপরাহ্ণ অনুমান পাঁচটার সময় রাজর্ষির ম্যানেজার শ্রীযুক্ত কামিনীবাবু বাবাজী মহাশয়ের সহিত দেখা করিবার জন্য কড়লীর কুঞ্জে আগমন করিলেন। বাবাজী মহাশয় শ্রীরামহরিদাস বাবাজী, শ্রীমাধবদাস বাবাজী প্রভৃতি কয়েক মূর্ত্তি মহাত্মা বৈষ্ণবগণের সহিত ভগবৎপ্রসঙ্গ করিয়া উঁহাকে অতিশয় আগ্রহের সহিত বসাইয়া প্রশ্ন করিলেন,—“বাবা! তোমার নাম কি?” কামিনীবাবু করযোড়ে বলিলেন,—“আজ্ঞে! আপনার দাসানুদাস কামিনী কুমার ঘোষ।”

বাবাজী। কি জন্য আসা হইয়াছে?

কামিনী। আজ্ঞে! আমি রাজর্ষি বনমালী রায়বাহাদুরের চাকরী করি; তিনি আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন।

বাবাজী। কেন বাবা! তিনি কি উদ্দেশ্যে পাঠাইয়াছেন?

---

* এই ঘটনাটী সম্বন্ধে শ্রীবৃন্দাবনবাসী সিদ্ধ মহাত্মা শ্রীল শ্রীযুক্ত মাধবদাস বাবাজী মহাশয়ের এবং ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত কামিনী কুমার ঘোষ মহাশয়দিগের নিকট আমরা অনেক বিবরণ পাইয়া এই স্থানে উদ্ধৃত করিলাম।

কামিনী। আজ্ঞে! নানারূপ কার্য্য বশতঃ তিনি নিজে আসিতে পারিলেন না। তাঁহার ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন। তিনি দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক বিনীত প্রার্থনা জানাইয়াছেন যে, আগামী পরশ্ব তারিখ তাঁহার সেবিত **শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ বিনোদিনী** গোষ্ঠাষ্টমী উপলক্ষে বন-ভ্রমণে বাহির হইবেন; অতএব অনুগ্রহ করিয়া আপনি সদলে **শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডের** বাড়ীতে গমন করিবেন।

বাবাজী। বাবা! একসঙ্গে শ্রীরাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, কুণ্ডেশ্বর, কুণ্ডেশ্বরী এবং তাঁহাদের প্রিয় ভক্ত রাজর্ষি বাহাদুর প্রভৃতি দর্শন করিব, এ ত আমার পরম সৌভাগ্যের কথা। কখন্ যাইতে হইবে?

কামিনী। আজ্ঞে! আদেশ করেন ত আগামী কল্যই সমস্ত বন্দোবস্ত করি।

বাবাজী। বাবা! নিতাই চাঁদের যাহা ইচ্ছা তিনি করিবেন। আহা মরি! নিতাই আমার কি পরম দয়াল! পাছে শ্রীরাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড দর্শন করিতে আমাদের ন্যায় দুর্ব্বল কলিহত জীবের কষ্ট হয় ভাবিয়া নানারূপ বন্দোবস্ত— এমন কি, থাকিবার খাইবার পর্য্যন্ত বন্দোবস্ত করিতে প্রস্তুত। কি অদ্ভুত কৃপা! প্রভু হে! ধন্য তোমার করুণা! তুমি যাহা ইচ্ছামাত্র সম্পন্ন করিতে পার, আমরা তাহা বিশেষ নিপুণতার সহিত ভাবিলেও ধারণা করিতে পারি না! কৃপাময়! এমন অবিচারে কৃপার কথা ত আর কোন যুগে শুনা যায় না।

বলিতে বলিতে ইঁহার দুইটী চক্ষু রক্তবর্ণ এবং ঢুলু ঢুলু হইল—গদগদকণ্ঠে নিতাই চাঁদের কত যে গুন গান করিতে লাগিলেন, তাহার আর ইয়ত্তা নাই।

কামিনীবাবু কিন্তু মহাত্মার ব্যবহার দেখিয়া শুনিয়া অবাক্! ভাবিলেন— মহৎসঙ্গই মহৎসঙ্গের বা কৃপার হেতু। রাজর্ষির সঙ্গপ্রভাবে হয় ত এই মহাপুরুষের নিকট আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র জীবও অনেক অমূল্য রত্ন পাইবে। সময় সংকীর্ণ হেতু দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া ইঁহার আজ্ঞাক্রমে সে স্থান হইতে রওনা হইয়া নীচের তলায় ইঁহার একটী শিষ্য অটলদাস বাবাজীর সহিত দেখা

করিয়া আগামী কল্য ইঁহাদের যাইবার জন্য গাড়ী প্রভৃতি যাহা যাহা প্রয়োজন, তাঁহার উপরই সেই ভার অর্পণ করিয়া, এই সংবাদ রাজর্ষিকে দিবার জন্য শ্রীকুণ্ডে রওনা হইলেন।

পরদিবস যথাসময়ে অটলদাদা কয়েকখানি গাড়ী ও এক্কার বন্দোবস্ত করিলেন। বাবাজী মহাশয়ের আদেশে শ্রীমন্মহাপ্রভুর চিত্রপট সঙ্গে করিয়া তিন মূর্ত্তি বৈষ্ণব অগ্রে একখানি গাড়ীতে আসিয়া ইঁহাদের আগমনবার্ত্তা রাজর্ষিকে জানাইলেন। শুনিয়া রাজর্ষি বাহাদুর এবং অন্যান্য সকলে পরমানন্দিত চিত্তে কিরূপভাবে ইঁহাদিগকে আহ্বান করা হইবে, এই পরামর্শ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে একখানি এক্কায় চড়িয়া অটলদাস বাবাজী আসিয়া সগণে বাবাজী মহাশয়ের মানস গঙ্গা পর্য্যন্ত আগমনের সংবাদ দিলে রাজর্ষি বাহাদুর শ্রীহরিচরণদাস বাবাজী, শ্রীরসিকদাস বাবাজী, শ্রীবিষ্ণুদাস বাবাজী, ছোট নিত্যানন্দদাস বাবাজী প্রভৃতি কয়েকমূর্ত্তি বৈষ্ণব সঙ্গে করিয়া **শ্রীকুণ্ড ও কুসুম সরোবরের** মধ্যবর্ত্তী একটী বাগানের মধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

এদিকে বাবাজী মহাশয় মানস গঙ্গার জল স্পর্শ করিয়া গিরিরাজকে দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক কুসুম সরোবর পর্য্যন্ত গাড়ীতে আসিলেন। গিরিরাজের দর্শন পাওয়া মাত্রই যেন ইঁহার চিত্তের গতি অন্যরূপ হইয়া গেল—যেন একেবারেই বাহ্যদৃষ্টি রহিত হইয়া গেলেন। কুসুম সরোবরে আসিয়াই পদব্রজে যাইবার মানসে গাড়ী হইতে নামিয়া প্রেমগরগরভাবে প্রিয় রামদাসকে নাম ধরিতে আদেশ করিলেন। রামদাদা হৃষ্টচিত্তে মনপ্রাণমাতান স্বরে নাম ধরিলেন। সকলেই পদব্রজে কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে গমন করিতেছেন। সিদ্ধ মহাত্মা শ্রীযুক্ত প্রেমদাস বাবাজী মহাশয়ের শিষ্য কুসুম সরোবরবাসী শ্রীযুক্ত শ্যামদাস বাবাজী মহাশয় জানি না কি উদ্দেশ্যে, সকলের চক্ষুর অন্তরালে কুসুম সরোবরের নিকটবর্ত্তী কোন একটী স্থানে প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন। বাবাজী

মহাশয় কীর্ত্তন পরিত্যাগ করিয়া, যে স্থানে শ্যামদাস বাবাজী মহাশয় লুকাইয়াছিলেন, সেই স্থানে গিয়া একেবারে উঁহার হাত ধরিয়া কত কালের পরিচিতের ন্যায়—"কিরে শ্যামদাস! তুই এখানে কেন? তুই যে আমার ছোট ভাই, আমি তোকে খুঁজিতেছিলাম" বলিয়া তাঁহাকে লইয়া কীর্ত্তনের মধ্যে উপস্থিত হইলেন। শ্যামদাস বাবাজী বিস্মিতভাবে ইঁহার বামদিকে থাকিয়া কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নাম করিতে করিতে চলিলেন। কীর্ত্তনধ্বনি শ্রবণে রাজর্ষি প্রভৃতি সকলেই অগ্রসর হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন, বাবাজী মহাশয়ও প্রতিদণ্ডবৎ করতঃ সকলকে আলিঙ্গন প্রদানপূর্ব্বক ভাবগদগদকণ্ঠে কহিলেন,—"আজ আমি ধন্য হইলাম, ভাই! তোমরা শ্রীরাধাকুণ্ডবাসী, তোমরা আমাকে কৃপা কর, যেন কৃপাময়ী রাধারাণী নিজ দাসী বলিয়া সেবায় অঙ্গীকার করেন। কারণ, কুণ্ডে আর কুণ্ডেশ্বরীতে ভেদ নাই—"যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণো স্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।" তোমরা কুণ্ডবাসী, সুতরাং শ্রীমতীর অন্তরঙ্গা; তোমরা আমায় কৃপা কর।" ইত্যাদি বলিতে বলিতে বিভোর হইয়া পড়িলেন দেখিয়া শ্রীহরিচরণদাস বাবাজী মহাশয় বলিলেন,—"আচ্ছা, কে অন্তরঙ্গা বুঝা যাইবে, একবার শ্রীকুণ্ড পরিক্রমা করিয়া বিনোদিনীর নিকটে যাওয়া যাক্" বলিয়া ইঁহাকে অগ্রে করিয়া সকলে **শ্রীরাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড** দণ্ডবৎ প্রণাম ও পরিক্রমা করতঃ বিনোদের বাড়ী প্রবেশ করিলেন। বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র রাজর্ষি বাহাদুর বাবাজী মহাশয়কে বলিলেন,—"দাদা! আসুন, **বিনোদ বিনোদিনীকে** দর্শন করিবেন।" ইনি হৃষ্টচিত্তে রাজর্ষির সহিত বিনোদের মন্দিরে গমন করিলেন। বিনোদ-বিনোদিনীর অপরূপ রূপলাবণ্য, অপূর্ব্ব সিঙ্গার, অভাবনীয় কটাক্ষভঙ্গি প্রভৃতি দর্শনে বাবাজী মহাশয় একেবারে বিমুগ্ধ হইয়া প্রাণের আবেগে কত কত পদ, কত কত স্তব আপন মনে ছোট ছোট করিয়া গান করিতে লাগিলেন, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? দুইটী চোখের জলে মুখ

বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। অবকাশ পাইয়া সাত্ত্বিক বিকারগণ সমকালীন আসিয়া ইঁহার দেহকে আশ্রয় করিল। কিছুক্ষণ পরে রাজর্ষি বাহাদুরের অনুরোধে নিজভাব সম্বরণপূর্ব্বক সকলকে সঙ্গে করিয়া শীতলি ভোগের প্রসাদ পাইতে লাগিলেন। সে এক অপূর্ব্ব আনন্দ! সর্ব্বপ্রথমেই ইনি কিঞ্চিৎ প্রসাদ হাতে লইয়া হরিচরণ দাস বাবাজী মহাশয়ের মুখে দিলেন; তিনিও নিজের পাতা হইতে কিঞ্চিৎ লইয়া ইঁহার মুখে দিলেন। এইরূপ ভাবে ইনি প্রত্যেকের মুখে এবং প্রত্যেক ইঁহার মুখে দিতে লাগিলেন। সকলেই যেন আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। ইতিপূর্ব্বে বৃন্দাবনে ইঁহাদের মধ্যে এ জাতীয় আনন্দ আর কখনও হয় নাই; সুতরাং আজ সকলেই একটী অভিনব আনন্দ উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। পরমানন্দে শীতলি ভোগের প্রসাদ পাওয়ার পর এক স্থানে বসিয়া সকলে ইষ্টগোষ্ঠী করিতে লাগিলেন।

যিনি যে ভাবেই প্রশ্ন করিতেছেন, বাবাজী মহাশয় একমাত্র 'কৃপা' এই কথাটী দ্বারা সমস্ত সিদ্ধান্তের চুড়ান্ত করিয়া দিতেছেন। কৃপা ভিন্ন যে কিছুই হইতে পারে না, এইটীই সকলকে বেশ সরল ভাষায় বুঝাইয়া দিতেছেন। মহানুভবগণের হৃদয়ে যখন যে বিষয়ের আবেশ হয়, উঁহারা সেই বিষয়ের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া থাকেন। বাবাজী মহাশয় শ্রীধাম বৃন্দাবনে আসা অবধি ইঁহার সর্ব্বদা কেবল শ্রীমন্মহাপ্রভুর অশেষ কৃপা স্ফুর্ত্তি। সেই কৃপার আবেশে প্রায় সর্ব্বদাই শ্রীরূপ গোস্বামী-পাদকৃত—"অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ, সমর্পয়িতু মুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্। হরিঃ পুরট-সুন্দর-দ্যুতি-কদম্ব-সন্দীপিতঃ। সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতুবঃ শচীনন্দনঃ।।" এই শ্লোকটী লইয়া সমালোচনা করিতেছেন, অর্থাৎ শ্রীমন্মহাপ্রভু যে করুণা-পরবশ হইয়া চির-অনর্পিত নিজসঞ্চিত গুপ্ত সম্পত্তি আপামর সাধারণকে বিতরণ করিবার জন্যই শ্রীধাম নবদ্বীপে উদয় হইয়াছেন, এই বিষয় লইয়াই সিদ্ধান্ত করিতেছেন।

আরও বলেন যে, শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ "যুষ্মাকং হৃদয়ে শচীনন্দনঃ স্ফুরতু" এই যে আশীর্ব্বাদ-সূচক বাক্যটী প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, "চিরদদত্তসঞ্চিতনিজগুপ্তবিত্তসমর্পণরূপকরুণাময়ত্বেন স্ফুরতু ইতি যাবৎ।" আমরা কলিহত মায়ামুগ্ধ জীব, আমাদের সাধনাদির সামর্থ্য কোথায়? সাধন করিয়া পাইবই বা কি? যদি আমাদের ন্যায় কলিহত জীবের কিছুমাত্র কর্ত্তব্য থাকে সেটী কেবল—নিতাই গৌরাঙ্গের অপরিসীম কৃপার জয় দেওয়া। আমরা কি অকৃতজ্ঞ! যদি কোন ধনী ব্যক্তি আমাদিগকে সামান্য কোনও সাহায্য প্রদান করেন তবে আমরা জীবনে তাঁহার কথা ভুলিতে পারিব না—এমন কি সর্ব্বদার তরে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহার দয়ার কথা ঘোষণা করিয়া বেড়াইব; কিন্তু দাতার শিরোমণি, যাঁহারা নিজ অমূল্য সম্পত্তি অবিচারে সেধে যেচে আপামর সাধারণকে প্রদান করিলেন, আমরা কিনা দিনান্তে, নিশান্তেও একবার তাঁহাদের কৃপার কথা ঘোষণা করিতে বা তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে সঙ্কুচিত হই।" এই কথা শুনিয়া হরিচরণ দাস বাবাজী মহাশয় প্রশ্ন করিলেন—"আচ্ছা, একথা আমাদের সর্ব্বদার তরে উপলব্ধিহয় না কেন?"

বাবাজী। কৃপালব্ধ বস্তুর মর্যাদা উপলব্ধি করা বড়ই কঠিন—যেমন স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি এবং পৈতৃক সম্পত্তি। একটী গল্প মনে পড়িল। একদিন শ্রীধাম পুরীর বড় রাস্তা দিয়ে একটী বিশিষ্ট ভদ্রলোক সমুদ্রের দিকে গমন করিতেছিলেন। ভদ্রলোকটীর গায়ে একখানি বহুমূল্য শাল এবং পায়ে জুতা। রাস্তায় অত্যন্ত রজ; সুতরাং ভদ্রলোকটী দুই চারি পা চলিতে চলিতে গায়ের শালখানা দিয়া পায়ের জুতা যোড়াটি পরিষ্কার করিতেছেন। অপর দিক হইতে কয়েকটী লোক আসিতেছিলেন; উহাদের মধ্যে একটী বৃদ্ধলোক সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আচ্ছা, তোমরা বল ত, ঐ যে ভদ্রলোকটী চলিতে

চলিতে গায়ের বহুমূল্য শালখানি দিয়া জুতা যোড়াটী ঝাড়িতেছেন উহার মর্ম্ম কি?" কেহই কিছু অনভব করিতে না পারায় বৃদ্ধ বলিলেন—"আমি নিশ্চয় বলিতেছি ঐ শালখানা উহার পিতার আমলের এবং জুতা যোড়াটী উঁহার নিজের কেনা।" সকলে এই কথাটী বেশ বিশ্বাস করিতে পারিল না। ইত্যবসরে ভদ্রলোকটী আসিয়া উঁহাদের নিকটবর্ত্তী হইলে বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন— "বাবা! এই শালখানি কত টাকায় কেনা?"

ভদ্র। বাবা! এটা আমার পিতার গায়ে ছিল, বড়ই ভারী এবং ব্যবহার করিয়াও তত সুখ নাই; সেকেলে জিনিষ তেমন পছন্দসই হয় না।

বৃদ্ধা। "বাবা! জুতা যোড়াটী কি—"বলিতে না বলিতেই ভদ্রলোকটী বিশেষ উৎসাহ ভরে বলিয়া উঠিলেন,—"দেখুন দেখি মহাশয়! এই জুতা যোড়াটী আজ তিন দিন হইল আমি পাঁচ টাকা দাম দিয়া কিনিয়াছি, বেশ ভাল হয় নাই কি?" বলিয়া পুনর্ব্বার শালখানি দিয়া জুতা যোড়াটী পরিষ্কার করতঃ আগ্রহ সহকারে উঁহাদিগকে দেখাইতে লাগিলেন। উঁহারাও সকলেই একবাক্যে যখন জুতা যোড়াটীর প্রশংসা করিতে লাগিলেন, তখন ভদ্রলোকটী সন্তুষ্টচিত্তে চলিয়া গেলেন। অন্যান্য লোক বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন,— "আপনি এ ঘটনার মর্ম্ম কিরূপে বুঝিলেন?"

বৃদ্ধ বলিলেন—"বাবা! পৈতৃক সম্পত্তির মর্য্যাদা বা মূল্য কেহ ধারণা করিতে পারে কি? ও যে কৃপালব্ধ! স্বোপার্জ্জিত পাঁচ টাকা কৃপালব্ধ দুইশত টাকারও সমান নহে।" বাস্তবিক তাই—পরম দয়াল নিতাই গৌরাঙ্গ কৃপা করিয়া আমাদিগকে যে অমূল্য সম্পত্তি প্রদান করিলেন, আমরা তাহার কিছুই মর্য্যাদা বুঝিতে পারিতেছি না; কিন্তু আমরা সাধন করিয়া যদি ইহার শতাংশের একাংশও লাভ করিতাম, তবে আমাদের মর্য্যাদা জ্ঞান হইত। এই ভাবে নানা কথোপকথন হইতেছে, এই সময় একজন আসিয়া মহাপ্রসাদ পাইবার জন্য

বলায় রাজর্ষি বাহাদুরের আগ্রহে সকলে মহাপ্রসাদ পাইতে বসিলেন। যেন আনন্দের ফোয়ারা ছুটিতেছে। বাবাজী মহাশয় যখন যে কার্য্য করিতেছেন, তাহাতেই আনন্দ। যথাসময়ে মহাপ্রসাদ সেবা হইয়া গেল। পূর্ব্ব হইতেই রাজর্ষি বাহাদুর সগণে বাবাজী মহাশয়ের থাকিবার জন্য শ্রীকুণ্ডস্থ শ্রীমদনমোহনের মন্দির নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন; সুতরাং সেইস্থানে গিয়াই বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

পরদিবস প্রাতে উঠিয়াই সঙ্গিগণকে আদেশ করিলেন যে—"প্রত্যহ তিনবার শ্রীকুণ্ডে স্নান এবং নাম করিয়া উভয় কুণ্ড পরিক্রমা ও শ্রীকুণ্ডবাসী বৈষ্ণবমণ্ডলীর ভজনকুটীরের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে।" বেলা অনুমান সাড়ে সাতটা, এই সময় রাজর্ষি বাহাদুর কয়েক মূর্ত্তি বৈষ্ণব সঙ্গে করিয়া বাবাজী মহাশয়ের নিকট আগমন করিলেন। দর্শনমাত্র পরস্পর দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক উপবেশন করতঃ রাজর্ষি বাহাদুর করযোড়ে বলিলেন—"আমার একটী বিনীত প্রার্থনা যে, যে কয়েকদিন রাধারাণী আপনাকে শ্রীকুণ্ডে রাখিবেন, প্রত্যহ শ্রীবিনোদবিহারী জীউর মহাপ্রসাদ অঙ্গীকার করিতে হইবে।" বাবাজী মহাশয় বলিলেন "ভাই! নিতাইচাঁদ যাহা করাইবেন, তাহাই হইবে; সেজন্য ভাবিবার কোনই প্রয়োজন নাই। তোমার বিনোদিনী আমাকে প্রসাদ দিবেন ত?"

রাজর্ষি। বিনোদ বিনোদিনী ত আপনার। আপনি ইচ্ছা করিলে তবে আমরা পাইতে পারি। আর একটী নিবেদন—আজ **গোষ্ঠাষ্টমী**, বিনোদ বিনোদিনী গোষ্ঠবিহারে বাহির হইবেন। তাঁহাদের ইচ্ছা যে, আপনি সদলে তাঁহাদের সঙ্গে গমন করেন।

বাবাজী। তোমার বিনোদ বিনোদিনী কি আমাকে সঙ্গে লইবেন?

রাজর্ষি। যদি সঙ্গে নাই লইবেন, তবে এখানে আনিলেন কেন? যখন আনিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই সঙ্গে যাইতে হইবে।

বাবাজী মহাশয় মৃদু হাসিয়া বলিলেন;—জানি না, তোমার বিনোদ বিনোদিনীর কি ইচ্ছা। কখন বাহির হইবেন?"

রাজর্ষি। বাহির হইতে প্রায় দশটা হইবে।

বাবাজী। দশটার সময় কি ভাবে বাহির করা হয়?

রাজর্ষি। আজ্ঞে! গোষ্ঠবিহার অনুযায়ীই বাহির হইয়া থাকেন। তবে কিঞ্চিৎ বেলা অধিক হইয়া যায়, কি করি ভোগরাগ হইতে একটু বিলম্ব হইয়া পড়ে।

শুনিয়া বাবাজী মহাশয় বিশেষ আনন্দিত হইলেন। রাজর্ষি কিছুক্ষণ পরে ইঁহার আদেশক্রমে চলিয়া গেলেন। ইনি স্নান আহ্নিকাদি শেষ করিতে না করিতে আবার বিনোদের বাড়ী হইতে ডাক আসিল। কাজে কাজেই সঙ্গিগণ সঙ্গে বিনোদের বাড়ী গমন করিলেন। শ্রীযুক্ত রামহরিদাস বাবাজী, শ্রীমাধবদাস বাবাজী, শ্রীহরিচরণদাস বাবাজী, শ্রীরসিকদাস বাবাজী এবং ভুঁয়া মহাশয়* প্রভৃতি মহাত্মাগণের সঙ্গে রাজর্ষি বাহাদুর বাবাজী মহাশয়ের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। ইনি যেমন আসিয়া উপস্থিত হইলেন, অমনি সকলে উঠিয়া বিশেষ আগ্রহ সহকারে বিনোদের মন্দিরের পার্শ্ববর্ত্তী একটী ঘরে লইয়া গেলেন, সকলেই লীলা স্মরণ-পরায়ণ; সুতরাং বসিয়াই ইষ্টগোষ্ঠী আরম্ভ হইল। সকলেই বাবাজী মহাশয়কে বলিতে বলিলে ইনি হৃষ্টচিত্তে বলিলেন, "আমি কি লীলাকথার কিছু জানি? তবে তোমাদের আশীর্ব্বাদে মা যোগমায়া পৌর্ণমাসী দেবী যদি কৃপা করিয়া কিছু বলান" বলিয়া আবিষ্টভাবে বিনোদ বিনোদিনীর মধ্যাহ্ন-লীলা বিলাসের কথা বলিতে লাগিলেন। সকলেই বিভোর ভাবে শুনিতেছেন, কাহারই বাহ্যস্মৃতি নাই। সকলেই যেন কি এক অভিনব আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন। যদিও সর্ব্বদাই উঁহাদের এইরূপ ইষ্টগোষ্ঠী হইয়া থাকে, কিন্তু

---

* ইনি একজন বিশেষ বিজ্ঞ, স্মরণ-মননিষ্ঠ, সুরসিক ভক্ত; প্রায় সর্ব্বদাই রাজর্ষির নিকট থাকিয়া ইষ্টগোষ্ঠী করেন।

আজ যেন কেমন একপ্রকার নূতন রকমের আনন্দানুভব করিতেছেন। আজ যেন রসের ভিয়ানটী একটু নূতন ধরণের হইয়াছে; তাই বোধ হয় বেশী মিষ্টি লাগিতেছে। সকলেই নীরব, একমাত্র বাবাজী মহাশয় ধীরে ধীরে এক একটী কথা বলিতেছেন, আর যেন আনন্দের উৎস ছুটিতেছে। হঠাৎ একটী লোক আসিয়া বলিল—"আজ্ঞে! বিনোদের ভোগ হইয়া গিয়াছে, মহাপ্রসাদ উপস্থিত।" শুনিবামাত্র সকলের চমক ভাঙ্গিল। রাজর্ষি বলিলেন—"দাদা! বিনোদের ভোগ সরিয়াছে, মহাপ্রসাদ দর্শনে যাইতে হইবে।" বাবাজী মহাশয় আনন্দে বগল বাজাইয়া বলিলেন—"ভাই! আমি ত এই চাই, ও বিষয়ে আমি খুব প্রস্তুত। এই মহাপ্রসাদের লোভেই ত পুরীধামে পড়িয়া থাকি এবং শ্রীজগন্নাথের সঙ্গে ঠাকুরদাদা সম্বন্ধ পাতাইয়াছি। আবার ভাল ভাল মহাপ্রসাদের লোভেই ত এখানে আসিয়াছি।" চল ভাই! আমি অগ্রগামী।" শ্রীরামহরিদাস বাবাজী মহাশয় হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"বাবা! আমি ত তোমারই কাকা! এ বিষয়ে আমি তোমা অপেক্ষা অনেক উচ্চপদ লাভ করিয়াছি।" ইত্যাদি নানারূপ রসকল্লোলে আপ্লুত হইয়া মহাপ্রসাদ সেবায় বসিলেন। কিন্তু হরিচরণ দাস বাবাজী মহাশয় অন্যের অলক্ষিত ভাবে চলিয়া গেলেন। পঙ্গতের মধ্যে উঁহাকে দেখিতে না পাইয়া বাবাজী মহাশয় রাজর্ষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বনমালী! হরিচরণ দাসজীকে দেখিতেছি না কেন?" তখন রাজর্ষি বলিলেন—"আজ্ঞে! তাঁহার মাধুকরীর সময় হইয়াছে, তাই চলিয়া গিয়াছেন।"

বাবাজী। তা বেশ! বেশ! নিজের যাজন ছাড়া কোনমতেই উচিত নয়।

-বলিয়া নানারূপ সুললিত রস সিদ্ধান্তের সহিত আনন্দে মহাপ্রসাদ পাইতে লাগিলেন। সকলেই আনন্দে বিভোর, সকলেরই লক্ষ্য বাবাজী মহাশয়ের প্রতি। বাবাজী মহাশয়ের এক একটী ব্যবহার যেন সকলের মন প্রাণ মাতাইয়া দিতেছে। সকলেই পরমানন্দে মহাপ্রসাদ সেবা করিতেছেন। এমন সময় একটী

মাধুকরীর পাত্র হাতে হরিচরণ দাস বাবাজী মহাশয় "জয় রাধে" বলিয়া বিনোদের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। "জয় রাধে" ধ্বনি শুনিবামাত্র একজন পূজারী শশব্যস্তে একদোনা ডাল, একদোনা তরকারী এবং কিছু রুটী আনিয়া উঁহার মাধুকরীর পাত্রে দিবামাত্র তিনি চলিয়া গেলেন। ইঁহারা যে স্থানে মহাপ্রসাদ পাইতে বসিয়াছেন, সেই স্থান হইতে এসমস্ত ব্যাপার দর্শন করা যায়। বাবাজী মহাশয় এই ব্যাপারটী দর্শনে কেন যেন একটু মুচকি হাসিয়া নীরবে মহাপ্রসাদ পাইতে লাগিলেন। যথাসময়ে মহাপ্রসাদ পাওয়া শেষ হইল। সকলে আচমন করিয়া পূর্ব্ববৎ বিনোদের পার্শ্বস্থ সেই ঘরে গিয়া ইষ্টগোষ্ঠী করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে একজন আসিয়া রাজর্ষিকে বলিল—"আজ্ঞে! বিনোদের বাহ্রির হইবার সময় হইয়াছে।" শুনিবামাত্র ইনি শৌচক্রিয়াদি করিতে গমন করিলেন। রাজর্ষিও বিনোদের বেশ-ভুষাদির ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। যথাসময়ে বিনোদ বিনোদিনী একখানি সুসজ্জিত চতুর্দ্দোলায় আরোহন করিলেন। বাবাজী মহাশয় ভাবগদগদকণ্ঠে পদ ধরিলেন—

রাধাশ্যাম একাসনে সেজেছে ভাল।
রাই আমাদের হেমবরণী, শ্যাম চিকণকাল॥
গলে বনফুলের মালা, বামে চূড়াটী হেলা,
যুগলরূপে নিকুঞ্জবন করেছে আলো॥
(দোঁহার) বাহুতে বাহু, যেন চাঁদেতে রাহু,
চূড়া বেণী ঘেরাঘেরি করি দাঁড়ালো॥
করে মোহন মুরলী, রাই অঙ্গে পড়িছে ঢলি,
ভানুদুলালী মোদের নন্দদুলাল॥
(যত) সখী মঞ্জরী, তারা যায় সারি সারি,
মাঝে কিশোর কিশোরী, কি শোভা হ'ল॥

(যত) বরজ বালা, রূপে দশদিক হইল আলা,
যুগল চাঁদে ঘেরি চাঁদের মালা চলিল॥
(নাচে) ময়ূর ময়ূরী, গায় শুক আর সারী,
যুগল রূপ হেরি সবার নয়ন জুড়াল॥
(তোরা) আয় সহচরী, হেরবি যদি যুগলমাধুরী,
মেঘ বিজুরী জড়াজড়ি কি শোভা হ'ল॥

সকলেই আনন্দে মাতোয়ারা। বিনোদ বিনোদিনী চতুর্দ্দোলায় চড়িয়া আনন্দে হেলিয়া দুলিয়া যাইতেছেন। চারিদিক লোকে লোকারণ্য, কে কাহাকে দেখে? একে ত বিনোদ বিনোদিনীর ভুবনমোহন রূপ, তাহাতে আবার বাবাজী মহাশয়ের মনপ্রাণমাতান সুমধুর কীর্ত্তন; কাজেই লোকসকল আকৃষ্ট হইয়া সংকীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে; এইরূপ পরমানন্দে সকলে বিনোদ বিনোদনীকে সঙ্গে লইয়া কুসুম সরোবর এবং শ্রীরাধাকুণ্ডের মধ্যবর্ত্তী একটী উদ্যানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সিংহাসন সহ বিনোদ বিনোদিনীকে একটী বেদীর উপর উপবেশন করান হইল। মরি মরি কি মাধুরী! পূর্ব্ব হইতে সকলেই অবগত আছেন যে, গোষ্ঠাষ্টমী উপলক্ষে বিনোদ বিনোদিনী এই উদ্যানে শুভাগমন করিবেন; সুতরাং ব্রজবাসী-বাসিনীগণ বহুদূর হইতে আসিয়া সমবেত হইয়াছেন ও হইতেছেন। এদিকে রাখালগণ বহু গাভী বৎস প্রভৃতি আনিয়া সম্মুখস্থ খোলা উদ্যানে চরাইতে লাগিল। শ্রীমূর্ত্তিরূপে নিত্য লীলা যে প্রকট, আজ যেন তাহা সর্ব্বসাধারণের প্রত্যক্ষীভূত হইতে লাগিল। বাবাজী মহাশয় যাহাই দেখিতেছেন, তাহাতেই যেন প্রকটরূপে নিত্যলীলা অনুভব করতঃ ভাব-সাগরে নিমগ্ন হইয়া যাইতেছেন। এইরূপে বহুক্ষণ কীর্ত্তনাদির পর কীর্ত্তন সমাপ্তি করতঃ একটী বটবৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া ঠিক প্রকটরূপে নানারকম লীলাখেলা অনুভব করিতেছেন, আর আনন্দ-সাগরে ডুবিয়া যাইতেছেন। এদিকে ব্রজবাসী

রাসধারিগণ নানারূপ লীলা অনুকরণ করিয়া সারঙ্গ বাজাইয়া নৃত্য এবং গান করিতে লাগিলেন। যেন আনন্দের পাথার বহিয়া যাইতে লাগিল। সকলেই হাবুডুবু খাইতেছেন। আনন্দের সময়টা যেন অতি অল্প সময়ের মধ্যেই কাটিয়া যায়। যথাসময়ে বিনোদের ভোগরাগ হইয়া গেলে উপস্থিত গো সকলের সেবা হইতে লাগিল। উপস্থিত সকলেই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিলেন। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যাদেবী বিনোদবিহারী জীউর দর্শনে আগমন করিতে লাগিলেন দেখিয়া রাজর্ষি বাহাদুর বাবাজী মহাশয়ের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন—"দাদা! এইবার বিনোদ বিনোদিনীকে লইয়া মন্দিরে গমন করা যাউক?" ইনি যেন কেমন আনমনা ছিলেন; রাজর্ষি বাহাদুরের কথায় একটু চমকিত হইয়া বলিলেন—"বেশ ভাই চল!" বলিয়া নৃত্য করিতে করিতে বিনোদ বিনোদিনীকে সঙ্গে লইয়া গমন করিলেন। যাইবার সময় অপেক্ষা ফিরিবার সময়ের কীর্ত্তনে দ্বিগুণতর আনন্দ হইতে লাগিল। শ্রীরামহরিদাস বাবাজী মহাশয় প্রভৃতি সকলেই বিভোর ভাবে নৃত্য করিতে করিতে কীর্ত্তনের সঙ্গে গমন করিতেছেন। সকলেই যেন আত্মহারা উন্মত্তপ্রায় নৃত্যকীর্ত্তন করিতেছেন। কে কাহাকে স্থির করে বা শুশ্রূষা করে? কিছু দূর যাইতে না যাইতে রাজর্ষি বাহাদুরের শ্যালক গোপালবাবু নৃত্য করিতে করিতে ভাবভরে অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। বহু চেষ্টা করিয়াও যখন কেহই তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিতে পারিলেন না, তখন একজন গিয়া এই কথা বাবাজী মহাশয়কে বলিলেই ইনি নৃত্য করিতে করিতে উঁহার নিকটস্থ হইয়া মস্তকে হস্তার্পণ পূর্ব্বক কর্ণে মন্ত্র প্রদান করিবামাত্র একটী হুঙ্কার ধ্বনি করতঃ ভাবভরে টলিতে টলিতে পূর্ব্ববৎ কীর্ত্তনের মধ্যে গিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। নিতাই চাঁদের কৃপার বলিহারি যাই! কোন্ সূত্রে কাহাকে কৃপা করেন, কে বুঝিবে? গোপাল বাবু যে বাবাজী মহাশয়ের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট বা বিশেষ শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন

বলিয়া বোধ হইত না। কীর্ত্তনাদিতে ইতিপূর্ব্বে কেহ তাঁহাকে এরূপ নৃত্যাদি করিতে দেখিয়াছে কি না সন্দেহ; আজ তাঁহার ভাবগতিক, এমন কি আকৃতি পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। ভাবে ঢর ঢর মুখখানি হইতে যেন জ্যোতিঃ বাহির হইতেছে। ধন্য মহৎকৃপার প্রভাব! বিনোদ বিনোদিনী যথাসময়ে শ্রীমন্দিরে আসিয়া শুভ বিজয় করিলেন। নিয়মিত সেবাদি চলিতে লাগিল। সমাগত ভক্তবৃন্দ কিছুক্ষণ আনন্দ-কীর্ত্তন করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। রাজর্ষি বাহাদুর প্রভৃতি কাহারই ইচ্ছা নয় যে একতিলের জন্যও বাবাজী মহাশয়ের মধুময় সঙ্গ ছাড়া হন; কিন্তু কি করিবেন? কার্য্যানুরোধে অনিচ্ছন্নপি পরস্পর পরস্পরকে ছাড়িতে বাধ্য হইতেছেন। কিছুক্ষণ বিনোদের মন্দিরের পার্শ্ববর্ত্তী ঘরখানিতে বসিয়া নানারূপ তত্ত্ব আলোচনার পর সকলে মহাপ্রসাদ পাইয়া নিজ নিজ স্থানে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। এইরূপে বিনোদ-বিহারীর শ্রীরাধাকুণ্ডের বাড়ীতে বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে নিত্য নূতন আনন্দ উপভোগ হইতে লাগিল।

*একদিন রাত্রে সকলে একত্রিত ভাবে মহাপ্রসাদ পাইতে বসিয়া নানারূপ তত্ত্বকথা প্রসঙ্গ হইতেছে। শ্রীবাবাজী মহাশয় বললেন যে,—"প্রেমদাতা পরমদয়াল **শ্রীমন্মহাপ্রভু** আপামর সর্ব্বসাধারণ কলির জীবগণকে অবিচারে প্রেমদান করিয়াছেন। কলির জীব কেহই প্রেম পাইতে বাকী নাই। তবে কেহ বা সেই প্রেম বিতরণের কথা বা আনন্দ অনুভব করিয়াছেন, কেহ বা করে নাই,—কালে করিবে। কিন্তু পাইতে কেহই বাকী নাই। কারণ **শ্রীগৌরসুন্দর** যাহা বিতরণ করিবার জন্য এই ঘোর কলিযুগে স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহা যদি অবিচারে সর্ব্বসাধারণকে দান করা না হয়, তবে তাঁহার কার্য্য অপূর্ণ

* এই ঘটনাটী সম্বন্ধে শ্রীবৃন্দাবনবাসী ভক্তপ্রবর কামিনীকুমার ঘোষ মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন তাহাই এইস্থানে উদ্ধৃত হইল।

থাকে। তাহা কি সম্ভব? এইটী যে কেবল আমাদেরই মুখের কথা তাহা নহে; শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ অনর্পিত শ্লোকে এই অবিচারে প্রেমদানেরই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন।" আমি কথাটী বেশ ধারণা করিতে না পারিয়া বলিলাম— "বাবাজী মহাশয়! আমার মত হতভাগ্য জনের ত প্রেমলাভের কোনও চিহ্ন দৃষ্ট হইতেছে না! কারণ যদি প্রেম লাভই হইত, তবে কি আর বিষয়বাসনা থাকিত? কিংবা স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া সংসারকার্য্যে ব্যতিব্যস্ত থাকা সম্ভব হইত?" এই কথা শুনিবামাত্রই বাবাজী মহাশয় বলিয়া উঠিলেন—"কামিনী বাবু! তুমিও নিশ্চয় প্রেম লাভ করিয়াছ, তোমার স্ত্রী-পুত্রাদিও সকলেই প্রেম লাভ করিয়াছে। নিজের অবস্থাটী বেশ একটু ভাবিয়া দেখ দেখি; তুমি রাজার চাকরি করিতেছ ও স্ত্রী-পুত্রাদি লইয়া সংসার করিতেছ; অথচ তোমার মনের আশা যে, তুমি শ্রীরাধারাণীর দাসী হইয়া তাঁহারই প্রেমসেবা করিবে। এ কাহার কৃপা? কাহার কৃপায় তোমার হৃদয়ে এইরূপ বাসনার উদয় হইয়াছে? তোমার অর্থ ও স্ত্রী-পুত্রাদির প্রয়োজন ছিল, করুণাময় প্রভু তাহাদিয়াই তোমাকে শ্রীধাম বৃন্দাবনে পাঠাইয়াছেন; উপরন্তু সত্যের আশ্রয় দিয়াছেন। নতুবা তোমার কি সাধ্য আছে যে, তুমি বৃন্দাবনে বাস কর? যাঁহারা দাতা, তাঁহারা দান করিয়াই সুখী হন। যাঁহারা দানবীর, তাঁহারা কি বিচার করিয়া দান করেন বা করিলে সুখী হইতে পারেন? **শ্রীমন্মহাপ্রভু দাতাশিরোমণি;** তুমি অযোগ্য হইলে কি হয়? তিনি অবিচারে তাঁহার নিজ ভাণ্ডারের সর্ব্বোৎকৃষ্ট যে বস্তু প্রেমধন, তাহাই সকলকে বিতরণ করিতেছেন; যোগ্যাযোগ্য বিচার করিয়া তোমাকে প্রেম দিলে বা বঞ্চিত করিলে তাঁহার সুখ হইবে কেন বল দেখি? যেমন কোনও একজন বড় লোকের বাড়ী একদিন মহামহোৎসব হইতেছে, বহু কাঙ্গালী-ভোজন হইতেছে। অপর্য্যাপ্ত রসগোল্লা বিতরণ হইতেছে। একজন কাঙ্গালীর পাতায় অপরিমিত রসগোল্লা দেখিয়া একজন বলিল—"কিরে

বেটা! দিনান্তে দুই পয়সার মুড়ী মুড়কী জোটে না, আজ যে বড় রসগোল্লা খাচ্ছিস?" কাঙ্গালীটী বলিল—"বাবা! আমি ত দুইটী মুড়ী মুড়কীর আশাতেই এস্থলে আসিয়াছিলাম; কিন্তু আসিয়া দেখি—এখানে আর মুড়ী মুড়কী নাই, কেবল রসগোল্লা, সেও যে যত খাইতে পারে; তাই রসগোল্লা খাইতেছি।" দাতায় দান করিলে অধমেও পায়। তাই বলি ভাই! তিনি সকলকেই প্রেম দান করিয়াছেন।" এই সময় শ্রীকুণ্ডবাসী শ্রীরসিকদাস বাবাজী মহাশয় বলিলেন—"তা আপনি যাহাই বলুন না কেন, এই পরম দয়াল অবতারে আমি কিন্তু একবিন্দু প্রেমও লাভ করি নাই।" কথাটী শুনিবামাত্র বাবাজী মহাশয় যেন কেমন একপ্রকার হইয়া গেলেন। ঠিক বালকের ন্যায় ব্যাকুলভাবে গদগদকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—"বাবা! কলিতে ঘোর পাষণ্ডগণ প্রেম পাইল! আপনি কেন পাইলেন না? তাহা হইলে ত মহাপ্রভুর **বিশ্বম্ভর** নামে কলঙ্ক করা হয়! আমি এই মহাপ্রসাদ হাতে করিয়া বলিতেছি, আপনি নিশ্চয়ই প্রেম লাভ করিয়াছেন।" বলিতে না বলিতেই শ্রীরসিকদাস বাবাজী মহাশয়ের দুইটী চোখ হইতে অবিরতভাবে জলধারা পতিত হইতে লাগিল—অশ্রু, কম্প, পুলকাদি সাত্ত্বিক বিকারগণ সমকালীন উঁহার দেহে প্রকাশ পাইতে লাগিল। বাবাজী মহাশয় কিন্তু তখনও বলিতেছেন—"আপনি বলুন, প্রেমদাতার কৃপায় প্রেম লাভ করিয়াছেন?" রসিকদাস বাবাজী মহাশয় কেমন একপ্রকার হইয়া গিয়া বলিলেন—"আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি প্রেম লাভ করিয়াছি।" কথাটী শুনিয়া বাবাজী মহাশয় যেন একটু সুস্থ হইলেন। আহা মরি কি অপূর্ব্ব ভাব! জগতের কোন একটী প্রাণীকে মহাপ্রভুর প্রেম দিতে বাকী আছে, ইহা যেন বাবাজী মহাশয়ের প্রাণে সহ্য হইতেছে না। একজন বলিলেন—"দেখুন! গোস্বামিপাদগণ কত না বৈরাগ্য করিয়াছেন। হরিদাস ঠাকুর তিন লক্ষ নাম করিতেন। আমরা ত কিছুই করিতে পারিতেছি না, আমাদের কি গতি হইবে?"

বাবাজী। বাবা! আমাদের কি সাধ্য যে, আমরা সাধন ভজন করি? আমরা অন্নগতপ্রাণ। কঠোর বৈরাগ্য করা ত দূরের কথা, কোনও কারণে একদিন আহারাদির কোনরূপ ক্রটি বা অভাব হইলে আর আমাদের ভজন সাধনের কথা মনে থাকে না। দেহ এতই সুকুমার যে শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, আতপ সহ্য করা ত দূরের কথা; কোন কারণ বশতঃ একদিন রজে শয়ন করিতে মনে প্রবৃত্তি হয় না বা করিলেও সহ্য হইতে চায় না। এই ত আমাদের মানসিক বা শারীরিক অবস্থা। ইহাতে আমরা কি করিতে পারি? আমাদিগকে সর্ব্ববিষয়ে অসমর্থ জানিয়াই তাঁহারা আমাদের জন্য অত কঠোর বৈরাগ্য বা ভজন সাধন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সেই ভজন সাধন, বৈরাগ্য বা যাজন প্রভৃতি যে গ্রন্থে বর্ণিত আছে, সর্ব্বদার তরে তাহা পাঠ করা, সেই সমস্ত লইয়া পরস্পর আলোচনা করা এবং তাঁহাদের রূপ, গুণ, লীলাদি স্মরণ করাই আমাদের নিত্যকর্ত্তব্য ও সাধন। বস্তুতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্য পরিকরবর্গ যাহাকে সাধন বলিয়া আচরণ করেন, আমাদের পক্ষে সেইটাই সাধ্য। সুতরাং সাধ্য সাধন এক বস্তু। নিত্যসিদ্ধ পরিকরগণ প্রেমের কার্য্যরূপে যে সব রূপ, গুণ, লীলাদি, দর্শন, শ্রবণ কীর্ত্তনাদি করিয়া থাকেন, প্রেমভরে পরিপ্লুত হইয়া যে সব পরিচর্য্যাদি করিয়া থাকেন, সাধকগণ সেই সমস্ত নিত্যসিদ্ধ পরিকরগণের রূপ, গুণ, লীলাদি শ্রবণ, কীর্ত্তন পরস্পর কথোপকথন দ্বারা আস্বাদন করিবেন। সেই সমস্তই সাধকের পক্ষে সাধ্য অর্থাৎ প্রাপ্তির বিষয়। এইটী যাহার হৃদয়ে দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে তিনি ইহা ছাড়া অন্য কোন যাজনে কালক্ষেপণ করিতে পারেন না এবং পরিণামে সর্ব্বোপাধি-বিনির্মুক্ত হওয়ায় "অন্যত্র না চলে মন, যেন দরিদ্রের ধন" এইরূপ অনন্যচেষ্টা হইয়া থাকেন। যে নিতাই গৌরাঙ্গ নাম লইতে প্রেম হয়, অশ্রুধারা বহে, অপরাধের বিচার পর্য্যন্ত করেন না, অপরাধীর অপরাধ দেখাইয়া দিয়া এবং অপরাধ মোচনের উপায় বলিয়া ও

করিয়া বা করাইয়া দিয়া প্রেম দান করেন, সেই পরমদয়াল প্রেমদাতার শিরোমণি **শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গের** এই অপার করুণারাশি যাহার হৃদয়ে স্ফুরিত হইয়াছে, তাহার কি আর সাধন ভজন কিছু বাকী থাকতে পারে? না অন্য কোনওরূপ ভজন সাধনের জন্য তাহার মনে উৎকণ্ঠা জন্মিতে পারে?

একজন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আচ্ছা, শ্রীশ্রীনিতাইগৌরাঙ্গদেবই যদি প্রেম দান করিলেন, তাহা হইলে আর শ্রীগুরুপদাশ্রয়ের আবশ্যকতা কি?

বাবাজী মহাশয় বলিলেন—"বাবা শ্রীশ্রীনিতাইগৌর যে প্রেমদান করিয়াছেন বা করিতেছেন বা করিবেন, শ্রীগুরুদেব না হইলে এ সমস্ত কথা তোমাকে স্মরণ করাইয়া দিবে কে? অমূল্য সম্পত্তি প্রেমধন তোমাকে প্রদান করিয়া রাখিয়াছেন; কিন্তু তুমি তাহা না জানিয়া অশেষ দুঃখ পাইতেছিলে, **শ্রীগুরুদেব** কৃপা করিয়া মহাপ্রভুর সেই অপরিসীম করুণার কথা স্মরণ করাইয়া তোমাকে সেই অমূল্য সম্পত্তির অধিকারী করিয়া দিতেছেন। বল দেখি, যিনি তোমার চির-দরিদ্রতা দূর করতঃ পরমধনে ধনী করাইলেন বা সেই সমস্ত ধনের কথা তোমাকে শ্রবণ করাইয়া দিলেন, তাঁহার ন্যায় পরম বান্ধব তোমার আর কে আছে? এ কার্য্যটী যে যাহার তাহার দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে, তাহা মনে করিও না। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন "শ্রীগুরুরূপে কৃষ্ণরূপা করেন ভক্তগণে।" শ্রীগুরু-কৃপা ব্যতীত কাহারও কোন ভক্ত্যঙ্গ সাধনে সামর্থ্য হইতে পারে না। সাক্ষাৎ ভগবৎকৃপা বা ভগবদ্ভক্তকৃপা ভিন্ন নামাভাস পর্য্যন্ত স্ফূর্ত্তি হইবে না। তাই বলিয়াছেন,—"গুরুরূপে কৃষ্ণকৃপা তত্ত্বের অবধি।" যিনি যতই কৃপা করুন না কেন, যতক্ষণ শ্রীগুরুদেব করুণা করিয়া হৃদয়খানি গ্রহণের উপযোগী করিয়া না দিলেন, ততক্ষণ একবিন্দুও স্ফুরিত হইবে না। এমন কি, "কৃষ্ণে রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন" ইত্যাদি ভাবে নানারূপ ভগবৎপ্রসঙ্গের সহিত পরমানন্দে মহাপ্রসাদ পাওয়া হইতে লাগিল। শ্রীযুক্ত

রামহরিদাস বাবাজী, শ্রীমাধবদাস বাবাজী এবং রাজর্ষি বাহাদুর প্রভৃতি প্রায় সর্ব্বদার তরেই শ্রীযুক্ত বাবাজী মহাশয়ের সহিত কোন না কোন ভগবৎপ্রসঙ্গ লইয়া পরমানন্দে দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

* মহানুভবগণের কোনও ব্যবহার আপাততঃ ত্রুটি বলিয়া অনুভূত হইলেও, তাহা অপর কোনও মহাত্মার উৎকর্ষ অথবা অন্বয় ব্যতিরেকে সর্ব্বথা জগতের কল্যাণের জন্যই হইয়া থাকে। ইহাতে যাঁহারা একের পক্ষপাতী হইয়া অন্যের প্রতি দোষ-দৃষ্টি করেন তাঁহারা ভক্তিপথ হইতে বহু দূরে অবস্থিত। তাঁহাদের পক্ষেই "একে বন্দে আরে নিন্দে সেই যায় নাশ" এই মহাজন বাক্য প্রয়োগ হইয়া থাকে। এক দিবস রাজর্ষি বাহাদুর শ্রীযুক্ত বাবাজী মহাশয়কে কোনও মহানুভবের সহিত সাক্ষাৎ করাইতে লইয়া গেলেন। ইঁহারা তথায় উপস্থিত হইবামাত্র উক্ত মহানুভব, বাবাজী মহাশয়কে দর্শন দেওয়া ত দূরে, ইঁহার সম্বন্ধে এতই বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে, ইঁহার সেস্থানে অবস্থান করা পর্য্যন্ত যেন তাঁহার অসহ্য হইতে লাগিল। অবশেষে রাজর্ষি বাহাদুরকে লইয়া অন্য স্থানে চলিয়া গেলেন। রাজর্ষি বাহাদুর স্বপ্নেও কাহারও নিকট হইতে এতাদৃশ ব্যবহার জীবনে কখনও প্রাপ্ত হন নাই। বিশেষতঃ যে স্থানে লইয়া গিয়াছেন সে স্থানে বিশেষ আনন্দ লাভ করিবেন বলিয়াই মনে আশা ছিল। ঘটনাক্রমে সম্পূর্ণ বিপরীত হইল। রাজর্ষি বাহাদুর বাহিরে প্রকাশ করিয়া কিছু বলিতে না পারিলেও উক্ত মহানুভবের এক একটী কথায় হৃদয়ে এতই ব্যথিত হইতেছিলেন যে, উঁহার তাৎকালিক অবস্থা দর্শনে মনে হইতেছিল যেন তিনি পৃথিবীকে প্রার্থনা করিতেছিলেন—"মা বসুন্ধরে! তুমি দ্বিধা বিদীর্ণা হও, আমি তোমার ক্রোড়ে প্রবেশ করিয়া এ অসহ্য বেদনা হইতে অব্যহতি লাভ করি।"

* এই ব্যাপারটীও শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার ঘোষ মহাশয়ের নিকট হইতে সংগৃহীত।

বাবাজী মহাশয় উক্ত মহানুভবের তাদৃশ আবেশ পরোক্ষেই অনুভব করতঃ তাঁহার শান্তির জন্য তথা হইতেই তাঁহাকে প্রণাম করতঃ স্থানান্তরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে রাজর্ষি বাহাদুরও ব্যথিত হৃদয়ে মহানুভবকে দণ্ডবৎ প্রণাম করতঃ যথাস্থানে বাবাজী মহাশয়ের সহিত মিলিত হইলে, ইনি উক্ত ঘটনার বিন্দুমাত্র প্রসঙ্গ না তুলিয়া ইঁহার স্বভাবসিদ্ধ প্রীতিময় সরল ব্যবহারে লীলাকথা বলিতে বলিতে স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাগমন করিলেন। রাজর্ষি বাহাদুরের নিজের সম্বন্ধে কেহ এ জাতীয় ব্যবহার করিলে তিনি তাহাতে বিন্দুমাত্রও দুঃখিত না হইয়া বরং সে ব্যক্তি মনে দুঃখ পাইয়াছে বলিয়া তাহার চিত্ত সমাধান করিতে যত্নবান্ হইতেন; কিন্তু এস্থলে যিনি জগতের আদর্শ, আবাল-বৃদ্ধ-যুবা, স্ত্রী, পুরুষ যাঁহাকে পরম আদরের বস্তু বলিয়া প্রীতি করে, আপামর সাধারণ জনগণ যাঁহাকে সম্মানের চোখে দেখে, আমি কি না তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া এতদূর অপমানিত করাইলাম! রাজর্ষি বাহাদুরের এ হৃদয়বেদনা কিছুতেই নিবৃত্তি হইতেছে না। বাবাজী মহাশয়ের মুখপানে তাকাইলেই যেন আরও দ্বিগুণতর বৃদ্ধি পাইতেছে। আমরা জীবনে উঁহাকে এরূপ ক্ষোভিত আর কখনও দেখিয়াছি কি না সন্দেহ। বাবাজী মহাশয় অনেকরূপ রসকৌতুক দ্বারা উঁহার মানসিক তাপ প্রশমিত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টিত হইয়াও অকৃতকার্য্য হইলেন। অবশেষে একদিন কুসুম সরোবরের কোনও একটী স্থানে ইনি রাজর্ষির হাতখানি ধরিয়া গদগদ কণ্ঠে বলিলেন— "ভাই বনমালী! তুমি যদি একদিনের জন্যও আমাকে কিঞ্চিৎ প্রীতি করিয়া থাক, তবে আজ আমাকে একটী ভিক্ষা দিতে হইবে। সেদিন (পূর্ব্বোক্ত মহানুভবের নাম করিয়া বলিলেন) তাঁহার ব্যবহারে তুমি মনে যে ব্যথা পাইয়াছ, আমাকে সেইটী ভিক্ষা দিয়া আজ হইতে তুমি আমার নিকট প্রতিশ্রুত হও যে, এই সম্বন্ধ লইয়া আর তাঁহার উপর কখনও কোনরূপ ক্ষোভ আনিতে

পারিবে না। আর একটী অনুরোধ এই যে, ঐ ঘটনাটী আর কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না। প্রকাশিত ঘটনাও যাহাতে প্রচ্ছন্ন থাকে, তাহার চেষ্টা করিবে।" বাবাজী মহাশয়ের তাৎকালিক প্রীতি ও আকৃতি দর্শনে রাজর্ষি বাহাদুর একেবারে বিস্মিত ভাবে সাশ্রুগদগদকণ্ঠে বলিলেন—"দাদা! আপনি যাহা আদেশ করিবেন, তাহা অবশ্য পালনীয়। আপনি কৃপাশক্তি সঞ্চার করুন, যাহাতে মানসিক মলিনতা দূর হইয়া স্বচ্ছভাব ধারণ করে।" বাস্তবিক এই ঘটনাটী সেই দিন হইতে রাজর্ষি ঘৃণাক্ষরেও আর কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই। এমন কি, অতঃপর উক্ত মহানুভবের সহিত ব্যবহারে ঈদৃশ ঘটনা যে কখনও ঘটিয়াছিল, তাহাও উঁহার স্মৃতিপথে থাকা বুঝিতে পারা যায় নাই। অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত! যিনি এতদূর অনাদর করিলেন, তাঁহার সম্বন্ধে নিজের কোনও প্রকার দোষদৃষ্টি আসা ত দূরে থাকুক, যাহাতে অন্য কাহারও চিত্তে না আসে সেই জন্য ব্যাকুল। "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।।" আমরা এই শ্লোকের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত পাইলাম। শ্রীভগবান্ নিজের অপকর্ষ করিয়াও ভক্তমহিমা বাড়াইয়া থাকেন। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে নিজ প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াও ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিলেন। রাসে অন্তর্হিত হইয়া নিজ মস্তকে কলঙ্কের ডালি গ্রহণ করিয়াও শ্রীগোপিকা-সভায় ও জগতে শ্রীবৃষভানুকুলচন্দ্রমার প্রেমমহিমা প্রকটিত করিলেন। শ্রীভগবানের গুণ তদ্ভক্তে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। মঙ্গলময় প্রভু উক্ত মহানুভব দ্বারা যদি এইরূপ ঘটনা সংঘটিত না করাইতেন, তবে আমরা এইরূপ উদারতা, অদোষদর্শিতা বা তৃণাদপি শ্লোকের দৃষ্টান্তটী কিরূপে প্রত্যক্ষ অনুভব করিতাম? মহাত্মা রাজর্ষি বাহাদুরের মন হইতে এই কালিমাটী একেবারে বিধৌত হইয়া গিয়াছিল। মাদৃশ ব্যক্তির হৃদয়ে কিন্তু অবিতর্কিত ভাবে ঘটনাক্রমে কখনও কখনও যেন একটু উঁকি ঝুঁকি মারিত। আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে না পারিলেও,

অন্তর্য্যামী বাবাজী মহাশয় কিন্তু লক্ষ্য করিয়াছেন। কোনও কার্য্যবশতঃ আমাকে কয়েকদিনের জন্য একটু স্থানান্তরিত হইতে হইবে। কিন্তু বাবাজী মহাশয়ের মধুময় সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া যাওয়াটা যেন আমার পক্ষে বড়ই কষ্টকর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। অনন্যোপায় হইয়া ইঁহার নিকট বিদায় লইতে গেলে ইনি পরম প্রীতিসহকারে আমাকে বলিতে লাগিলেন—"ভাই কামিনী! আমরা সম্পূর্ণ পরাধীন, আমাদের কাহারও উপর কোনও দোষদৃষ্টি করিবার অবকাশ কোথায়? জীব নিত্য কৃষ্ণদাস। নানারূপ কার্য্য গতিকে তাহা ভুলিয়া গিয়া মায়ার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া আমি ধনী, মানী, কুলীন, বিদ্বান্ বা ভক্ত এইরূপ অভিমানী হইয়া থাকে। এই উপাধির হাত হইতে এড়াইবার ত আমাদের সাধ্য নাই। যদি কোনও রাগানুগ সাধক আমাদিগকে আদর না করেন বা তীব্র ব্যবহার করেন, তথাপি আমাদের জানিতে হইবে যে, তিনি সর্ব্বদাই আমাদের হিতকর বন্ধু। কি করিবেন? কতকগুলি উপাধি আসিয়া পতিত হইয়াছে, তাই আমাদের সহিত মিশিতে পারিতেছেন না। পরস্পরের উপাধি না থাকিলে আর মিলিবার বাধা থাকে কি? "আমি রাধারাণীর দাসী" মনে যদি সে বিশ্বাস দৃঢ় না হইয়া থাকে, তবে কাতর প্রাণে **নিতাই গৌরাঙ্গের** নিকট প্রার্থনা কর যে "প্রভু! আমি কলিহত জীব, মায়ামুগ্ধ হইয়া ভবার্ণবে পতিত হইয়াছি। তোমরা করুণাময়, করুণা করিয়া এই বন্ধন হইতে মুক্ত কর। প্রভু হে! তোমাদের কৃপাব্যতীত আর ত মাদৃশ পাষাণ্ডের উদ্ধারের উপায় নাই, ইত্যাদি, ভাবিয়া হা নিতাই গৌর বলিয়া কাঁদ। হৃদয় নির্ম্মল ও স্বচ্ছ হইবে।" বাবাজী মহাশয়ের কথায় প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। হৃদয়ের মধ্যে লুক্কায়িত অতি সুক্ষ্মভাবে পূর্ব্বোক্ত মহানুভবের ব্যবহারজনিত যে কালিমা ছিল, তাহা দূর হইয়া স্বচ্ছ ও আনন্দময় হইল। ভাবিলাম, মহাপুরুষদিগের কি অভাবনীয় শক্তির প্রভাব! ইচ্ছামাত্র আমাদের ন্যায় ঘোর পাষণ্ডের মন নির্ম্মল করিয়া দিতে পারেন।

বাবাজী মহাশয়ের হৃদয়খানি যেন সর্ব্বদার তরে তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সামান্য সামান্য ঘটনায় বা হাস-পরিহাসচ্ছলেও কখনও ইঁহার ব্যবহারগত বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না।

একদিন কোনস্থানে আমি বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে মহাপ্রসাদ পাইতে বলিয়াছি। সেদিন মুগের ডাল ঠাকুরের ভোগ দেওয়া হইয়াছে। আমি গোবিন্দদাদাকে বলিলাম—"এসময় টক দিয়া মটর ডাল করিলে ভাল হয়।" শুনিয়া বাবাজী মহাশয় ইঁহার স্বভাবসিদ্ধ রসপরিপূর্ণ সখ্যব্যবহারে মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"ভাই কামিনী! আজ তোমার একটী মহাপরাধ হইল।" হাস পরিহাসের সহিত মহাপ্রসাদ পাওয়া হইতেছে, এ সময় কোন অপরাধ হইবার সম্ভাবনা নাই, হৃদয় এ ধারণা থাকিলেও বাবাজী মহাশয়ের কথা শুনিয়া একটু বিস্মিতের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আজ্ঞে! কেন, কি অপরাধ হইল?" বাবাজী মহাশয় বলিলেন—"দেখ, কৃপা করিয়া যিনি আগমন করিবেন, তাঁহাকে আদর অভ্যর্থনা করাই সর্ব্বদা কর্ত্তব্য;তাহা না করিয়া তাঁহার সমক্ষে অন্যের প্রশংসা করিলে তাঁহার অমর্য্যাদা করা হইল না কি? অতএব আজ তোমার এই মুগের ডাল মহাপ্রসাদের নিকট অপরাধ হইয়াছে।" একথাটী সামান্য এবং পরিহাসের সহিত কথিত হইলেও অপূর্ব্ব শিক্ষাপূর্ণ। বাস্তবিকই যথালাভে সন্তুষ্ট হইতে না পারিলে শান্তি লাভ করা বড়ই সুকঠিন। বাবাজী মহাশয় আপামর সাধারণকে একমাত্র রাগানুগা ভক্তিই উপদেশ করিয়াছেন! এইটী বিধি ভক্তি, এইটী রাগানুগা-ভক্তি ইত্যাদি শাস্ত্রীয় ভাষায় না বলিলেও, ইঁহার স্বভাবসিদ্ধ সরলভাষায় সাধারণকে যাহা উপদেশ করেন তাহাই রাগানুগা। শ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ এবং শ্রীরাধাগোবিন্দের চরণে প্রীতিপূর্ব্বক প্রাণ বাঁধিয়া দেওয়াই ইঁহার জীবনের প্রধান ব্রত। ইনি বলেন—'ইষ্টে প্রীতি না থকিলে যত্নাগ্রহ জন্মে না; যত্নাগ্রহ না থকিলে কিরূপে সেবায় রুচি হইবে? 'সেবা

সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি। তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যং ব্রতলোকানুসারতঃ।' প্রবর্ত্ত, সাধক সিদ্ধ যে অবস্থার সাধকই হউক না কেন, সেবাইসকলের মুখ্য প্রয়োজন, সেবাই প্রপ্তির বিষয়। অবশ্য অবস্থাবিভেদে সাধনার পার্থক্য আছে একথা সত্য, কিন্তু প্রপ্তির বিষয় এক।"

একদিন বাবাজী মহাশয় শ্রীরামহরিদাস বাবাজী, শ্রীমাধবদাস বাবাজী মহাশয় প্রভৃতি অনেক মহাত্মাগণের সহিত অপরাহ্ন সময় শ্রীকুণ্ডের তীরে বসিয়া নানারকম প্রসঙ্গ হইতেছে, এই সময় শ্রীরসিক দাস বাবাজী মহাশয় ইঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আচ্ছা, ভক্তি শব্দের প্রকৃত অর্থ কি?"

বাবাজী। ভক্তি ও ভজন এই দুইটী শব্দ একই ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। ঐ দুইটী শব্দেরই প্রকৃত মর্ম্মার্থ সেবা।

রসিক। তাহা হইলে ভক্তি যাজন করা কথাটী কি প্রকার হইল?

বাবাজী। ভক্তি যাজন শব্দে ভক্ত্যঙ্গ যাজন বুঝিতে হইবে; অর্থাৎ তদানুকুল্য আচরণ ও প্রতিকূল্য বর্জন। যেমন গোস্বামিপাদগণ বলিয়াছেন—"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোথ ভজনক্তিয়া"। ভজন ক্রিয়া অর্থাৎ সেবানুকুল কার্য্যের আচরণ।

রসিক। আদৌ শ্রদ্ধা বলিলেন, জীবের এই শ্রদ্ধা কিরূপে হইবে?

বাবাজী। এতমাত্র কৃপা ভিন্ন আর অন্য উপায় নাই।

রসিক। কৃপা পাইবারই বা উপায় কি?

বাবাজী। কৃপা পাইবার উপায় কৃপা। মোট কথা—কৃপাময়ের নিজের ইচ্ছা।

রসিক। লীলার প্রকট এবং অপ্রকট এই দুইটী বিভাগ দেখা যায়। এই কৃপা প্রকট অবস্থায় জীবে বেশী সঞ্চার হয়, না অপ্রকটে অধিক সঞ্চার হয়?

বাবাজী প্রকটে অনেকটা যোগ্যাযোগ্যত্বের বিচার থাকে। এমন কি অনেক

সময় কালাকালেরও বিচার দেখা যায়; কিন্তু অপ্রকটে অযাচিত কৃপা। কালাকাল যোগ্যাযোগ্যত্বের কিছু মাত্র বিচার নাই। অবিচারে অহৈতুকী কৃপা।

রসিক। ইহার প্রণাম কি?

বাবাজী। আচ্ছা, এই রাধাকুণ্ড নিত্য বলিয়া আপনার বিশ্বাস হয় ত?

রসিক। হ্যাঁ, তা হয় বই কি!

বাবাজী। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকট লীলায় যে কুণ্ডতীরে শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবলমাত্র জীবন রক্ষার উপযোগী তিন পল মাঠা পান করিয়া গোপীভাবে শ্রীরাধারাণীর কৃপা লাভের জন্য ছাপ্পান্নদণ্ড স্মরণ করিতেন, আজ মহাপ্রভুর অপ্রকট লীলায় সেই কুণ্ডতীরে বনমালী রায় স্ত্রীপুত্র এবং বিষয় বৈভবলইয়া পরমানন্দে বাস করিতেছেন এবং উঁহাদের সকলেরই হৃদয়ে গোপীভাবে কৃষ্ণ প্রাপ্তি করিয়া যুগল সেবার অভিলাষ জাগিয়া উঠিয়াছে। তবেই ভাবিয়া দেখুন দেখি, অপ্রকটে কৃপা বেশী হইল না কি? এইরূপ প্রত্যেক বিষয়ে প্রত্যেক জীবের প্রতি অপ্রকটে কৃপার আধিক্য দেখা যায়। একজন ভিখারী একমুষ্টি ভিক্ষার জন্য দ্বারে দ্বারে বেড়াইয়া কত না লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছে! কিন্তু কেহ যদি তাহাকে বলে—ওহে ভিখারী তুমি যদি দ্বারকায় যাইতে স্বীকৃত হও, তবে তোমার অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ হইবে।” অমনি সে নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিবে—“মহাশয়! অমন আশীর্ব্বাদ করিবেন না। দিনান্তে এক মুষ্টি খাইয়া থাকি সেও ভাল, তবু যেন বৃষভানুপুরে আহিরী-গোপতনয়া হইয়া শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা প্রাপ্ত হই।” বলুন দেখি বাবা! প্রকটে নিতাই গৌরাঙ্গ আপামর সাধারণ জীবের নিকট হইতে ও জাতীয় সুখ প্রাপ্তি হইয়াছিলেন কি? বোধ হয় এক অংশও নয়। যদি বলেন প্রকটে তিনি ভক্ত, অভক্ত, পাষণ্ড, ভণ্ড, দুরাচার, অবিশ্বাসী প্রভৃতি সর্ব্বনয়নগোচর হইতেন সত্য; কিন্তু প্রত্যক্ষরূপে কয়জন

ধারণা করিতে পারিত? তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন—"দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ। উলুকে না দেখে যৈছে সূর্য্যের কিরণ।" যাহারা প্রকটে দেখিয়াও বঞ্চিত, তাহারাই অপ্রকটে অনুতাপানলে হৃদয়ের আবর্জ্জনা দগ্ধ করতঃ বিশুদ্ধ হৃদয়ে কৃপালাভ করিয়া লীলামাধুর্য্য আস্বাদনে পরিতৃপ্ত হইতেছে। সুতরাং প্রকট হইতে অপ্রকটে কৃপা অনেক বেশী।

রসিক। অনেক দিন হইতে আমার মনে একটী সন্দেহ উপস্থিত হইয়া রহিয়াছে; এখন যদি সময় হয় বলি।

বাবাজী। বেশ সময় আছে, বলুন। কোনও কথা হৃদয়ে উদয় হইলে, তাহা না বলা পর্য্যন্ত হৃদয় প্রসন্ন হয় না। শাস্ত্রে বলিয়াছেন—"হ্যনুক্তমনুতাপং জনয়তি"।

রসিক। আচ্ছা, কৃষ্ণবিরহে শ্রীমতীর দশদশা হইয়াছিল। যথা—চিন্তাত্র জাগরোদ্বেগস্তানবং মলিনাঙ্গতা। প্রলাপো ব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যুর্দ্দশা দশ॥ এই দশ অবস্থায় শ্রীমতী কিংবা অন্যান্য গোপীগণের যে সমস্ত অবস্থা শাস্ত্রে প্রকাশ আছে বা মহাজনদিগের মুখে শুনিয়াছি তাহাতে কখনও অস্থিসন্ধি শ্লথ হইয়া দীর্ঘাকার ধারণ অথবা হস্তপদ সঙ্কুচিত হইয়া কুর্ম্মাকৃতি ধারণ ত কখনও শুনা যায় নাই। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীরাধিকার ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার করতঃ শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণের পর গম্ভীরায় অবস্থানকালে শ্রীরাধিকার ভাবে বিভাবিত হইয়া কৃষ্ণবিরহে ঐ সস্ত ভাব কোথা হইতে পাইলেন? মূল শ্রীমতীর দেহে যে সব ভাব প্রকাশিত হয় নাই, রাধাভাবাবিষ্ট শ্রীগৌরাঙ্গের দেহে সেই সব ভাব কিরূপে সম্ভবে, আমি বুঝিতে পারিতেছি না।

বাবাজী। শ্রীরাধাগোবিন্দলীলা হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলায় যে অনেক জিনিষের ভাবান্তর বা অবস্থান্তর দেখা যায়, উঁহার কারণ সম্বন্ধে সকলেরই

যে একমত, তাহা নহে। মোট কথা—রসের পাত্র অনুসারে যেমন আস্বাদনের তারতম্য হইয়া থাকে, সেইরূপ আস্বাদকের তারতম্যে আবার ভাবের তারতম্য হইয়া থাকে। শ্রীবৃন্দাবনলীলারসের বিষয় বা আস্বাদ্য নাগরেন্দ্র-চূড়ামণি ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, রসের আশ্রয় বা আস্বাদিকা সমর্থার শিরোমণি মহাভাব স্বরূপিণীশ্রীমতী রাধিকা। শ্রীনবদ্বীপলীলার রসের বিষয় বা আস্বাদ্য শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, রসের আশ্রয় বা আস্বাদকও শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। তাহা হইলেই ভাবিয়া দেখা উচিত—সমর্থার শিরোমণি শ্রীমতী যে ভাব হৃদয়ে ধারণ করিতে বা সঙ্গোপন করিতে সমর্থা হইবেন, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সেইরূপ পারেন কি? কোনমতেই সম্ভবপর নহে। ভাব প্রেম হৃদয়ের জিনিষ, তাহা কখনও বাহিরে প্রকাশ পায় না। বাহিরে প্রকাশমান অশ্রু-কম্পাদিকে শাস্ত্রে ভাবের বিকার বলিয়াছেন। ভাব বা প্রেমের বেগ যতই হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিবে, ততই তাহার মাধুর্য্যাধিক্য হইবে। যদিও কৃষ্ণচন্দ্র নিজ মাধুর্য্য আস্বাদনের লোভে মাদনাখ্য মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীমতী রাধিকার ভাব ও কান্তি গ্রহণ করিয়া অবতীর্ণ হইলেন, তথাপি শ্রীমতীর সমর্থাশক্তি বা তদ্যোগ্য হৃদয় ত আর গ্রহণ করিতে পারেন নাই! তাই সময় সময় দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন—"বহু চেষ্টা করি মুঞিঁ নারি আস্বাদিতে"; অর্থাৎ যে জিনিষ কৃষ্ণচন্দ্র নিজে বহু চেষ্টা করিয়াও আস্বাদন করিতে সমর্থ হন নাই, শ্রীমতী অতি অনায়াসে তাহা উপভোগ করিয়া স্বেচ্ছামত অপরকে বিতরণ করিয়া থাকেন। একদিন কৌতুহল-পরবশ হইয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গোপিকামণ্ডলীর মধ্য হইতে লুক্কায়িত হইলে গোপীগণ ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। যখন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কিছুতেই আর প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারিলেন না, তখন যোগমায়া দেবীকে স্মরণ করিলে, তাঁহার বিভুত্ব শক্তি প্রভাবে ইঁহার দেহে চতুর্ভুজত্ব প্রকাশ পাইল। অব্যবহিত পরেই গোপীগন আসিয়া চতুর্ভুজ মূর্ত্তির দর্শন পাইবামাত্র দণ্ডবৎ প্রণতি পূর্ব্বক দ্বিভুজ মুরলীধারী নব কৈশোর

নটবরবপু শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনে অহৈতুকী প্রীতি কামনা করতঃ প্রস্থান করিলেন।

এদিকে কৃষ্ণ-বিরহ-বিধুরা প্রেমময়ী শ্রীমতী রাধিকা ব্যথিতহৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করিতেছেন। কৃষ্ণচন্দ্র দূর হইতে শ্রীমতীকে অবলোকন করতঃ বহু চেষ্টা করিয়াও চতুর্ভুজমূর্ত্তি রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না। শ্রীমতীর শক্তিপ্রভাবে অনিচ্ছন্নপি তাঁহাকে বিশুদ্ধ মাধুর্য্যময়ী দ্বিভুজ মুরলীধর মূর্ত্তি ধারণ করিতে হইল।

রসিক। আপনি বলিলেন—"শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলায় শ্রীকৃষ্ণই আস্বাদ্য এবং শ্রীকৃষ্ণই আস্বাদক, আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কারণ, শ্রীরাধিকার ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার করিয়া যখন শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হইলেন, তখন আবার কৃষ্ণ রহিলেন কোথায়?

বাবাজী। শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার করিয়াছেন অর্থাৎ শ্রীরাধিকার অঙ্গকান্তিদ্বারা নিজ কান্তিকে আচ্ছাদন করিয়াছেন; কিন্তু কাল এবং গৌর দুইটী রঙ্গে মিলিত হইয়া একটা নূতন রং হয় নাই। তাই আচার্য্যগণবলিয়াছেন—"রাধাকৃষ্ণ- প্রণয়-বকৃতি-হর্লাদিনীশক্তিরস্মাদেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ। চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং রাধাভাব-দ্যুতি-সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্।।" দ্যুতিসুবলিত অর্থাৎ যেমন কোন পিতল বা কাঠের মূর্ত্তি স্বর্ণের জলে ডুবাইয়া দিলে উপরে ঠিক সুবর্ণ বর্ণ হইয়া থাকে; কিন্তু ভিতরে তাহার নিজস্বরূপ পিতল বা কাষ্ঠ থাকে, তদ্রূপ রাধিকার অঙ্গকান্তির জলে কৃষ্ণকে ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ভিতরে স্বরূপটী কৃষ্ণই আছে।

রসিক। বেশ কথা। তাহা হইলে যাহারা কৃষ্ণমন্ত্রে গৌরাঙ্গেরপূজা এবং কৃষ্ণের ধ্যানকেই গৌরাঙ্গের ধ্যান বলেন, তাঁহাদের কথাই ত ঠিক হইল।

বাবাজী। এটী সম্পূর্ণ ভুল কথা। লীলা এবং তত্ত্বে অনেক প্রভেদ! ধ্যান কখনও তত্ত্বগত হয় না; ধ্যান লীলাগত অর্থাৎ প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান রূপেরই ধ্যান, নাম বা মন্ত্র হইয়া থাকে। তত্ত্ব অপ্রত্যক্ষ, সুতরাং অদৃশ্য বস্তুর ধ্যান, নাম বা মন্ত্র দ্বারা দৃশ্য বস্তুর উপলব্ধি হয় না। যেমন শ্যামসুন্দর বলিয়া ডাকিলে, গৌরসুন্দর উত্তর দিতে পারেন না, সেইরূপ "ফুল্লেন্দীবরকান্তি" বলিলে "তপ্তকাঞ্চন কান্তিকে" বুঝাইতে পারে না। তত্ত্বগত অভেদ হইলেও লীলাগত পার্থক্য স্বীকার না করিলে লীলার মাধুর্য্য লোপ পাইয়া যায়। ভক্তচূড়ামণি হনুমান্ বলিয়াছিলেন—" শ্রীনাথে জানকীনাথে চাভেদঃ পরমাত্মনি। তথাপি মম সর্ব্বস্বং রামঃ কমললোচনঃ।" এ ভেদ না মানিলে ভক্তের রূপ-গুণ-নিষ্ঠাই থাকে না।

রসিক। উপাস্যনিষ্ঠা কাহাকে বলে?

বাবাজী। ভগবৎস্বরূপের যে রূপে যাহার চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছে, সেই রূপবিশিষ্ট স্বরূপে যে অনন্যভাবে চিত্তের একাগ্রতা রাখা, তাহাকেই ইষ্টনিষ্ঠা বা উপাস্যনিষ্ঠা বলে।

রসিক। কৃষ্ণে আকর্ষিত হওয়া ভাল, না তাঁহাকে আকর্ষণ করা ভাল?

বাবাজী। সিদ্ধদেহে না সাধকদেহে?

রসিক। সিদ্ধদেহে মধুর ভাবে।

বাবাজী। ভাব এবং রসের তারতম্যে সাধকের অবস্থার বিভেদ হইয়া থাকে। স্ত্রীদেহে যদি ধৈর্য্য না থাকে, তবে স্ত্রীদেহের মর্য্যাদা রহিল কোথায়? গরবিণী শ্রীরাধারাণীর দাসীদিগের গরবই হইল মূল সম্পত্তি। ললিতাদেবী শ্রীমতীকেবলিয়াছিলেন—"ধৈর্য্যং কুরু রাধে! সো কাহা যাওব, আপহি আয়ব, পুনহি লোটায়ব চরণে।" এই যাঁহার বাক্য, তাঁহার দাসীদিগের কৃষ্ণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার অন্বেষণ করিতে যাওয়া ভাল হয় কি? লম্পট পুরুষ স্ত্রীলোলুপ;

তাহাকে আর্কষণ করা স্ত্রীলোকের পক্ষে অতি সুগম। এ বিষয়ে প্রাকৃত রাজ্যের একটী দৃষ্টান্ত রহিয়াছে—বেশ্যাবৃত্তি। বেশ্যারা নিজদেহে নানারূপ বেশভূষা করিয়া দ্বিতল গৃহের বারান্দায় নিজ সম্মুখে একটী উজ্জ্বল আলো জ্বালিয়া এমন একটী স্থানে উপবেশন করিয়া থাকে যে, দূরবর্ত্তী লম্পট পুরুষগণ দর্শনমাত্র আকৃষ্ট এবং হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া গিয়া যথাসর্ব্বস্ব অর্পণ করে। সামান্য কামুক পুরুষ যদি এইরূপ আকৃষ্ট হইতে পারে, তবে মহাকামুক লম্পটচূড়ামণি কতদূর আকৃষ্ট হইবে একবার ভাবিয়া দেখা দরকার। হাবভাবকটাক্ষাদির প্রাচুর্য্য এবং রূপের উজ্জ্বলতা চাই। নবানুরাগের উজ্জ্বল আলো সম্মুখে জ্বালিয়া ভক্তিচন্দনে চর্চ্চিতা ও প্রেমফুলের মালায় বিভূষিতা হইয়া সাত্ত্বিক ভূষণের ধ্বনিতে গৃহভ্যন্তর মুখরিত করিতে পারিলে লম্পটচূড়ামণি কৃষ্ণ আপনিই বশতাপন্ন হইয়া যাইবে।

এইরূপে বহুক্ষণ নানাপ্রকার ভগবৎপ্রসঙ্গে পরমানন্দে কাটিয়া গেল। যথাসময়ে বিনোদের আরত্রিকের সময় হইলে সকলেই আরতি দর্শন করিতে গমন করিলেন। শ্রীরামহরিদাস বাবাজী মহাশয় এবং শ্রীমাধবদাস বাবাজী মহাশয় প্রায় সর্ব্বদাই বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে থাকিয়া ক্ষণে ক্ষণে নূতন নূতন লীলাকথা এবং নানা রসসিদ্ধান্ত লইয়া পরমানন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন।

একদিন বেলা অনুমান আটটার সময় শ্রীহরিচরণ দাস বাবাজী মহাশয় ইঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আচ্ছা! নিত্যানন্দ প্রভুর তত্ত্ব কি?

বাবাজী। নিত্যানন্দতত্ত্ব বলা বা বুঝা একমাত্র শ্রীগৌরাঙ্গ-করুণা-সাপেক্ষ—

নিত্যানন্দ প্রভুর গুণ মহিমা অপার।
সহস্র বদনে বর্ণি নাহি পায় পার॥
অতি গূঢ় নিত্যানন্দ এই অবতারে।
শ্রীচৈতন্য জানায় যারে, সে জানিতে পারে॥

কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের শ্লোকপঞ্চকে বহু প্রকারে ঐশ্বর্য্যতত্ত্ব বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা আর আমি বিশেষ ভাবে কি বলিব? মোট কথা—যেমন শ্রীরাধাগোবিন্দ মিলিত তনু শ্রীগৌরাঙ্গ, সেইরূপ অনঙ্গমঞ্জরী এবং বলরাম এই উভয় মিলিত তনু শ্রীনিত্যানন্দ। উভয়ের মিলন একটী অপূর্ব্ব রসের উৎপত্তি হইয়াছে অর্থাৎ শ্রীবলদেব বা শ্রীঅঙ্গন মঞ্জরীতে যে যে ভাব বা রস বর্ত্তমান ছিল, শ্রীনিত্যানন্দে সে সমস্ত ত আছেই; অধিকন্তু কয়েকটী অপূর্ব্ব রসমাধুর্য্য বেশী আছে। সে সব বর্ণনার অতীত, তবে হৃদয়ের বেগসম্বরণ করিতে না পরিয়া শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর দিঙ্মাত্র দেখাইয়াছেন—

নিতাই নাগর, রসের সাগর, সকল রসের গুরু।
যে যাহা চায়, তারে তাহা দেয়, বাঞ্ছাকল্পতরু॥
(নিতাই) রাধার সমান, কৃষ্ণে করে মান, সতত থাকয়ে সঙ্গে।
বসি থাকি থাকি, উঠয়ে চমকি, কৃষ্ণকথা রসরঙ্গে॥
বসি বাম পাশে, মৃদু মৃদু হাসে, প্রাণনাথ বলি ডাকে।
রাধার যেমন, মনের বাসনা, তেমতি করিয়া থাকে॥
সোনার কেতকী, দেখিতে মূরতি, সাধিতে মনের সাধা।
দাস বৃন্দাবন, করে নিবেদেন, দেখিতে নিতাই রাধা॥

মোট কথা—নিতাইচাঁদ শ্রীগৌরাঙ্গের মনের মরমী, দরদের দরদী, সুখের সুখী, দুঃখের দুঃখী, ভাবের ভাবুক, রসের রসিক এবং বাঞ্ছাপূর্ত্তিকারী অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গের যখন যখন যাহা প্রয়োজন নিতাই তাহা পূরণকারী।

নিতাইগতপ্রাণ বাবাজী মহাশয় আবিষ্টভাবে নিতাইগুণ বলিতেছেন, আর উপস্থিত বৈষ্ণবমণ্ডলীও বিভোরভাবে শুনিতেছেন। কাহারই বাহ্যস্মৃতি নাই। বহুক্ষণ এইরূপ ভাবে কাটিয়া গেল—কাহারই খেয়াল নাই। হঠাৎ বিনোদের মন্দির হইতে একজন লোক আসিয়া বলিল—“আজ্ঞে! বেলা একটা বাজিয়াছে।

অনেকক্ষণ বিনোদের ভোগ শেষ হইয়া গিয়াছে।” শুনিবামাত্র সকলের চমক ভাঙ্গিল। স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় সকলেই শশব্যস্তে স্নান-আহ্নিকাদির জন্য নিজ নিজ বাসায় প্রস্থান করিলেন। শ্রীরামহরিদাস বাবাজী মহাশয় এবং শ্রীমাধব দাস বাবাজী মহাশয় প্রভৃতি মহাত্মাগণের সঙ্গে বাবাজী মহাশয় শ্রীকুণ্ডে স্নান এবং আহ্নিকাদি শেষ করতঃ যথাসময়ে বিনোদের মহাপ্রসাদ পাইয়া মন্দিরের পার্শ্ববর্ত্তী ঘরে বিশ্রাম করিলেন।

একদিন প্রাতঃকালে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন পূর্ব্বক কাহাকেও কিছু বলা কহা নাই—একাকী বাহির হইয়া যাইতেছেন দেখিয়া গোবিন্দ দাদা, অটল-দাদা, উদ্ধারণ, ফণী প্রভৃতি কয়েকজন সঙ্গে চলিল। কোথায় যাইতেছেন বা কি উদ্দেশ্যে কাহার নিকট যাইতেছেন, কিছুই বলা কহা নাই—আপন মনেই যাইতেছেন। যাইতে যাইতে শ্রীমাধব দাস বাবাজী মহাশয়ের ভজনকুটীরের সম্মুখে গিয়া অটল দাদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“অটল! এইটী মাধবদাসজীর কুটীর নয়?”

অটল। আজ্ঞে হ্যাঁ।

অটল দাদা বলিতে না বলিতেই ইনি অতি সুপরিচিতের ন্যায় কুটীরের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীমাধবদাস বাবাজী মহাশয় তখন “অনঙ্গ সম্পুট” পাঠ করিতেছিলেন। ইঁহাকে দেখিবামাত্র আস্তেব্যস্তে পাঠ বন্ধ করিয়া ইঁহাকে কুটীরের মধ্যে লইয়া যাইবার জন্য মহা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলে, ইনি মৃদু হাসিয়া বলিলেন—“ভাই! তুমি পাঠ কর, আমি তোমার পাঠ শুনিবার জন্যই তাড়াতাড়ি আসিলাম;” আদেশ পাইয়া শ্রীমাধবদাস বাবাজী মহাশয় পূনর্ব্বার সেই “অনঙ্গসম্পুট” পাঠ আরম্ভ করিলেন। বাবাজী মহাশয় কুটীরের সম্মুখে বসিয়া পাঠ শুনিতেছেন, আর দুইটী চোখের জলে বুক ভাসিয়া যাইতেছে। এদিকে রাজর্ষি বাহাদুর, শ্রীরামহরিদাস বাবাজী, শ্রীহরিচরণদাস

বাবাজী, শ্রীরসিকদাস বাবাজী প্রভৃতি মহাত্মাগণ বাবাজী মহাশয়কে না পাইয়া অনুসন্ধান করিতে করিতে একে একে সকলেই আসিয়া শ্রীমাধবদাস বাবাজী মহাশয়ের কুটীর অলঙ্কৃত করিতে লাগিলেন। শ্রীমাধবদাস বাবাজী মহাশয় এক একটী কথা পাঠ করিতেছেন, আর ইনি অতি সরল ভাষায় তাহার ব্যাখ্যা করিয়া সকলের মনোরঞ্জন করিতেছেন। শ্রীমাধবদাস বাবাজী মহাশয়ের কুটীরে যেন আনন্দের পাথার বহিয়া যাইতেছে। সকলেই বিভোরভাবে বলিতেছেন—"অঙ্গনসম্পুট ত আমরা প্রায়ই পাঠ করিয়া বা শুনিয়া থাকি; কিন্তু এরূপ আনন্দ ত কখনও উপভোগ করি নাই এবং এরূপ রসাল ব্যাখ্যাও ত কখনও শুনি নাই! আহা মরি কি আনন্দ!" শ্রীমাধবদাস বাবাজী মহাশয়ের প্রাণে আনন্দ আর ধরে না। অপূর্ব্ব সম্মিলেন! যেন চাঁদের বাজার বসিয়াছে! শ্রীযুক্ত রামহরিদাস বাবাজী মহাশয় ভাবাবেশে নৃত্য করিতেছেন, আর একবার বাবাজী মহাশয়ের চিবুক ধরিয়া ভাবগদগদকণ্ঠে—"আরে আমার সোনার চাঁদ রে! বলিয়া নয়নজলে ভাসিয়া যাইতেছেন। এইরূপ পরমানন্দে বহুক্ষণ কাটিয়া গেলে শ্রীমাধবদাস বাবাজী মহাশয় পাঠ সমাপ্ত করিলেন; কিন্তু ইঁহার আবেশ ভাঙ্গিতেছে না বা সিদ্ধান্ত শেষ হইতেছে না। শ্রীমাধবদাস বাবাজী মহশয় ইত্যবসরে অটল দাদাকে একটী টাকা দিয়া অতি শ্রীঘ্র এক টাকার জিলাপী আনিতে বলিলে অটল দাদা তৎক্ষণাৎ জিলাপী আনিলে, শ্রীমাধবদাস বাবাজী মহাশয় **গিরিধারীকে** ভোগ দিয়া সকলের মধ্যস্থলে রাখিয়া দিলেন। জানি না তৎকালে সকলের মনে কি ভাবের উদয় হইল। মহাপ্রসাদ দর্শন মাত্রে ঠিক বালকের ন্যায় সকলেই কাড়াকাড়ি করিয়া খাইতে লাগিলেন। কেবল শ্রীহরিচরণদাস বাবাজী মহাশয় একটু গম্ভীর ভাবে ইতস্ততঃ করিতেছেন দেখিয়া, উদার স্বভাব বাবাজী মহাশয় খাইতে খাইতে উঁহার মুখে একখানি দিবামাত্র তিনিও আর একখানি তুলিয়া ইঁহার মুখে দিলেন। এইরূপ ভাবে

আনন্দ-সাগরের উত্তাল তরঙ্গ মধ্যে যাহাই পড়িতেছে, তাহাই যেন আনন্দময় হইয়া যাইতেছে। গুরুগৌরব বা মর্য্যাদাবিচার যেন প্রাণের ভয়ে কোন পর্ব্বতগহ্বরে পলাইয়া গিয়াছে। উপস্থিত দর্শকবৃন্দ সুমধুর আনন্দময় লীলা-খেলা দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া গেলেন। অনেকক্ষণ এইরূপ পরমানন্দে কাটিয়া গেল। এদিকে বেলা অতিরিক্ত হইতেছে দেখিয়া, সকলে ইঁহাকে সঙ্গে লইয়া বিনোদের মন্দিরে প্রত্যাগমন করিলেন।

একদিন অপরাহ্ন অনুমান চারিটার সময় বাবাজী মহাশয় কাহাকেও কিছু না বলিয়া একাকী **শ্যামকুণ্ডের** দিকে যাইতে লাগিলেন। অতি গম্ভীর ভাব—কোন কথাবার্ত্তা নাই। একা যাইতেছেন দেখিয়া গোবিন্দ দাদা ও ফণী এই দুইজন ইঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লগিলেন। ইনি ক্রমে শ্যামকুণ্ডের সম্মুখস্থ ধর্ম্মশালার নিকটবর্ত্তী রাস্তা দিয়া শ্রীরাধাকুণ্ডের পূর্ব্বদিকে যে কদম্ব বন আছে, তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। যাইতে যাইতে আপন মনে কি ভাবিতেছেন, ইনিই জানেন। এক একবার অর্দ্ধফুট স্বরে কি যে বলিতেছেন, তাহাও কিছু বুঝা যাইতেছে না। কিছু না বুঝিলেও গোবিন্দদাদা ও ফণী সঙ্গেই আছেন। ক্রমে একটু নির্জ্জন প্রদেশে একটী কাঁটা বনের মধ্যে গিয়া বসিলেন। এদিকে বিনোদের মন্দিরে ইঁহাকে না দেখিয়া শ্রীরামহরিদাস বাবাজী, শ্রীহরিচরণদাস বাবাজী, শ্রীমাধবদাস বাবাজী প্রভৃতি সকলে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া বাবাজী মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। ইনি কিন্তু নীরব হইয়া গম্ভীরভাবে বসিয়া আছেন। মনুষ্যের অগম্য ভয়ানক কণ্টকাকীর্ণ স্থানে ইনি বসিয়া আছেন দেখিয়া বিস্মতভাবে শ্রীহরিচরণদাস বাবাজী মহাশয় গোবিন্দদাদাকে বলিলেন—"তোমরা কিরূপ লোক! এই ভয়ানক কাঁটাবনের মধ্যে ইঁহাকে বসিতে দিয়াছ। কেন আর কি স্থান পাইলে না?

গোবিন্দ। আজ্ঞে! আমরা ত দিই নাই, ইনি নিজেই বসিয়াছেন।

হরি। তোমরা ভাল স্থান ব্যবস্থা করিলে ইনি কি আর এরূপ স্থানে বসিতেন?

গোবিন্দ। আমাদের এমন কি সাধ্য আছে যে, ইঁহার মতের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে পারি?

শ্রীহরিচরণ দাস বাবাজী মহাশয় তখন বাবাজী মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"পশু পক্ষী পর্য্যন্ত এই ঘোর বনের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না; আপনি কেমন করিয়া ঐ বনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন? আসুন, বাহিরে এই পরিস্কার স্থানে আসুন।

বাবাজী মহাশয় একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"ভয় কি! তোমাদের পায়ে ন্যাক্ড়ার জুতা আছে ত? আমার এই কঠিন পা, তাহাতে আবার দিবসে বিশেষ সর্ত্তপণে এইস্থানে আসিয়াছি বলিয়া তোমাদের প্রাণে ব্যথা লাগিল। আর দিন নাই, রাত নাই, সময় নাই, অসময় নাই অন্ধকারে পর্য্যন্ত কুসুমসুকোমলাঙ্গী প্রাণেশ্বরী কি প্রকারে এইস্থানে বিচরণ করেন? সেই সমস্ত লীলা-খেলার কথা একবার ভাবা উচিত নয় কি?" বলিতে বলিতে ইঁহার কণ্ঠ গদগদ হইল, চোখে জল আসিল, দেখিয়া সকলেই কেমন একপ্রকার হইয়া গেলেন। আবার ইনি গদগদকণ্ঠে বলিলেন—"ভাই! তোমরা কাতর প্রাণে যোগমায়া দেবীর নিকট প্রার্থনা কর, তিনি বৃন্দাদেবীকে ইঁহার একটা ব্যবস্থা করিতে না বলিলে কিরূপে চলিবে? ইত্যাদি নানারূপ কথাবার্ত্তার পর সকলের অনুরোধে অদূরে একটী কদম্ববৃক্ষের তলায় আসিয়া উপবেশন করিলেন। ইত্যবসরে কামিনীবাবুকে সঙ্গে করিয়া রাজর্ষি আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সকলকে যথাবিহিত দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক বলিলেন, "দাদা! আপনি আমাদিগকে না বলিয়া এই বনের মধ্যে আসিয়া লুকাইলেন যে!"

বাবাজী। ভাই! আমার কেমন এইরূপ একটী অভ্যাস।

হরি। আমাদের সঙ্গে এরূপ লুকোচুরি খেলিলে চলিবে কেন?

বাবাজী। না ভাই! লুকোচুরি নয়, কেমন চিরদিনের অভ্যাস তাই আসিলাম। তোমাদের সহিত লুকোচুরি করিব ত লীলায় প্রবেশ করিব কাহাদিগকে লইয়া? তুমি পরম পণ্ডিত, একটী শ্লোক শুনাও ত। হরিচরণদাস বাবাজী মহাশয় পাছে বাবাজী মহাশয়ের নিকট পাণ্ডিত্যাভিমান আসে এই ভাবিয়া কিছুতেই শ্লোক পাঠ করিতে সম্মত হইতেছেন না, ইনিও ছাড়িতেছেন না। অবশেষে বিশেষ দৈন্য সহকারে শ্রীপাদ রঘুনাথদাস গোস্বামিকৃত—"তবৈবাস্মি তবৈবাস্মি ন জীবামি ত্বয়া বিনা। ইতি বিজ্ঞায় দেবি ত্বং নয় মাং চরণান্তিকম্॥" এই শ্লোকটী পাঠ করিবামাত্র বাবাজী মহাশয় ভাবে গরগর হইয়া গেলেন। চোখের জলে বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। সাত্ত্বিক বিকারগণ আসিয়া সমকালীন ইঁহার দেহকে অধিকার করিয়া ফেলিল। কাতর প্রাণে গদগদকণ্ঠে প্রাণেশ্বরীর নিকট নানারূপ ভাবে মনের আবেগ জানাইতে লাগিলেন। উপস্থিত সকলেই ইঁহার অবস্থা দেখিয়া কেমন এক প্রকার গেলেন। ইনি আবিষ্টভাবে শ্রীদাস গোস্বামীর বৈরাগ্যের কথা, তাঁহার বাহ্যিক কঠোরতার কথা, অন্তঃকরণের রসাল ভাবেরকথা, শ্রীরাধারাণীর নিকট বিশুদ্ধ মার্ধুয্যময়ী সেবা প্রার্থনার কথা বলিতেছেন, আর আরক্তিম ঢুলু ঢুলু নয়ন হইতে অবিরত ধারে অশ্রু বিসর্জ্জন হইতেছে। এইরূপভাবে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইলে রাজর্ষি বাহাদুর সাশ্রুগদগদকণ্ঠে বলিলেন—"দাদা! ক্রমে বেলা অতিরিক্ত হইয়া যাইতেছে, এইবার বিনোদের মন্দিরে গমন করিলে ভাল হইত না কি?" ইনি গরগর ভাবে বলিলেন—"চল ভাই! আমার ত আর কোনই ভজন সাধন হইল না, তবে তোমাদের সঙ্গপ্রভাবে যদি কিছু হয়", বলিয়া ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলেন। সকলেই বেশ পরিষ্কার রাস্তা দিয়া যাইতেছেন; ইনি কিন্তু পূর্ব্ববৎ ভীষণ কাঁটার উপর দিয়া যাইতেছেন। সঙ্গিগণ সকলেরই

প্রাণে বিশেষ কষ্ট হইতেছে। রাজর্ষি বলিলেন—"দাদা! অত কাঁটার উপর দিয়া যাইতেছেন কেন? এই ভাল রাস্তা দিয়া আসুন?"

বাবাজী। ভাই! আমি এই দিনের বেলা অতি সন্তর্পণে সামান্য কাঁটার উপর দিয়া যাইতেছি দেখিয়া তোমাদের প্রাণ কাঁদিল, একবার প্রাণেশ্বরীর অবস্থাটী ভাবিয়া দেখ দেখি! তিনি অন্ধকারে রাত্রে ঝড় নাই, বৃষ্টি নাই, শীত নাই, গ্রীষ্ম নাই—অনবরত এই সমস্ত বনের মধ্য দিয়া গমনাগমন বা কত লীলাখেলা করিয়া থাকেন। সেজন্য কাঁদিয়া অধীর হইতেছ না কেন?

রসিকদাস বাবাজী মহাশয় বলিলেন—"আমরা স্মরণে প্যারীজীকে ভাল রাস্তায় না লইয়া কাঁটাপূর্ণ রাস্তায় লইয়া যাইব কেন?"

বাবাজী। বেশ কথা! তাহা হইলে আপনার কথায় বুঝা গেল যে, আমাদের নিজ নিজ বুদ্ধিবৃত্তি অনুসারে যেরূপ ভাবে লীলাটী গঠিত করিয়া দিব, শ্রীরাধাগোবিন্দ ঠিক সেইরূপ ভাবে লীলাখেলা করিতে বাধ্য হইবেন, তদতিরিক্ত কার্য্য করিতে পারিবেন না। করিলেও সেটা আমাদের গ্রাহ্য হইবে না। কেমন তাই নয়?

রসিক। সম্পূর্ণ সেরূপ না হইলেও কতকটা সেইরূপই ত বটে।

বাবাজী। তাহা হইলে "লীলাস্মরণ" কথাটী না বলিয়া উহাকে "লীলাগঠন" বলিলে ভাল হয় না কি? কারণ স্মরণ কথাটীর অর্থ হইতেছে পূর্ব্ব-আচরিত বিষয়ের অনুশীলন বা যথাযথরূপে হৃদয়ে অনুভব করা। নতুবা লীলার নিত্যত্বই থাকে না। আমার অনুভবে আসিল মধ্যাহ্ন সময় শ্রীকুণ্ড মিলন, আর একজন অনুভব করিলেন সায়াহ্নে, আবার কেহ বা বলিলেন রাত্রে। বলুন, শ্রীরাধাগোবিন্দ কাহার অনুরূপ কার্য্য করিবেন?

রসিক। না, আমি সে ভাবে বলি নাই। বাস্তবিকই নিত্যলীলা যেরূপ ভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে বা হইতেছে, যথাযথরূপে তাহার অনুশীলন করাই

স্মরণ। তবে এক একটী বিষয়ে আমাদের প্রাণে বড়ই আঘাত লাগে, সেই জন্য সেটাকে আমরা বাদ দিয়া অন্যরূপ করিয়া লই।

বাবাজী। আমি যে আপনাদের আচরণীয় কার্য্যে বাধা দিতেছি তাহা নহে, তবে বেশ ভালরূপ বুঝিতে না পারিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিতেছি। পদকর্ত্তা মহাজন বলিলেন—"তপনকে তাপে, তপত ভেল মহীতল, বালুকা দহন সমানে। চড়ই মনোরথে, ভাবিনী চলু পথে, তাপ তপন নাহি মানে॥" আমি যদি অগ্নিসম উত্তপ্ত বালুকায় নবনীত-কোমলাঙ্গী শ্রীমতীকে অভিসারে লইয়া না যাই, তবে কিরূপে গ্রীষ্মকালে শ্রীকুণ্ড মিলন করাইব? এইরূপ বর্ষাকালের অন্ধকার রাত্রে ঘোর বৃষ্টি, ব্রজসম মেঘ গর্জ্জন, সর্পাদি পরিব্যাপ্ত রাস্তা—এমন অবস্থায় অভিসারে যাওয়া হয় কিরূপে?

রসিক। আচ্ছা, শ্রীরাধাগোবিন্দলীলা শাস্ত্রাদিতে যেরূপে লিপিবদ্ধ আছে, বিধিবোধিতরূপে সেইটী ছাড়া অন্য কোনও রূপ কি আর হইতে পারে না?

বাবাজী। কেন পারিবে না? স্বাধীন লীলা খেলার কথা সম্পূর্ণ ভাবে বর্ণনা করা কাহারও সাধ্য হইতে পারে না। শাস্ত্র দিগ্‌দর্শন করাইতে পারেন বা করিয়াছেন। তবে প্রত্যক্ষানুভবকারী পূর্ব্বমহাজনবাক্য অবহেলা করা বোধ হয় উচিত নয়।

রসিক। তাহা হইলে ত রাগমার্গের ভজনও বিধির মধ্যে পরিগণিত হইয়া গেল।

বাবাজী। বিধিমার্গ ইহাকে বলে না। অনুরাগবিহীন প্রাণে, নরকাদি দুঃখের ভয়ে, স্বর্গাদি সুখ প্রাপ্তির আশায় শাস্ত্র-শাসনানুযায়ী যে ভগবত্‌ভজন তাহাকেই বিধি বলে। বৈধ ভক্ত, শাস্ত্র-যুক্তির বহির্ভুত কোনও কার্য্য করিতে পারেন না। আর রাগমার্গাবলম্বী সাধক সম্পূর্ণ তাহার বিপরীত—"শাস্ত্রে যুক্তি নাহি মানে দৃঢ় শ্রদ্ধাবান্।" ইহাদের পক্ষে অবশ্য পালনীয় ভাবে

শাস্ত্রশাসন থাকে না। মোট কথা অনুরাগযুক্ত হৃদয়ে লোভপরবশ হইয়া যে পথে চলায় নিজ ভজনের অনুকুল্য জন্মে, নির্ভীক সাধক সেই পথে নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে উপাসনা করিয়া থাকেন। রাগমার্গ-প্রকাশক শাস্ত্রকারগণ নিজ হৃদয়ের ভাবমাত্র প্রকাশ করিয়া থাকেন।

ইত্যাদি ভাবে ইষ্টগোষ্ঠী করিতে করিতে বিনোদের মন্দিরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। হরিচরণদাস বাবাজী প্রভৃতি ইঁহার মুখে যুক্তিপরিপূর্ণ সিদ্ধান্ত শুনিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন। এইরূপ পরমানন্দে সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল।

একদিন বেলা অনুমান দশটার সময় বৃন্দাবন হইতে প্রভুপাদ রঘুনন্দন গোস্বামী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীরামহরি দাস বাবাজী, শ্রীমাধবদাস বাবাজী প্রভৃতি মহাত্মাদিগের সঙ্গে বাবাজী মহাশয় বিনোদের মন্দিরের পার্শ্ববর্ত্তী ঘরে বসিয়া নানারূপ ভগবৎপ্রসঙ্গ করিতেছেন, প্রভুপাদ সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া একটু উগ্রভাবে বাবাজী মহাশয়কে বলিলেন—"কিহে! তুমি নাকি সমস্ত সাধন ভজন উড়াইয়া দিয়া একমাত্র কৃপাকেই বলবান্ করিতেছ বা সেই ভাবে সকলকে উপদেশ দিতেছে?"

বাবাজী। কে আপনাকে বলিল?

প্রভু। বৃন্দাবনে এই কথা লইয়া খুব সমালোচনা হইতেছিল; তাই শুনিয়া আমি তোমার সহিত ঝগড়া করিতে আসিলাম।

বাবাজী। আচ্ছা, আপনি একটু স্থির হউন, যাহা হয় ধীরে ধীরে শুনিবেন! প্রভুপাদ কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া বলিলেন—"বল ভাই! কৃপা আগে কি সাধন আগে?"

বাবাজী। আপনারা আচার্য্য, সিদ্ধান্ত আপনারা করিবেন, আমরা আমাদের হৃদয়ের সন্দেহগুলি আপনাদিগের চরণে নিবেদন করিব। আপনি বলুন— আগে কৃপা কি আগে সাধন?

প্রভু। সর্ব্বাগ্রে সাধন চাই, কৃপা ত আর গাছের ফল বা আকাশের জল নয় যে, সর্ব্বসাধারণেই যদৃচ্ছা ব্যবহার করিবে।

বাবাজী। আমার মনে একটী সন্দেহ হইল। আচ্ছা। যদি সাধন করিয়াই কৃপা প্রাপ্ত হইতে হয়, তবে আর তাঁহার মুখাপেক্ষী হইবার দরকার কি? আমি যে জাতীয় সাধন করিয়াছি, তদনুরূপ বস্তু দিতে ত তিনি বাধ্য; সেজন্য ভগবান্‌কে তোষামোদ করিবার প্রয়োজন কি? আর সেইরূপ কৃপার জন্য তাঁহাকে কৃপাময় নাম দিবারই বা কি আবশ্যক? বাল্মীকি মুনি ঠিক এইরূপ ভাবেই একটী কথা গঙ্গাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—"সুরধ্বনি মুনিকন্যে তারয়ে পুণ্যবন্তং, স তরতি নিজপুণ্যৈস্তত্র কিন্তে মহত্ত্বম্। যদি চ গতিবিহীনং তারয়েঃ পাপিনং মাং, তদপি তব মহত্ত্বং তন্মহত্ত্বং মহত্ত্বমং॥" সত্যই ত যাহার কেহ নাই বা কোন ভজন সাধন সম্বল নাই, তাহাকে যদি কৃপা করিতে পারেন তবেই ত জানিব কৃপাময়। আপনারা বলেন—আগে সাধন, তারপর কৃপা। আমি বলি—আগে কৃপা, তারপর সাধন। আমি ত সাধন উড়াইয়া দিই নাই। তবে আমরা কলিহত দুর্ব্বল জীব, অন্তঃকরণের বৃত্তি সর্ব্বদা নানা কামনা বাসনাযুক্ত ও আত্মসুখ-পরিপূর্ণ। সুতরাং পদ্মপত্রস্থ জলবিন্দুর ন্যায় মন সর্ব্বদা চঞ্চল। আমরা সাধন করিয়া তাঁহাকে পাইব, এ আশাই আমাদের পক্ষে অসম্ভব। বিশেষতঃ, আমরা সর্ব্বদাই সুখলিপ্সু; সুতরাং আপাততঃ মধুর ক্ষণিক সুখের লালসা পরিত্যাগ করিয়া, "যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেহমৃতোপমম্" এই সাত্ত্বিক নিত্য সুখের আশাই আমাদের মনে উদয় হইতে পারে না। তবে যে সাধন ভজনের ইচ্ছা বা কঠোর ব্রতাদি উদযাপন করিয়া ভগবৎ-সাক্ষাৎকার লাভের অভিলাষ এইটীও আমার মতে কৃপা ভিন্ন হইতে পারে না। আন্যান্য পন্থার উপাসকগণ যদি বা সাধন ভজনের কথা বলেন, সেও বরং কথঞ্চিৎ সম্ভব হইলেও হইতে পারে; কিন্তু এই ব্রজভাবের

উপাসনা একমাত্র কৃপা ভিন্ন কোনমতেই সম্ভব হইতে পারে না। এমন কি, আমার বিশ্বাস—কৃপা ভিন্ন ব্রজভাবের উপাসনা সাধারণের হৃদয়ে ধারণাই হইতে পারে না।

প্রভু। আচ্ছা, ছয় গোস্বামী এবং অন্যান্য গৌরপরিকরগণ যে নিজেরা কঠোর সাধন ভজন আচরণ দ্বারা জগৎকে শিক্ষা দিয়া গেলেন, তবে কি সে সমস্ত আমাদিগের আচরণীয় নহে?

বাবাজী। যাঁহারা নিত্য পরিকর, তাঁহাদের আচরণ আমাদের স্মরণের বিষয়। নিত্যসিদ্ধ পরিকরগণ কৃপাপরবশ হইয়া আমাদিগের শিক্ষার জন্য যে সমস্ত আচরণ করিয়াছেন, তাঁহাদের সেই অহৈতুকী কৃপাকে সম্মুখে রাখিয়া সেই সেই পথের অনুসরণ করা আমাদের কর্ত্তব্য। আমি আর অধিক কি বলিব? যদি কেহ অন্তর্নিবিষ্টভাবে একটু ভাবিয়া দেখেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই বুঝিবেন বা বলিবেন যে, একমাত্র কৃপাভিন্ন আমরা কোন কার্য্যই করিতে সমর্থ নহি।

এতক্ষণে প্রভুপাদের হৃদয় দ্রবিল, নয়নে জল আসিল, গদগদকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—"দেখ ভাই! আজ তোমার কথায় যথার্থই আমি ভাবিয়া দেখিলাম যে, একমাত্র কৃপাই সর্ব্বোপরি। নিতাই গৌরাঙ্গ যদি কৃপা করিয়া তাঁহাদিগকে ব্রহ্মাদির অগোচর নিগূঢ় ব্রজরস বুঝাইয়া না দিতেন, তাহা হইলে আমরা এ ধন কোথায় পাইতাম? এ ত সাধনের গম্য নহে। আজ আমি জানিলাম যে কৃপা ব্যতিরেকে যুগ যুগান্তর ভজন সাধন করিলেও ব্রজপ্রাপ্তি হওয়া অসম্ভব।"

অপর একজন বলিলেন—"আচ্ছা! আপনাদের কথাতে ত বুঝা গেল যে কৃপা ভিন্ন পাইবার আর উপায়ান্তর নাই; কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু রামানন্দ রায়কে যে বলিলেন—"সাধ্য বস্তু সাধন বিনা কেহ নাহি পায়। কৃপা করি কহ রায় পাবার উপায়?" এ কথার মীমাংসা কি?"

বাবাজী। সাধন যে একেবারে করিতে হইবে না, একথা ত আমরা বলি নাই। তবে আগে কৃপা হইলে তবে সাধনের কথা হৃদয়ে ধারণা হইবে। তাই মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"কৃপা করি কহ রায় পাবার উপায়" অর্থাৎ আগে কৃপা কর, তবে সাধন বস্তু হৃদয়ে স্ফুর্ত্তি পাইবে। আবার রায় রামানন্দ সাধনের কথা কি বলিলেন, একবার বুঝুন দেখি।

"রাধাকৃষ্ণ লীলা হয় আতি গূঢ়তর।
দাস্য বৎসল্যাদি ভাবের না হয় গোচর॥
সবে এক সখীগণের ইঁহা অধিকার।
সখী হইতে হয় এই লীলার বিস্তার॥
সখী বিনা এই লীলা পুষ্ট নাহি হয়।
সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয়॥
সখী বিনা এই লীলায় অন্যের নাহি গতি।
সখীভাবে যেই তাঁরে করে অনুগতি॥
রাধাকৃষ্ণের কুঞ্জসেবা সাধ্য সেই পায়।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায়॥'

বলত বাবা! একমাত্র কৃপা ভিন্ন সাধনের কোন অঙ্গটী কাহারও হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে বা হইয়াছে? প্রবর্ত্তক, সাধক, সিদ্ধ—সমস্ত অবস্থাতেই সাধন ভজন প্রয়োজনীয় এবং অবশ্য কর্ত্তব্য; কিন্তু প্রত্যেক অবস্থাতেই আনুগত্য চাই। আনুগত্য চাহিবার অর্থই—যিনি আমা হইতে অগ্রগামী, তাঁহার কৃপা গ্রহণ করা।

বাবাজী মহাশয় প্রেমাবেশে এইরূপ নানা সিদ্ধান্ত করিতেছেন; শুনিয়া সকলেই পরমানন্দ লাভ করিলেন।

একদিন প্রাতঃকালে বাসায় বসিয়া আছেন, এই সময় শ্রীরাধাকুণ্ডবাসী অদ্বিতীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দদাস বাবাজী মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাবাজী মহাশয় বা তৎকালে যে সমস্ত লোক সে স্থানে উপস্থিত ছিলেন, একমাত্র অটল দাদা ব্যতীত কেহই উঁহাকে চেনেন না। দূর হইতে পণ্ডিতজীকে দেখিবামাত্র অটল দাদা বলিলেন—"আজ্ঞে! এই যিনি আসিতেছেন, ইনি একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত, শ্রীজীব গোস্বামীর পরিবার, নাম শ্রীনিত্যানন্দ দাস পণ্ডিত।" শুনিবামাত্র বাবাজী মহাশয় শশব্যস্ত উঠিয়া পণ্ডিতজীকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্ব্বক বিশেষ সম্মানাগ্রহের সহিত আসনে উপবেশন করাইলেন। উপস্থিত সকলেই যথাযোগ্যভাবে পণ্ডিতজীকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। পণ্ডিতজী মহারাজও যথাযোগ্য আশীর্ব্বাদ প্রতিপ্রণামাদি করতঃ ইঁহাকে বলিলেন—"হ্যাঁ হে চরণদাস! শুনিতে পাই, তোমার শিষ্যেরা নাকি কাহাকেও দণ্ডবৎ প্রণাম বা ভক্তি করে না?"

বাবাজী। বাবা! আমি ত ইহাদের গুরু নই। ইঁহারা সকলেই জগদগুরু নিত্যানন্দের কৃপামাত্র। তাঁহার প্রেরণায় নাম শুনাইবার জন্য আমার নিকট আছেন। আমিও ইঁহাদের সঙ্গ পাইয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করিয়া থাকি। আচ্ছা! আমি একটা নিবেদন করি, উহারা আপনাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়াছে ত?

পণ্ডিতজী। হ্যাঁ, তা সকলেই করিয়াছে দেখিলাম।

বাবাজী। তবে আর শুনা কথা হৃদয়ে ধারণা করা আপনাদের ন্যায় মহাপুরুষের ভাল হয় কি?

পণ্ডিতজী বাবাজী মহাশয়ের কথার কোনওরূপ প্রত্যুত্তর না দিয়া বিশেষ উত্তেজিত ভাবে বলিয়া উঠিলেন—"এই বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বেটার কি স্পর্দ্ধা দেখ দেখি! বেটা কিনা ত্রিভুবন-বিজয়ী, সিদ্ধান্ত-সাগর শ্রীজীব গোস্বামীপাদের উপর কলম চালায়! পূর্ব্ব মহাজনগণের পদাঙ্কানুসরণই পরবর্ত্তী ব্যক্তির

সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য! এ বেটা কিনা জগদ্‌গুরু কথার উপর মত চালায়! আমার এ জাতক্রোধ কোনমতেই মিটিতেছে না।

বলিতে বলিতে উহার চক্ষু দুইটী ঈষৎ রক্তিমাকার ধারণ করিল। ক্রোধাবেশে যেন গরগর হইয়া গেলেন। উঁহার তাৎকালিক অবস্থা দর্শনে বাবাজী মহাশয় আর কোনও কথা বলিতে সাহস করিলেন না। কিছুক্ষণ পরে পণ্ডিতজী চলিয়া গেলেন!

পরদিবস অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত রামহরি দাস বাবাজী, মাধবদাস বাবাজী, হরিচরণদাস বাবাজী, রসিকদাস বাবাজী, বনমালীবাবু প্রভৃতি কয়েকজন সঙ্গে লইয়া বাবাজী মহাশয় শ্রীরাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ডের সঙ্গমস্থলে বসিয়া নানারূপ লীলাকথার প্রসঙ্গে পরমানন্দ লাভ করিতেছেন, ইত্যবসরে পণ্ডিত শ্রীনিত্যনন্দদাসজী আসিয়া উপস্থিত হইবামাত্র সকলে পরমসমাদরে উঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন।

বাবাজী মহাশয় বিশেষ আগ্রহ সহকারে পণ্ডিতজীকে নিজের নিকট উপবেশন করাইলেন। পণ্ডিতজী পূর্ব্বদিনের ন্যায় আবিষ্টভাবে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের উপর নানারূপ বাক্‌বজ্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সকলেই উঁহার ভয়ে ভীত হইয়া নীরবে অবস্থান করিতেছেন। বহুক্ষণ এইরূপ ভাবে কাটিয়া গেলে বাবাজী মহাশয় অতি ধীরে ধীরে বলিলেন—"আজ্ঞে! আপনি যদি অপরাধ গ্রহণ না করেন, তবে আমি এই সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিতে ইচ্ছা করি।

পণ্ডিতজী। তা বেশ, স্বচ্ছন্দে বল বাবা!

বাবাজী। দেখুন, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় যদি না আসিতেন, তবে শ্রীপাদ জীব গোস্বামীকে কেহ চিনিতেই পারিতেন না। আমি বলি—শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় শ্রীপাদ জীব গোস্বামীর অবতার, অথবা শ্রীপাদ জীব গোস্বামী

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর দেহে আবির্ভুত হইয়া নিজ মনোভাব সকল ভাষায় সর্ব্বসাধারণের গোচরীভূত করিয়াছেন। শ্রীজীব গোস্বামীপাদ স্বীয় মনোগত ভাব নিজের কলমে, নিজে নিঃসঙ্কোচ ভাবে প্রকাশ করিতে না পারিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের দ্বারা সেইটী প্রকাশ করিয়াছেন। আমার বিশ্বাস—বিশুদ্ধ ভাবে শ্রীজীব গোস্বামীপাদকে যদি কেহ ভালবাসিয়া থাকেন, তবে একমাত্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়। আপনি যদি শ্রীজীব গোস্বামীকে ভালবাসেন, তবে সর্ব্বাগ্রে আপনার বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীকে ভালবাসা বা ভক্তি করা উচিত। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীতে যাঁহার দ্বেষভাব থাকে, তিনি কখনই শ্রীজীব গোস্বামিপাদের কৃপার ভাজন হইতে পারিবেন বলিয়া আমার ধারণায় আসে না। আমি আর কি বলিব? আপনি সুপণ্ডিত, একটু বিশেষভাবে প্রণিধান করিয়া দেখিবেন। শ্রীমদ্ভাগবতাদি যে সমস্ত গ্রন্থে গোস্বামীপাদের এবং চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের টীকা আছে, তাহাতে সিদ্ধান্তগত উভয়ের কোনও মতভেদ নাই। তবে হৃদয়ের দ্বেষভাব পরিত্যাগ করিয়া না দেখিলে প্রকৃত মর্ম্মার্থ অবগত হইতে পারা যায় কি না সন্দেহ। হিংসা, দ্বেষ, ঈর্ষা, অসূয়া, পরশ্রীকাতরতা, লব্ধপ্রদ-প্রতিষ্ঠাদিরূপে অসৎগ্রহগণ যতক্ষণ মনুষ্যের হৃদয় আশ্রয় করিয়া থাকে, ততক্ষণ কিছুতেই প্রকৃত তত্ত্ব অথবা লীলা স্ফুর্ত্তি হইতে পারে না।

বাবাজী মহাশয় আবিষ্টের ন্যায় বহুক্ষণ ধরিয়া এইরূপ নানা কথা বলিতেছেন। পণ্ডিতজীও নিবিষ্টচিত্তে এতক্ষণ ইঁহার অমৃত-মধুর, দৈন্যপরিপূর্ণ বাক্যামৃত পানে বিভোর ছিলেন। যেমন ইঁহার কথা শেষ হইল, অমনি বলিতে লাগিলেন—"বাবা। যথেষ্ট হইয়াছে, আজ পর্য্যন্ত আমার এই ভুল ধারণা কেহ দূর করিতে পারে নাই। রাধারাণীর কৃপায় আজ তোমার সহিত আলাপ করিয়া বুঝিলাম যে, যথার্থই চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট আমার অপরাধ হইয়াছে। বাস্তবিকই আমি ঈর্ষ্যাপরতন্ত্র হইয়া মহতের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছি। যাহা

হউক বাবা! তোমায় আশীর্ব্বাদ করি, তুমি দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া প্রকৃত সুসিদ্ধান্ত দ্বারা জগতের অভাব মোচন কর। তোমার নিকট আমার আর একটী ভিক্ষা।"

বাবাজী মহাশয় করযোড়ে বলিলেন—"বাবা! এ দাস ত আপনাদের। কৃপা করিয়া আদেশ করিলেই নিজেকে কৃতার্থ মনে করিব।"

পণ্ডিতজী। কাল তোমাকে সদলে আমার কুটীরে শ্রীগিরিধারীর প্রসাদ গ্রহণ করিতে হইবে।

বাবাজী। এ ত আমার পরম সৌভাগ্য! আচ্ছা তাহাই হইবে। এ বিষয়ে আবার নিয়ন্ত্রণ কি? যখন তখন গিয়া আপনার অধরামৃত পাইলেই হইল।

এই বলিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন পণ্ডিতজী হৃষ্টচিত্তে আশীর্ব্বাদ করতঃ সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলে সকলেই দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। পণ্ডিতজী চলিয়া গেলে শ্রীমাধব দাস বাবাজী মহাশয় ইঁহাকে বলিলেন—"ভাই! তুমি ত খুব চালাক ছেলে? যাঁহাকে চৌরাশী ক্রোশের বৈষ্ণবগণ কথাটী বলিতে সাহস করেন না—ভয়ে অস্থির, সেই অতবড় পণ্ডিতটাকে তুমি কি না একেবারে চুপ করাইয়া দিলে! ঠিক যেন জল হইয়া গেল! বৃন্দাবনে আসিয়া খুব বুজরুকি দেখাইলে বটে; এটা বুজরুকির জায়গা নয় বাবা!" বাবাজী মহাশয় হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"বৃন্দাবন বুজরুকির জায়গা নয় কে বলিল? যদি বুজরুকির জায়গা থাকে ত পূর্ণমাত্রায় এখানেই আছে। আচ্ছা, বল দেখি রাধাগোবিন্দের কোন্ লীলাটী বুজরুকি নয়? চুরি, ডাকাতি, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, লম্পটতা, শঠতা, ভেলকী, বুজরুকি প্রভৃতি আকরস্থান বৃন্দাবন। বুজরুকি করিতে হয় ত বৃন্দাবনেই করা দরকার।"

তখন মাধব দাস বাবাজী মহাশয় পরিহাসপূর্ব্বক বাবাজী মহাশয়ের পিঠের উপর হাত দিয়া বলিলেন—"ভাই! শুনিতে পাই তুমি নাকি বাঙ্গলায় বহু বহু

পতিত জীবকে উদ্ধার করিয়া প্রেমদান করিয়াছ। এবার আমরা হাতে পাইয়াছি, সহজে ছাড়িব না। আমাদের উদ্ধার করিয়া যাহা হয় একটা করিতে হইবে।" বাবাজী মহাশয় রহস্য করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"ভাই! পতিত জীব পাইলে না হয় পতিতপাবন হওয়া যাইত; কৈ পাইলাম না ত। পতিত পাওয়া ত দূরের কথা—বৃন্দাবনে আমি একটীও জীব খুঁজিয়া পাইলাম না।"

মাধব। কেন আমরাই যে কলিহত পতিত জীব।

বাবাজী। ভুল কথা। অপ্রাকৃত ও নিত্য চিন্ময় বৃন্দাবনে কখনও কি প্রাকৃত জীবের বাস হইতে পারে? তোমরা ত প্রেমময়ীর নিত্যদাসী; তাঁহার প্রেমে বিমুগ্ধা হইয়া ব্রজে বাস পাইয়াছ; বরং তোমরাই কৃপা করিয়া আমাকে রাধারাণীর দাসীগণে গণ্য করতঃ বৃন্দাবনে বাস দিয়া জীবন ধন্য করাও।

বাবাজী মহাশয়ের কথা শুনিয়া রসিকদাস বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "আপনার কথায় আমার মনে একটী সন্দেহ উপস্থিত হইল। শাস্ত্রে আছে—বৃন্দাবনলীলা প্রাকৃত বুদ্ধির গোচর নয় বা প্রাকৃত জীবের বৃন্দাবনে বাস হয় না। আজকাল একথাটী আমরা বিশ্বাস করিব কিরূপ; কারণ, নিতান্ত অসচ্চরিত্র, নাস্তিক, ঘোর পাষণ্ড, অবিশ্বাসী জীবগণ আট দশ টাকা ব্যয় করিয়া রেলে চড়িল আর যথাসময়ে বৃন্দাবনে আসিয়া যেমন নামিল, অমনি চাকরের উপর আদেশ হইল। চাকর একটী দোতলা ভাড়াটিয়া বাড়ী এক বৎসরের জন্য ভাড়া করিল। বাবুরা পরমসুখে বৃন্দাবনে বাস করিতে লাগিলেন। বলুন, যাহারা আজন্মকাল বৃন্দাবনের লীলা-কথায় কর্ণপাত করা ত দূরের কথা—অবিশ্বাস, অশ্রদ্ধা করিয়া আসিতেছিল, তাহারা কিরূপে বৃন্দাবনে বাস করিল? তাহাদিগকে জীব বলিব, কি রাধারাণীর দাসী বলিব?"

বাবাজী। দেখুন, ঈশ্বরতত্ত্বে এবং মাধুর্য্য লীলাতত্ত্বে অনেক পার্থক্য আছে। ঈশ্বরতত্ত্ব সার্ব্বজনীন। তাহাতে উপাসক-অনুপাসক কিছুই ভেদ নাই; কিন্তু

লীলাতত্ত্বে উপাসক ভেদে লীলার সংক্ষেপে, বিস্তার বা বিকাশ হইয়া থাকে; শাস্ত্রে বলিয়াছেন—"বৃন্দাবনের তরুলতা পশুপাখী, সমস্তই অপ্রাকৃত। সর্ব্বদা ষড়্ঋতু বর্ত্তমান, চিন্তামণিময় ভূমি, কল্পবৃক্ষময় বন; কিন্তু 'চর্ম্ম-চক্ষে দেখে তারে প্রপঞ্চের সম।' চর্ম্মচক্ষু শব্দে অনুপাসকের চক্ষু বুঝিতে হইবে। এইরূপ শাস্ত্রে লীলাতত্ত্ব সম্বন্ধে যাবতীয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সমস্তই উপাসকের পক্ষে। যাঁহারা গোপীভাবের উপাসক, তাঁহারা বৃন্দাবনে একমাত্র পরম পুরুষ নন্দনন্দন গোবিন্দকে পুরুষ বোধ করিয়া, আর সকলকেই রাধারাণীর দাসী বলিয়া জ্ঞান করিবেন। পাষণ্ড, ভণ্ড, আস্তিক, নাস্তিক—যে কেহই বৃন্দাবনে আগমন করিবেন, উপাসকের পক্ষে সকলেই রাধারাণীর পরিকর। কারণ, কৃষ্ণ-আকর্ষন ভিন্ন কেহ বৃন্দাবনে আসিতে পারেন না; আবার কৃষ্ণ, রাধারাণীর পরিকর ভিন্ন কাহাকেও আকর্ষণ করেন না। সুতরাং যে কোন ব্যক্তিই বৃন্দাবনে আসুক না কেন, সকলেই রাধারাণীর পরিকর। অন্য কেহ এ কথা ধারণা করুন আর নাই করুন, উপাসকদিগের মধ্যে এটী দৃঢ় বিশ্বাস না থাকিলে উপাসনা-বিরুদ্ধ হয়।

এইরূপভাবে নানা কথোপকথন করিতে করিতে সকলে বিনোদের মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

একদিন অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত রামহরি দাস বাবাজী মহাশয় প্রভৃতি কয়েকজন মহাত্মাকে সঙ্গে লইয়া বাবাজী মহাশয় কুসুম সরোবরে গমন করিলেন। উদ্দেশ্য নিজে দর্শন করা এবং সঙ্গিগণকে দর্শন করান। কুসুম সরোবরে উপস্থিত হইয়াই দাউজীর মন্দিরের সম্মুখের যে ছত্রিতে শ্যামদাদা থাকেন, সেইস্থানে উপস্থিত হইয়াই শ্যামদাদাকে বলিলেন—"শ্যামদাস! বড়ই ক্ষুধা পাইয়াছে, কিছু দে ত ভাই!" শ্যামদাদা শশব্যস্তে কিরূপ কি করিবেন ভাবিতেছেন দেখিয়া, ইনি বলিলেন—শ্যামদাস! অত ব্যস্ত হইবার কোনই প্রয়োজন নাই, তোমার ঘরে যে শুকনো রুটির টুকরো আছে উহা হইলেই হইবে।"

শ্যাম। আমি বনবাসী, আমি শুক্‌নো রুটি ছাড়া আর কোথায় কি পাইব?

এই বলিয়া সেই সমস্ত রুটির টুকরা এবং দাউজীর প্রসাদী একটী লাড্ডু দিবামাত্র ঠিক বালকের ন্যায় সকলে কাড়াকাড়ি করিয়া খাইতে লাগিলেন। আনন্দের উৎস ছুটিতেছে। সকলেই বিভোর—সকলেরই যেন বাহ্যস্মৃতি নাই; আবার এই আনন্দের মধ্যে বাবাজী মহাশয় এক একটী রসপরিপূর্ণ বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন, আর সকলে দ্বিগুণতর আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া যাইতেছেন। একটু অবসর পাইয়া শ্যামদাদা ইহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আচ্ছা, আপনার সহিত আমার কোন কালেও পরিচয় নাই, তবে সেদিন আপনি দেখা হইবামাত্র আমার নাম ধরিয়া ডাকিলেন কিরূপে?"

বাবাজী। ভাই! তোমাদের সহিত কি একালের পরিচয়? বহুকাল হইতে আমরা এইরূপ ভ্রাতৃসম্বন্ধে পরস্পরে আবদ্ধ। স্নেহই হইতেছে আকর্ষণের বস্তু। জগতের প্রত্যেক জীব বা বস্তুর সহিত আমরা এই স্নেহপাশে আবদ্ধ থাকি বলিয়াই ইহা ছাড়িয়া অন্যদিকে অর্থাৎ মুক্তির পথে আমাদের যাইতেই ইচ্ছা হয় না। পরমার্থজগতে পর্য্যন্ত আমরা পরস্পর মমতাপাশে আবদ্ধ হইয়া যৌথিকরূপে সেবাদি করিবার প্রার্থনা করিয়া থাকি।

শ্যাম। কৈ আমরা ত সে সমস্ত কিছুই অনুভব করিতে পারি নে।

বাবাজী। প্রাকৃত রাজ্যের নানারূপ আবিলতার মধ্য হইতে মনটীকে একটু তুলিয়া আনিলেই সে স্থিরতা লাভ করে। তখন স্থিরচিত্তে অনুভব করিলে সকলেরই বোধগম্য হইয়া থাকে। ভাবিয়া দেখ না কেন! এক ব্যক্তিকে দেখিবামাত্রই মনে হয় ইহাকে কোথাও দেখিয়াছি এবং যেন কত আপনার বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং জানিতে হইবে যে, এই জন্মের পূর্ব্ব জন্মে নিশ্চয়ই ইঁহার সঙ্গে কোনওরূপ সম্বন্ধ ছিল।

এইরূপে অনেক রসালাপাদি করতঃ, কুসুম সরোবরের সমস্ত স্থান দর্শন

করিয়া পরমান্দিত হৃদয়ে সকলে মিলিয়া শ্রীকুণ্ডে বিনোদের মন্দিরে প্রত্যাগমন করিলেন।

ফিরিয়া আসিলেন বটে। কিন্তু ইঁহার মনটী সেই কুসুমসরোবরেই পড়িয়া রহিল। কথায় কথায় প্রায় সময়েই বলেন যে—"আমি চক্ষু মুদ্রিত করিলেই কুসুমসরোবরের সেই অপূর্ব্ব শোভা চোখের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়।" এই বলিয়া কুসুমসরোবরের এবং কুসুমবনের বর্ণনা করিতে থাকেন।

একদিন প্রাতঃকালে বাবাজী মহাশয় প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক শ্রীরাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড পরিক্রমা করিয়া একেবারে হরিচরণদাস বাবাজী মহাশয়ের ভজনকুটীরের সম্মুখে গিয়াই 'মহাত্মা' বলিয়া ডাক দিলেন। ইহার কণ্ঠধ্বনি শুনিবামাত্র হরিচরণদাস বাবাজী মহাশয় শশব্যস্তে কুটীরের দ্বার উন্মুক্ত করতঃ ইঁহার হাত ধরিয়া কুটীরের মধ্যে লইয়া বসাইলেন। বহুক্ষণ নানারূপ লীলাকথা, মহাপ্রভুর কৃপার কথা, দাস গোস্বামীর বৈরাগ্যের কথা লইয়া আলোচনা হইবার পর ইনি বলিলেন—"ভাই! তোমার শ্রীকুণ্ডে বাস, মাধুকরী বৃত্তি এবং নিষ্কঞ্চন ভাব দর্শনে আমি বড়ই প্রীত হইলাম। কিন্তু যেমন এক কলসী দুগ্ধের মধ্যে একবিন্দু গোমূত্রে সমস্ত বিনষ্ট হয়, তেমনি একটী ব্যবহারে আমার মন কেমন হইয়া গেল।" হরিচরণ দাস বাবাজী মহাশয় অতিশয় ব্যাকুলিতভাবে বলিলেন—"দাদা! কি হইয়াছে আমি ত ইহার কিছুই অবগত নহি। আপনি কৃপা করিয়া প্রকাশ করতঃ আমার চিত্ত সংশোধন করুন।"

বাবাজী। ভাই! তুমি পণ্ডিত, তোমাকে আর আমি বেশী কি বলিব? সেদিন যখন তুমি বিনোদের বাড়ী মাধুকরীর জন্য গেলে এবং সেস্থান হইতে একদোনা ডা'ল ও একদোনা তরকারী লইলে, তখন সেইটী দেখিয়া আমি বড়ই দুঃখিত হইলাম। কারণ, মাধুকরী বৃত্তির নিয়ম ত ঐরূপ নয়। মধুকর যেমন নিত্য নূতন ফুল হইতে অতি সামান্য ভাবে মধু গ্রহণ করতঃ নিজ উদর

পূরণ করে, সেইরূপ উদর ঝোলা করপাত্র করিয়া যাবৎ প্রয়োজন অর্থাৎ নিজ জীবন রক্ষার উপযোগী দ্রব্য গ্রহণ করিবে। কিন্তু যে স্থানে যিনি সুপরিচিত বা যেস্থানে যাঁহার প্রতিপত্তি-রাজগৃহে, বেশ্যাগৃহে, হাটে, বাজারে, পাটোয়ারগৃহে, যাজকব্রাহ্মণগৃহে, শ্মশানপালক-গৃহে, ব্যাজগ্রাহীর ঘরে, বিশ্বাসঘাতকালয়ে, ব্যাধগৃহে, দত্তাপহারীর গৃহে এবং গুরুদ্রোহীর গৃহে এই চতুর্দ্দশ স্থান হইতে গৃহীত অন্নের দ্বারা ভক্তিদেবী অন্তর্হিতা হন এবং গ্রহীতাকে পতিত হইতে হয়। হয়ত বলিতে পার যে, সে স্থানে বিনোদের মহাপ্রসাদ। সত্য, কিন্তু বিরক্তাশ্রমীর প্রতি মহাপ্রভু কি বলিয়াছেন—

"প্রভু কহে আমি মনুষ্য আশ্রমে সন্ন্যাসী।
কায়মনোবাক্যে ব্যবহারে ভয় বাসি॥
সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্র সর্ব্ব লোক গায়।
শুক্লবস্ত্রে মসীবিন্দু যৈছে না লুকায়॥
রায় কহে কত পাপীর করিয়াছ অব্যাহতি।
ঈশ্বর-সেবক তোমার ভক্ত গজপতি ॥
প্রভু কহে পূর্ণ যৈজে দুগ্ধের কলস।
সুরাবিন্দুপাতে কেহ না করে পরশ॥
যদ্যপি প্রতাপরুদ্র সর্ব্ব গুণবান্।
তাহারে মলিন করে 'এক রাজ নাম॥'

(চৈঃ, চঃ, মধ্যখণ্ডে ১২শ পরিচ্ছেদ)

আর একটী কথা, দেখ ভাই! যেমন তোমার দর্শন পাইবামাত্র সেবক ব্যস্তভাবে দুই দোনা ডা'ল তরকারী ও অন্যান্য বস্তু প্রদান করিল, অন্যান্য মাধুকরী বৈষ্ণব আসিলে ঐরূপ দেওয়া হয় কি? বোধ হয় কখনই নয়। তবেই ভাবিয়া দেখ, সেস্থানে তুমি বিশেষ পরিচিত ও প্রতিপত্তিশালী, তাহাতে রাজগৃহ। এটী বিরক্ত বৈষ্ণবের পক্ষে কতদূর গর্হিত!

এই বলিয়া শ্রীহরিচরণ দাস বাবাজী মহাশয়ের হাত দুইখানি ধরিয়া স্নেহবিগলিত কণ্ঠে বলিলেন—"ভাই! দুঃখ করিও না, তোমার ন্যায় সুবিজ্ঞ লোকের সামান্য ত্রুটিকে লোকে বিশেষ ভাবে গ্রহণ করিবে। তোমার ভাবনা কি? তুমি এই আসনে বসিয়া ভজন কর, তোমার যাহা কিছু প্রয়োজন হইবে প্রভু এই স্থানে আনিয়া দিবেন। তাঁহার নিজ প্রতিজ্ঞা—"যেই জন ভজে মোরে অনন্য হইয়া। তারে ভিক্ষা দেই মুঞি মাথায় বহিয়া॥"

এইরূপ বহুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর শ্রীহরিচরণ দাস বাবাজী মহাশয় গদগদকণ্ঠে বলিলেন—"দাদা! আপনি কৃপা করুন—যেন লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠার হাত এড়াইয়া নিষ্কিঞ্চন ভাবে ব্রজে কাল যাপন করিতে পারি।

বাবাজী। রাধারাণীকে জানাও, তিনি কৃপাময়ী, নিজ দাসী জ্ঞানে যাহা উপযুক্ত বোধ করিবেন তাহাই দিবেন। ভাবনা কি?

এই বলিয়া উভয়ে এক সঙ্গে বিনোদের মন্দিরে প্রত্যাগমন করিলেন।

শ্যামদাদার সর্ব্বাঙ্গে খোস হইয়াছে; সুতরাং তিনি সকলের সঙ্গে বসা, উঠা, পঙ্গতাদি করিতে কিছু সঙ্কুচিত হইয়া একটু ফাঁকে ফাঁকে থাকেন। একদিন মধ্যাহ্নে সকলে বিনোদের মন্দিরে মহাপ্রসাদ পাইতে বসিয়াছেন; শ্যামদাসজী একটু দূরে দাঁড়াইয়া আছেন। বাবাজী মহাশয় উঁহাকে দেখিয়াই বলিলেন—"শ্যামদাস! ওখানে দাঁড়াইয়া কেন? পঙ্গতে বস নাই যে?" শ্যামদাস করযোড়ে বলিলেন, "আমার সর্ব্বাঙ্গে ঘা, আমি সকলের মধ্যে বসিবার যোগ্য নহি।" বাবাজী মহাশয় বলিলেন—"আরে ওসব কিছু নয়, মনের বিকার মাত্র, এস এস?" বলিয়া বলপূর্ব্বক হাত ধরিয়া নিজ বাম পার্শ্বে বসাইলেন। তখন রাজর্ষি বলিলেন, "কেমন! রোজ রোজ আমাদিগকে ফাঁকি দেও, আজ কেমন শক্ত লোকের হাতে পড়িয়াছ?" বলিয়া বাবাজী মহাশয়কে বলিলেন—"দেখুন দাদা! শ্যামদাসজী আমাদের সঙ্গে মিশেন না কেন বলুন

দেখি?” বাবাজী মহাশয় মৃদু হাসিয়া বলিলেন—“ভাই! তোমরা হইলে মধুর ভাবের ভাবুক; সুতরাং সকলেরই অভিমান রাধারাণীর দাসী, আর শ্যামদাস হইল সখ্য ভাবের ভাবুক; সুতরাং ও পুরুষাভিমানী—ও তোমাদের সঙ্গে মিশিতে পারে কি? বরং আমার সহিত মিশিতে পারে!” তখন মাধবদাস বাবাজী বলিলেন—“তোমারও সখ্য ভাব নাকি? তাহা হইলে ত আমাদের তোমার সহিত মিশামিশি করা হইবে না।”

বাবাজী। আমার কথা ছেড়ে দাও, আমি তোমাদের সব তত্ত্বেই আছি।

শুনিয়া সকলেই হাসিতে লাগিলেন। রসিকদাস বাবাজী মহাশয় বলিলেন—“এক ব্যক্তি সব তত্ত্বে থাকিলে রসনিষ্ঠা থাকিতে পারে কি?”

বাবাজী। ভাই! আমি নিষ্ঠা-টিষ্ঠা বুঝি না। আমি শ্রীনিত্যানন্দদাস। নিতাই আমার যখন যেরূপ হইবেন, তাঁহার দাসেরও বাধ্য হইয়া তাহাই হইতে হইবে। বৃন্দাবনদাস বলিয়াছেন—

“নাগর নিতাই, নাগরী নিতাই, নিতাইকথা সে কয়॥
রাধার মাধুরী, আনন্দমঞ্জরী, নিতাই নিতু সে সেবে।
কোটী শশধর, বদন সুন্দর, সখা সখী বলদেবে॥
নিতাই সুন্দরে, যোগপীঠে ধরে, রত্ন সিংহাসন শেযে।
বসন নিতাই, ভূষণ নিতাই, বিলসে সখীর মাঝে॥”

ইত্যাদি নানারূপ রসপরিপূর্ণ বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন, আর মহাপ্রসাদ সেবা করিতেছেন। আনন্দের অবধি নাই। বাবাজী মহাশয়ের লীলাখেলার একটুকুই একটু বিশেষত্ব যে, প্রত্যেক লীলাটীতে নিজেও যেমন আনন্দিত, সর্ব্বসাধারণেও তেমনি আনন্দিত। প্রত্যেক কথাটি পরম রসাল অথচ তত্ত্বসম্বলিত।

একদিন বিনোদের মন্দিরে বসিয়া সকলে ইষ্টগোষ্ঠী করিতেছে, এই সময়

কাঞ্চন নামক একটী ব্রজবাসী একখানি খাতা হাতে লইয়া বাবাজী মহাশয়ের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলে ইনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবা! আপনি কি?"

কাঞ্চন। বাবা! মে রাধাকুণ্ডকা ব্রজবাসী হ্যায়।

বাবাজী মহাশয় "কৃপা করুন" বলিয়া প্রণাম করতঃ বলিলেন—"বাবা! আমার নিকট কিছু বলিবার আছে কি?"

কাঞ্চন। বোলেন কা আউর ক্যা হ্যায়? মে রাধাকুণ্ডকা ব্রজবাসী এহি মেরে বাত।

তখন হরিচরণদাস বাবাজী মহাশয় বলিলেন—'ইঁহার ইচ্ছা যে, আপনি এই খাতাখানায় একটি নাম লিখিয়া দেন।"

বাবাজী। তাহাতে কি হইবে?

হরিচরণ। হইবে আর কি? ইনি আপনার রাধাকুণ্ডের ব্রজবাসী হইলেন; সুতরাং আপনার অনুগত যত ভক্ত শ্রীরাধাকুণ্ডে আগমন করিবেন, ইনি সকলের তীর্থগুরু হইবেন এই উদ্দেশ্য।

বাবাজী মহাশয় হৃষ্টচিত্তে বলিলেন—"আজ হইতে ইনি আমার তীর্থগুরু হইলেন।"

হরিচরণ। তাহা হইলে উঁহার খাতায় আপনার নামটি লিখিয়া দিন।

বাবাজী। ভাই! যাহা লিখিতে হয় তুমি লিখিয়া দাও, আমি নাম স্বাক্ষর করিয়া দিতেছি।

হরিচরণদাস বাবাজী মহাশয় যথাযথরূপে লিখিয়া দিলে, ইনি তাহার নীচে নিজের নামটী সহি করিয়া ফণীকে ত্রিশটী টাকা ব্রজবাসীকে প্রণামী দিতে বলিলেন। ফণীও ইঁহার অদেশানুযায়ী কার্য্য করিল।

একদিন ইনি অতি প্রত্যুষে নিজ প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার অতি গম্ভীরভাবে শয়ন করিয়া রহিলেন। সঙ্গিগণের মধ্যে কাহারও ইঁহাকে

ডাকিবার সাহস হইতেছে না; ইত্যবসরে শ্রীমাধবদাস বাবাজী মহাশয় উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—"কি রকম? দাদা এখনও যে শয়নে আছেন! শরীরে কোনও অসুখ হইয়াছে কি?" ইনি কোন উত্তর দিলেন না দেখিয়া নীরবে নিকটে বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে ইনি ঠিক বালকের ন্যায় রোদন করিতে করিতে মাধবদাস বাবাজী মহাশয়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিতে লাগিলেন—"ভাই! আমি শ্রীরাধাগোবিন্দ দর্শন মানসে শ্রীবৃন্দাবন আসি নাই। আমি তোমাদের ন্যায় কয়েকটী প্রাণের লোককে দেখিবার জন্য এখানে আসিয়াছি। আমি তোমাদের পাইয়া যেরূপ আনন্দ উপভোগ করিতেছি, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব।" বাস্তবিকই শ্রীরাধাকুণ্ডে অবস্থানকালে শ্রীযুক্ত রামহরিদাস বাবাজী, হরিচরণদাস বাবাজী, মাধবদাস বাবাজী, রসিকদাস বাবাজী, শ্যামদাস বাবাজী, বনামালী রায়, কামিনী বাবু, ভূঞা মহাশয় প্রভৃতি মহাত্মাদিগের সহিত প্রায় মাসাবধি কাল বাবাজী মহাশয় যেরূপ পরমানন্দ উপভোগ করিয়াছেন এবং করাইয়াছেন, তাহার শতাংশের একাংশ ও ব্যক্ত করিবার ভাষা নাই। মহাত্মাদিগের কৃপা-প্রভাবে যে সুকৃতিবান্‌গণ সেই লীলার কিঞ্চিৎ মাত্রও অনুভব করিয়াছেন তাঁহারাই ধন্য। তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন যে, লীলাখেলার সহস্রাংশের একাংশও লেখা হয় নাই।

শ্রীধাম পুরী প্রত্যাবর্ত্তন।

শ্রীরাধাকুণ্ডে বিনোদবিহারী জীউর মন্দিরে এইরূপ পরমানন্দে কয়েকদিন কাটিয়া গেল। একদিন মধ্যাহ্ন সময় বাবাজী মহাশয় বিনোদের মন্দিরে মহাপ্রসাদ পাইতে পাইতে সাশ্রুগদগদকণ্ঠে সকলের নিকট শ্রীধাম পুরী যাইবার জন্য বিদায় গ্রহণ করিতে লাগিলেন। হঠাৎ এইরূপ মর্ম্মভেদী বাক্য শ্রবণে

সকলেই অতিশয় দুঃখিত-চিত্তে বলিতে লাগিলেন—"দাদা! এত শীঘ্র আমাদিগকে এরূপ কষ্ট দেওয়া কি আপনার উচিত? আমরা আশা করিয়াছি যে, বেশী দিন না হইলেও অন্ততঃ আরও একমাস কাল এই মধুময় সঙ্গ হইতে বঞ্চিত হইব না। কিন্তু আজ হঠাৎ এরূপ বজ্রসম বাক্য প্রয়োগ করাতে আমাদের প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে!" বনমালী বাবু বলিলেন—"দাদা! আপনি আর যাহা কিছু বলিবেন আমি পালন করিতে বাধ্য হইব; কিন্তু আপনার এই আদেশটী আমি কিছুতেই শুনিব না। এখন কিছুতেই যাওয়া হইবে না। আমার বিনীত প্রার্থনা যে, অন্ততঃ আর কয়েকদিন এইস্থানে থাকিয়া বিনোদ বিনোদিনীকে সুখী করুন এবং সেই সঙ্গে আমরাও পরমানন্দ লাভ করি।"

বাবাজী। ভাই! আমার কেমন একপ্রকার অভ্যাস যে—আমি বহুদিন এক জায়গায় থাকিতে পারি না। এ যাত্রায় নিতাইচাঁদ বোধ হয় আর রাখিবেন না। চিন্তা কি? ভাই! এ ত দু'দিনের মায়া সম্বন্ধ নয়! এটী পরমার্থ সম্বন্ধ; ইহা জীবনে মরণে সমান ভাবে বর্ত্তমান থাকিবে। কতবার আসিব—চিন্তা কি? আজ বৃন্দাবন যাইতে দাও।

রাজর্ষি আর বাধা দিতে না পারিয়া অনিচ্ছাসত্ত্বে অগত্যা কামিনী বাবুকে বলিলেন—"আগামী কল্য সপরিকরে দাদাকে বৃন্দাবন যাইবার ব্যবস্থা করিয়া দাও।" কামিনীবাবুও রাজর্ষির আজ্ঞানুযায়ী কার্য্য করিতে লাগিলেন। সকলের অনুরোধে সেদিন আর বৃন্দাবন যাওয়া হইল না।

পরদিবস প্রাতেই রওনা হইবেন, এই সময়ে রাজর্ষি বলিলেন—"অন্ততঃ এই বেলাটি বিনোদের মহাপ্রসাদ সেবা করিয়া যাইতে হইবে।" বিশেষ কাতর ভাবে এইরূপ প্রার্থনা করিলে, ইনি প্রীতির বন্ধন ছাড়াইতে না পারিয়া স্নান-আহ্নিকাদি শেষ করতঃ, যথাসময়ে বিনোদের মহাপ্রসাদ গ্রহণ পূর্ব্বক বেলা

অনুমান দুইটার সময় মধুর ব্যক্যে সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্বক বৃন্দাবনে রওনা হইলেন। ইঁহার মধুময় সঙ্গ ছাড়িতে না পারিয়া শ্রীযুক্ত রামহরিদাস বাবাজী, হরিচরণদাস বাবাজী, মাধবদাস বাবাজী, রসিকদাস বাবাজী, বনমালী রায়, কামিনী বাবু প্রভৃতি মহাত্মাগণ নানাবিধ আলাপ করিতে করিতে ঠিক মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় গোবর্দ্ধন পর্য্যন্ত ইঁহার অনুগমন করিলেন। গিরিরাজের দর্শন পাইবামাত্র সকলে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন! বাবাজী মহাশয় বনমালী বাবুকে আলিঙ্গনপূর্বক সাশ্রুগদগদকণ্ঠে বলিলেন—"ভাই বনমালী! অত কাতর কেন? নিতাইচাঁদের ইচ্ছায় আবার যত শীঘ্র হয় আসিতেছি, চিন্তা কি? যে সমস্ত মহাত্মাগণের সঙ্গ পাইয়াছ, অনেকের ভাগ্যে এরূপ মিলন অসম্ভব; সুতরাং যোগমায়ার কৃপাদত্ত মহাত্মাগণের সঙ্গে নিত্যলীলা প্রকটরূপে অনুভব করতঃ বিনোদের সেবা কর। বাহ্য এবং আন্তরিক আচার-ব্যবহার এক করিতে চেষ্টা কর সঞ্চারী ভাবকে স্থায়ী করিয়া যাহাতে স্বভাবে পরিণত করিতে পার সেই চেষ্টা কর। উপাসনারাজ্যে সাধকের ভাব, স্বভাব এবং স্বরূপ এই ত্রিবিধ দেহ; তন্মধ্যে যদি ভাব এবং স্বভাব গঠিত হয়, তবে স্বরূপের জন্য কোনওরূপ বাধা হইতে পারে না। শাস্ত্রে বলিয়াছেন— "স্বরূপতোঽন্যাকারেঽপি ভাবস্বভাবয়োঃ স্থায়িত্বে আশু কার্য্যসিদ্ধিঃ স্যাৎ। ইত্যাদি নানারূপ মৃদুমধুর বাক্যে সকলের মন শান্ত করতঃ সকলকে বিদায় দিয়া সগণে বৃন্দাবন গমন করিলেন। উঁহারা সকলেই বিমর্ষচিত্তে শ্রীরাধাকুণ্ডে গমন করিলেন; কিন্তু শ্রীযুক্ত রামহরিদাস বাবাজী এবং মাদবদাস বাবাজী ইঁহার সঙ্গে বৃন্দাবন গমন করিলেন।

পরদিনই পুরী রওনা হইবার উদ্যোগ হইতেছে, এই সময় গনেশবাবু প্রভৃতি কয়েকজন ভদ্রলোক আসিয়া ইঁহাকে বলিলেন—"আজ্ঞে! আজ আপনার যাওয়া হইবে না; কারণ প্রভুপাদ মদন গোপাল গোস্বামী মহাশয়

ধামলাভ করিয়াছেন। আগামী কল্য সেই উপলক্ষে নূতন সীতানাথ হইতে সাত সম্প্রদায় সংকীর্ত্তন বাহির হইবে, তাহাতে আপনার যোগ না দিলে চলিবে না।" শ্রীপাদ মদনগোপাল প্রভুর অপ্রকটের কথা শুনিয়া ইনি বড়ই মর্ম্মাহত হইয়া বলিলেন—"সে ত আমার পরম সৌভাগ্য! কাল কখন কীর্ত্তন বাহির হইবে?"

গনেশ। বোধ হয় সাড়ে চারিটার সময় বাহির হইবে; তবে এ স্থান হইতে অন্ততঃ চারিটার সময় বাহির না হইলে ঠিক সময় গিয়া পৌঁছান হইবে না।

ইত্যাদি নানারূপ প্রসঙ্গের পর সকলে নিজ নিজ নিত্যকৃত্য করিতে গমন করিলেন। পরদিবস অপরাহ্ন অনুমান চারিটার সময় শ্রীযুক্ত রামহরিদাস বাবাজী, মাধবদাস বাবাজী, গনেশ বাবু প্রভৃতি বহুলোক সঙ্গে বাবাজী মহাশয় নূতন সীতানাথে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলেই ইঁহার অপেক্ষায় ছিলেন। ইনি উপস্থিত হইবামাত্র কীর্ত্তন বাহির হইতে লাগিল। একে একে ছয় সম্প্রদায় কীর্ত্তন বাহির হইয়া গেলে ইনি নিশান খুন্তি সহ কীর্ত্তনে বাহির হইলেন।

অন্যান্য কীর্ত্তনীয়াগণ নানারূপ সুরতাললয়-সংযোগে কীর্ত্তন করিতেছেন; কাজেই ইচ্ছা থাকিলেও সর্ব্বসাধারণের ভাগ্যে সে কীর্ত্তনে যোগ দেওয়া ঘটিতেছে না। ইঁহার কীর্ত্তনে সে সমস্ত ঝঞ্ঝাট নাই; সুতরাং ইঁহার সঙ্গে বহুলোক। আবাল-বৃদ্ধ-যুবা সকলেই প্রাণ খুলিয়া নামে যোগ দিতেছে। যেন আনন্দের সাগর উথলিয়া উঠিয়াছে। যথা-নিয়মে বনখণ্ডীর নিকট সংকীর্তন উপস্থিত হইবামাত্র শ্রীগোপেশ্বর প্রভুপাদ আসিয়া কীর্তনে যোগ দিলেন। বাবাজী মহাশয় অবধূতকে দেখিবামাত্র প্রেমগদগদ-ভাবে উঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। উভয়ের স্পর্শে উভয়ে বিভোর, উভয় দেহে সমকালীন সাত্ত্বিক বিকারগণ এরূপ ভাবে প্রকাশ পাইতেছে যে, দেখিয়া উপস্থিত লোক সকল বিস্মিত হইতেছে। এক একটি হুঙ্কার-ধ্বনিতে যেন বৃন্দাবনভূমি বিকম্পিতা হইতেছেন।

নামের রোল দ্বিগুণতর প্রবল বেগ ধারণ করিয়া ক্রমেই যেন বৰ্দ্ধিত হইতে লাগিল। সংকৰ্ত্তন ক্রমে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হইতে শ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভুর কুঞ্জের সমীপবৰ্ত্তী হইবামাত্র যেন ভাবের উচ্ছাস আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কাহারই যেন বাহ্যস্মৃতি নাই। সকলেই উন্মত্তের ন্যায় উদ্দণ্ড নৃত্য করিতেছেন। অন্যান্য কীৰ্ত্তনসম্প্রদায়ও আসিয়া একত্র মিলিত হইল। সে এক অপূর্ব আনন্দ! বৃন্দাবনভূমি পদভরে টলমলায়মান; খোল, করতাল, ঝাঁজ এবং গগনভেদী নামের ধ্বনিতে দশদিক মুখরিত; বৃন্দাবনের পশুপাখী, তরুলতাও আজ যেন কেমন একপ্রকার নূতন ভাবে বিভাবিত। চারিদিক লোকে লোকারণ্য। সকলেই পরস্পর বলাবলি করিতেছেন যে—“নগরকীৰ্ত্তনে আমরা বারমাসই ভ্রমণ করিয়া থাকি, কিন্তু এ জাতীয় আনন্দ ত আমরা আর কখনও অনুভব করি নাই, এমন কি এরূপ আনন্দ যে নগরকীৰ্ত্তনে হইতে পারে আমাদের ত এ ধারণাই ছিল না।” বহুক্ষণ এইরূপ উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে করিতে যথানিয়মে বৃন্দাবন পরিক্রমা করতঃ নূতন সীতানাথে আসিয়া কীৰ্ত্তন সমাপ্ত করিলেন।

পরদিবস বাবাজী মহাশয় বৃন্দাবনবাসী আবাল-বৃদ্ধ-যুবা, স্ত্রী-পুরুষ— এমনকি তরুলতা, পশুপাখীদিগের নিকট পৰ্য্যন্ত করযোড়ে বিনয়বাক্যে নিজ ব্যবহারজনিত দোষ ক্ষমা প্রর্থনা করতঃ দণ্ডবৎ প্রণতিপূর্বক বিদায় গ্রহণ করিয়া সন্ধ্যার সময় শ্রীধামপুরী রওনা হইলেন। যথাসময়ে গাড়ী হাওড়া স্টেশনে পৌঁছিলে সকলেই নামিয়া কোথায় যাওয়া হইবে জিজ্ঞাসা করায় বাবাজী মহাশয় বলিলেন—“যখন কালই পুরী যাওয়া হইবে তখন আর শহরের মধ্যে প্রবেশ করিবার প্রয়োজন নাই; আজ এই নিকটবর্তী ধৰ্ম্মশালায় থাকা যাক্!” বলিয়া মাড়ওয়ারীদিগের ধৰ্ম্মশালায় গমন করিলেন। সঙ্গিগণ ঠাকুরের ভোগরাগের যোগাড় করিতে লাগিলেন। ইনি স্নান-আহ্নিকাদি শেষ

করিয়া নামকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। প্রায় দুই ঘণ্টা সময় "জয় জয় নিত্যানন্দ" কীর্ত্তন করিয়া মহাপ্রসাদ গ্রহণপূর্বক সকলে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। এদিকে একটি ভদ্রলোক কলুটোলা কুঞ্জবাবুদের বাড়ী গিয়া পুলিনদাদাকে বলিলেন, "আজ সকাল বেলা অনেক লোক সঙ্গে বাবাজী মহাশয়কে হাওড়া স্টেশনে নামিতে দেখিলাম।"

পুলিন। কোন্ দিকে গেলেন বলিতে পার?

ভদ্র। না, আমি ত বিশেষ কোন খবর লইতে পারি নাই; কারণ আমার সঙ্গে নানারূপ ঝঞ্ঝাট থাকায় আমি যাইয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে পারিলাম না; কিন্তু যেন মাড়ওয়ারীদের ধর্মশালার দিকে যাইতে দেখিলাম।

পুলিনদাদা আর কোন কথা না বলিয়া হাওড়া স্টেশনে রওনা হইলেন। পূর্বোক্ত ভদ্রলোকটির কথানুয়ায়ী সর্বপ্রথম মাড়ওয়ারীদিগের ধর্মশালায় গিয়া দেখেন যে, বাবাজী মহাশয় একটি ঘরে একাকী আপাদমস্তকে চাদর ঢাকাদিয়া শয়ন করিয়া আছেন। পুলিনদাদা নীরবে এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন, এই সময় ইনি মুখের চাদর খুলিয়া বলিলেন—"কিরে পুলিন! তুই কখন এলি!"

পুলিন। আজ্ঞে! প্রায় আধ ঘণ্টা হইবে।

বাবাজী। আমি এখানে আসিয়াছি, তোকে কে বলিল?

পুলিন। আজ্ঞে! একটি ভদ্রলোক আপনাকে স্টেশনে নামিতে দেখিয়াছিলেন; তবে কোথায় আছেন, একথা সঠিক কিছুই বলিতে পারেন নাই। আপনি অকেবারে কাহাকেও কিছু সংবাদ না দিয়া ধর্মশালায় আসিয়া রহিলেন যে! আমরা কি আপনার কেউ নই?

বাবাজী। নারে পাগল! আমি কল্য প্রাতের গাড়ীতে পুরী যাইব বলিয়া আর তোদের সংবাদ দিই নাই বা শহরের ভিতর প্রবেশ করি নাই।

পুলিন। সে সব হইবে না। মায়ের অনুরোধ, একবার আমাদের বাড়ী যাইতে হইবে।

বাবাজী। আগামী কল্য আমাকে পুরী যাইতে হইবে। আচ্ছা, গাড়ী লইয়া আইস, একবার মায়ের সহিত দেখা করিয়া আসি। (প্রেমদাদাকে) তোমরা প্রস্তুত থাকিবে, আমি শীঘ্রই আসিতেছি, যেন কাল পুরী যাওয়ার কোনরূপ বাধা না ঘটে।

প্রেমদাদা বলিলেন—"আপনি আসিলেই সব ঠিক হইয়া যাইবে।" এইরূপ কথাবার্তা হইতেছে, ইত্যবসরে পুলিনদাদা দুইখানি গাড়ী লইয়া আসিলে রামদাদা, ফণী, রাধাবিনোদ প্রভৃতি কয়েকজন সঙ্গীকে লইয়া ইনি কলুটোলায় গমন করিলেন। কলুটোলায় পৌঁছিয়া সকলের সহিত নানারূপ ভাগবৎপ্রসঙ্গ হইতে লাগিল। একজন বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"আজ্ঞে! আজকাল বৃন্দাবনের স্বাস্থ্য কিরূপ?"

বাবাজী। বাবা! বৃন্দাবন অপ্রাকৃত চিন্ময় ভুমি, সেস্থানে সর্ব্বদার তরে ষড়ঋতু বর্তমান; সুতরাং সেস্থান কখনই অস্বাস্থ্কর হইতে পারে না। তবে যেটুকু প্রাকৃত চক্ষে দেখা যায়, সেটি কেবল অধিকারী ভেদে মাত্র।

বাবু। আজ্ঞে! স্থান ত সমস্তই একরূপ, তাহার মধ্যে প্রাকৃত অপ্রাকৃত ভেদ কি, আমি ত কিছুই বুঝিলাম না। আচ্ছা, যেটিকে আপনারা অপ্রাকৃত বলেন, তাহারসহিত অন্য দেশের বস্তুগত কোনওরূপ পার্থক্য আছে কি? অর্থাৎ অন্য দেশের গাছপালা, লতাপাতার সহিত বৃন্দাবনের গাছপালা, লতা-পাতার আকার-প্রকার বা রূপ-গুণগত কোনও পার্থক্য দেখা যায় কি?

বাবাজী। পার্থক্য আছে বৈ কি! তবে দ্রষ্টার চক্ষুর তারতমা থাকা চাই এবং চিত্তবৃতিতির প্রকারভেদ চাই। যেমন এক দোকান হইতে খরিদ করা চা'ল, ডা'ল প্রভৃতি দ্বারা একই প্রকারে অগ্নি, জল সহযোগে প্রস্তুত অন্ন,

ব্যঞ্জন প্রভৃতির অর্দ্ধাংশ তুলসীপত্র দ্বারা যেমন ভগবানকে নিবেদন করা হইল, অমনি উহা চিন্ময় হইল। যদিও অপরার্দ্ধের সহিত উহার রূপগত কোন পার্থক্য হইল না বটে, কিন্তু গুণগত অনেক পার্থক্য বা আধিক্য হইল। অনিবেদিত অংশে স্পর্শদোষ দ্রব্যগুণ থাকিল, আর নিবেদিতাংশে অপ্রাকৃত চিন্ময় ভগবদঅধরামৃত সঞ্চার হওয়ায় উহার হেয়াংশ দূর হইয়া একমাত্র উপদেয়াংশ রহিল। এইরূপ দৃষ্টিগত ভাবে চিন্ময় ধামের বৃক্ষাদির সহিত প্রাকৃত বৃক্ষাদির আকারগত কোনওরূপ পার্থক্য না থাকিলেও গুণগত পার্থক্য অনেক।

বাবু। এইটি কি সার্বজনীন না ব্যক্তিগত?

বাবাজী। সার্বজনীন কিরূপে বলা হইতে পারে? কারণ শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন—"চিন্তামণিময় ভূমি, কল্পবৃক্ষ বন। চর্মচক্ষে দেখে তারে প্রপঞ্চের সম॥" অন্যত্র—"দেখিয়া না দেখে যত অভক্তেত গণ। উলুকে না দেখে যৈছে সূর্য্যের কিরণ।" সুতরাং ধাম, মহাপ্রসাদ, নাম, শ্রীমূর্তি, বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ প্রভৃতিতে নিত্য অপ্রাকৃত চিন্ময় বুদ্ধি স্থায়ী রাখাই সাধকগণের সাধন। যদিও আপনি স্বাভাবিক কথায় বৃন্দাবনের স্বাস্থ্যের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, কিন্তু আমার সেইরূপ স্বাভাবিক ভাব হৃদয়ে আনিতে গেলে উপাসনার ব্যাঘাত হয়, তাই আমি আপনার কথার ঠিক সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারিলাম না বলিয়া দুঃখ করিবেন না

ইত্যাদি নানারূপ কথোপকথনে বহুক্ষণ কাটিয়া গেল। পুলিন দাদাদের বাটির সকলের অনুরোধে সেদিন সেস্থানে থাকিতে হইল। পরদিন যথাসময়ে স্টেশনে আসিয়া সঙ্গিগণ সমভিব্যাহারে শ্রীধাম পুরীর গাড়িতে উঠিলেন। পরদিবস যথাসময়ে গাড়ী পুরী স্টেশনে পৌঁছিলে, ইঁহারা সকলে নাম করিতে করিতে ঝাঁজপীটা মঠে আসিয়া পৌঁছিলেন।

বিবিধ কাহিনী

কয়েকদিন পরে আজ আবার পুরীতে নূতন আনন্দ। পুরীবাসী আবাল-বৃদ্ধ-যুবা, স্ত্রী-পুরুষ সকলেই যেন আনন্দে মাতোয়ারা। বাবাজী মহাশয় অতি প্রত্যুষে স্নানাদি নিজ নিত্যকৃত্য সমাপনপূর্বক কীর্ত্তন লইয়া শ্রীজগন্নাথের মন্দিরে গমন করিলেন। যাইবার সময় রাস্তায় যাঁহার সহিত দেখা হইতেছে, তিনিই আত্মহারা ভাবে ইঁহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিতেছেন। পরস্পর দর্শন, স্পর্শন, আলাপ, দণ্ডবৎ, প্রেমালিঙ্গন প্রভৃতির জন্য শ্রীমন্দিরে পৌঁছিতে অনেক বেলা হইয়া গেল। মন্দিরে উপস্থিত হইয়াই জগমোহনে উদ্দণ্ড কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। নিয়মসেবা শেষ হইয়া গিয়াছে; সুতরাং তখনও বিদেশী যাত্রীক অনেক রহিয়াছে। জগমোহন লোকে লোকারণ্য। কি বিদেশী, কি দেশী সকলেই আজ যেন কেমন একপ্রকার নূতন আনন্দে বিভোর! কাহারই বাহ্যস্মৃতি নাই; কেহ বা কীর্ত্তনে নৃত্য করিতে করিতে ঠিক বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছে, আবার কেহ বা কীর্ত্তনে গড়াগড়ি দিয়া বাবাজী মহাশয়ের চরণ বক্ষে ধারণ করতঃ নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতেছে, কেহ বা অচৈতন্য হইয়া পড়িতেছে, কেহ বা কাহাকেও কোলে করিয়া নৃত্য করিতেছে। সকলেই আনন্দে মাতোয়ারা! বেলা প্রায় এগারোটা পর্যন্ত এইরূপ সংকীর্ত্তনানন্দ উপভোগ করিয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে গম্ভীরা, গঙ্গামাতা মঠ, সিদ্ধ বকুল মঠ প্রভৃতি স্থান দর্শন, দণ্ডবৎ ও পরিক্রমা পূর্বক যেমন সিংহদ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন, অমনি গম্ভীরার অধিকারী শ্রীহরিভজনদাস বাবাজী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাত হইল। তিনি ইহাকে দেখিবামাত্র পরমানন্দ সহকারে বলিলেন— "দেখুন, আগামী কল্য পঞ্চক্রোশী পরিক্রমা বাহির হইবে। অনেক লোকেরই অভিলাষ যে, আপনি সংকীর্ত্তন লইয়া যান। গতবৎসর শরীর অসুস্থ থাকার

দরুণ আমার ভাগ্যে ঘটে নাই; এবৎসর আপনাকে যাইতেই হবে।" বাবাজী মহাশয় হৃষ্টচিত্তে বলিলেন—"এ ত আমার পরম সৌভাগ্য! অধমের প্রতি আপনাদের এত কৃপা আছে বলিয়াই ত আমি সুদূর দেশে চলিয়া গেলেও আপনারা আকর্ষণ করিয়া ঠিক সময়মত লইয়া আসেন। কখন বাহির হইতে হইবে?"

হরিভজন। যত সকালে হয় চেষ্টা করিব।

বাবাজী। নিতাই এর ইচ্ছায় আমি কীর্ত্তন লইয়া প্রাতে মন্দিরে আসিব। তারপর যখন মহাপ্রভুর ইচ্ছা হয় বাহির হওয়া যাইবে।

হরিভজন। আচ্ছা, আমিও কীর্ত্তনমণ্ডলীসহ মন্দিরেই আসিব! ইত্যাদি নানা কথোপকথনের পর অধিকারী মহাশয় চলিয়া গেলেন। ইঁহারাও কীর্ত্তন লইয়া ঝাঁজপীটা মঠে আগমন করিলেন।

পরদিবস যথাসময়ে শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির হইতে পরিক্রমা বাহির হইল। গম্ভীরায় কীর্ত্তনদল অগ্রে অগ্রে গমন করিতেছেন, ইঁহারা তৎপশ্চাতে যাইতেছেন। বহুলোক সমবেত হইয়াছে। পঞ্চক্রোশী পরিক্রমা প্রতি বৎসরই বাহির হয়; কিন্তু ও বৎসর যেরূপ আনন্দ হইতে লাগিল, অন্য কোন বৎসর এরূপ আনন্দ হয় নাই। এত লোকসংখ্যাও আর কোন বৎসর হয় নাই। পঞ্চক্রোশবাসী লোকসকল যেন পরমানন্দে মাতোয়ারা হইয়া গেল। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই একবাক্যে বলিতে লাগিল, "পরিক্রমার এরূপ আনন্দ হইতে পারে, আমাদের এরূপ ধারণাই ছিল না। বড় বাবাজী মহাশয়ের কৃপায় এত আনন্দ।" বালকগণ আপনহারা ভাবে ইঁহার কীর্ত্তনের অগ্রে অগ্রে নৃত্য করিতে করিতে এক একবার এরূপভাবে হরিধ্বনি করিতেছে যে, গ্রামস্থ সকলেই নিজ নিজ ব্যাপার ত্যাগ করিয়া কীর্ত্তনে যোগ দিতেছে। যে একবার কীর্ত্তনের মধ্যে গিয়া ইঁহার দর্শন পাইয়াছে বা সেই মনপ্রাণ-মাতান নামের

ধ্বনি শুনিতেছে, সে আর ইঁহাদিগকে ছাড়িয়া স্থানান্তরে গমন করিতে সমর্থ হইতেছে না।

বেলা অতিরিক্ত হওয়ার দরুণ সকলে একটী বটবৃক্ষতলে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে একজন ভক্ত দুইটী বোঝারির মাথায় দিয়া পীঠাপানা প্রভৃতি জগন্নাথের নানারূপ মহাপ্রসাদ আনিয়া উপস্থিত করিলেন। মহাপ্রসাদ দর্শনমাত্র সকলেই পরমানন্দে প্রণাম বন্দনা পূর্ব্বক শ্রীজগন্নাথদেবের জয় দিতে লাগিলেন। অধিকারী মহাশয় ভক্তটীর প্রার্থনানুসারে যথাযোগ্য ভাবে সকলকে বসাইয়া যথাযথরূপে পঙ্গত করাইয়া দিলেন। মহাপ্রসাদ পাইয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রামান্তে সেস্থান হইতে রওনা হইয়া বেলা অনুমান সাড়ে তিনটার সময় আসিয়া সিংহদ্বারে পৌঁছিলেন। আনন্দের অবধি নাই। সকলে পরমানন্দে শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের বাহিরে বেড়া পরিক্রমা পূর্ব্বক নিজ নিজ বাসায় গমন করিলেন।

বাবাজী মহাশয় প্রত্যহই সংকীর্ত্তন লইয়া জগন্নাথের মন্দিরে গমন করেন। আজ কয়েকদিন হইল সঙ্গিগণের উপর কীর্ত্তনের ভারার্পণ-পূর্ব্বক নিজে অতি প্রত্যুষে ফণীকে সঙ্গে লইয়া সমুদ্রের ধারে বেড়াইতে যান। অতি গম্ভীরভাব—কোনই কথাবার্ত্তা নাই। চক্রতীর্থের নিকট গিয়া দক্ষিণাভিমুখী হইয়া উর্দ্ধদিকে চাহিয়া প্রায় আধঘণ্টা অর্দ্ধস্ফুটভাবে করযোড়ে নানারূপ স্তবস্তুতি করেন। বালক ফণী পিছনে দাঁড়াইয়া সমস্তই দেখে; কিন্তু কিছু বলিবার সাহস পায় না। এইরূপ ভাবে কয়েকদিন যায়, একদিন শেষরাত্রে উঠিয়া পূর্ব্ববৎ রওনা হইবার সময় ফণী সঙ্গে যাইতে চাহিলে, তাহাকে নিষেধ করিয়া একাকী অতি দ্রুতগতি বাহির হইয়া গেলেন। বেলা অনুমান দশটার সময় একগাছি কাল রঙের বাঁকা লাঠি কাঁধের উপর করিয়া মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং অতি গম্ভীরভাবে ঠাকুরমন্দিরের বারান্দার উপর বসিলেন। চক্ষুদুইটী রক্তবর্ণ

ও সজল; নীরবে বসিয়া আছেন! সঙ্গিগণ সকলেই উপস্থিত; কিন্তু কেহই কিছু জিজ্ঞাসা করিবার সাহস পাইতেছেন না। প্রায় আধঘণ্টা পরে গদগদকণ্ঠে ললিতাদাসীকে ডাকিয়া বলিলেন—“দেখ, এই অনন্তদেবকে অতি সাবধানে রাখিয়া দাও, ইঁহার বৃত্তান্ত পরে বলিব। যেন কোনরূপ অযত্ন না হয়।” ললিতাদাসী ইঁহার আদেশনুযায়ী লাঠিগাছটী লইয়া ঠাকুর মন্দিরে রাখিলেন। বাবাজী মহাশয় যেন কেমন আনমনা আনমনা ভাবে স্নানাদি শেষ করতঃ মহাপ্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক বিশ্রাম করিলেন।

পরদিবস ঠাকুরের মঙ্গল-আরতির পর পূর্ব্বোক্ত লাঠিগাছটী সঙ্গে লইয়া সমুদ্রের দিকে বেড়াইতে বাহির হইলেন। শ্রীমান্ ফণী সঙ্গে আছে। ক্রমে চক্রতীর্থের নিকট উপস্থিত হইয়া লাঠিগাছটী দক্ষিণ স্কন্ধের উপর রাখিয়া করযোড়ে দক্ষিণাভিমুখে অবস্থান পূর্ব্বক ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করতঃ প্রায় পনর মিনিট কাল অর্দ্ধস্ফুট ভাষায় কি যেন কি স্তব করিয়া লাঠিগাছটী সজোরে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন। কি আশ্চর্য্য! কিছুক্ষণ পরে জলের তরঙ্গে লাঠিগাছটী সমুদ্রে তীরে বাবাজী মহাশয় যে স্থানে দাঁড়াইয়া ছিলেন, ঠিক সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলে, ইনি শশব্যস্তে উহা তুলিয়া পুনঃ পুনঃ বুকে ও মস্তকে ধারণ করিতে লাগিলেন। এই সমস্ত ব্যাপার দর্শনে ফণী বিস্মিত ভাবে বলিল—“বাবা! এরূপ রং এবং এরূপ আকারের লাঠি ত আমি কখনও দেখি নাই। আবার প্রায় একশত হাত দূরে ফেলিয়া দেওয়া হইল; কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যে ঠিক চেতন পদার্থের ন্যায় আসিয়া উপস্থিত হইল! ইহার ভাব ত আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না!” তখন বাবাজী মহাশয় বলিলেন—বেটা! এ কি লাঠি? এ যে সাক্ষাৎ অনন্তদেব! গতকল্য নিতাইচাঁদ নিজে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে চক্রতীর্থের উপরে এই লাঠিগাছটী আমাকে দিয়াছেন। ইনি সচেতন। শ্রদ্ধাভক্তিসহকারে ইঁহাকে সেবা ও যত্ন

করিলে মহাশক্তি লাভ হইবে এবং অতি অনায়াসে লীলা স্ফূর্ত্তি হইবে।” ইত্যাদি নানারূপ আলাপ করিতে করিতে মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এইরূপে কয়েকদিন যায়—পৌষসংক্রান্তির পূর্ব্বদিবস রাত্রে ললিতা দাসীকে আদেশ করিলেন যে, আগামী কল্য প্রাতে অনন্তদেবের মহাভিষেক হইবে, সমস্ত দ্রব্য প্রস্তুত চাই। তখন ললিতাদাসী ইঁহার আদেশানুরূপ পঞ্চগব্য, পঞ্চামৃত, তৈল, হরিদ্রা, কর্পূরবাসিত জল, পঞ্চতীর্থোদক, গঙ্গোদক প্রভৃতি যোগাড় করিতে লাগিলেন। এদিকে রাত্র প্রভাত হইতে না হইতে বাবাজী মহাশয় নিজ নিত্য কৃত্য সমাপনান্তে যষ্টিরূপী অনন্তদেবকে লইয়া স্নানবেদীর উপর উপবেশন করিলেন। ললিতাদাসী অভিষেকের দ্রব্যাদি স্নানবেদীর নিকট উপস্থিত করিবামাত্র ইনি নিজহস্তে যষ্টিরূপী অনন্তদেবকে প্রথমে তৈলহরিদ্রা মাখাইয়া পরে পঞ্চগব্য, পঞ্চামৃত প্রভৃতি দ্বারা স্নান করাইতে লাগিলেন। এদিকে ললিতাদাসী নিজ সঙ্গিনীগণকে সঙ্গে লইয়া প্রসাদী তৈলহরিদ্রা বাবাজী মহাশয়কে মাখাইয়া দিতে লাগিলেন। মঠে কোনও সামান্য ব্যাপার হইলেও অতি অল্প সময়ের মধ্যে সেটী চারিদিকে প্রকাশ হইয়া পড়ে। আজও তাহাই হইল। প্রতিবেশী-বেশিনীগণ অভিষেকের কথা শুনিয়া ত্বরান্বিতভাবে আসিতে লাগিলেন। প্রসাদি পঞ্চামৃতাদি দ্বারা ইঁহার স্নান হইলে পর জল ঢালা আরম্ভ হইল। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! যষ্টিরূপী অনন্তদেবকে মস্তকের উপর রাখিয়াছেন, আর অবিরত ধারে জল ঢালা হইতেছে। প্রথমে ইঁহার সঙ্গিগণ জল আনিতেছিলেন; ক্রমে একটু সাহস পাইয়া প্রতিবেশিণীগণও ইন্দারা হইতে জল তুলিয়া আনিতে লাগিল। একশত আটকলসীর স্থানে কত কলসী জল যে ঢালা হইতে লাগিল, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে?

যথাসময়ে স্নান শেষ হইলে ইনি নিজহস্তে অনন্তদেবের অঙ্গমার্জ্জনাদি করিতে লাগিলেন। ললিতাদাসী ইঁহার অঙ্গমার্জ্জনাদি করিয়া দিলে ইনি শুস্ক

ডোর কৌপীন পরিধান পূর্ব্বক অনন্তদেবকে একখানি পৃথক্ গৃহে রাখিলেন এবং সঙ্গিগণকে উহার পৃথক্ পূজাদি করিতে আদেশ করিলেন। সঙ্গিগণও ইঁহার আজ্ঞানুযায়ী কার্য্য করিতে লাগিলেন।

মাঘ মাসে বসন্ত পঞ্চমীর দিন প্রাতঃকালে উঠিয়াই বাবাজী মহাশয়ের কি খেয়াল হইল, খোলকরতালযোগে নাম করিতে করিতে আউলিয়া মঠে গমন করিলেন। অঙ্গনে নাম হইতে লাগিল। ইনি শ্রীমন্দিরে প্রবেশপূর্ব্বক ঝাঁজপীটা মঠস্থ রাধাকান্তদেবের বিজয়োৎসব উপলক্ষে শ্রীশ্রীমদনমোহন জীউকে নিমন্ত্রণ করতঃ রাধারাণী এবং মদনমোহনকে সঙ্গে লইয়া সেস্থান হইতে কীর্ত্তন করিতে করিতে রাধারমণ কুঞ্জে গমন করিলেন। সে স্থানেও পূর্ব্ববৎ রাধারাণী ও রাধারমণদেবকে লইয়া পরমানন্দে নৃত্য করিতে করিতে ঝাঁজপীটা মঠে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক একখানি উত্তম আসনে সমস্ত ঠাকুরকে উপবেশন করাইলেন। অপূর্ব্ব দৃশ্য! একদিকে সমস্ত ঠাকুরগণ ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠামে দাঁড়াইয়াছেন, আর অপরদিকে ঠাকুরাণীগণ সমভাবে দাঁড়াইয়াছেন। নামসংকীর্ত্তন হইতেছে— আনন্দের অবধি নাই—সকলেই যেন মাতোয়ারা!

এদিকে নানারূপ ভোগরাগের আয়োজন হইতেছে। ললিতাদাসী রান্না করিতেছেন, আর এক একবার আসিয়া ঠাকুরের অপূর্ব্ব সম্মিলন দর্শন করিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া যাইতেছেন। কিছুক্ষণ পরে বাবাজী মহাশয় "শ্রীরাধাকান্তদেবের বিজয়োৎসব উপলক্ষে এই অপূর্ব্ব সম্মিলন হইয়াছে, আজ আমাদের পরমানন্দের দিন, সুতরাং সকলে মিলিত হইয়া মঙ্গল গান কর" এইরূপ ভাবে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কুসুমদাসী, বৃন্দাদাসী, রাধাবিনোদ প্রভৃতি আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। ইঁহার আদেশে সমস্ত ঠাকুর ঠাকুরাণীদিগকে নূতন বস্ত্র পরান হইল। যেন আনন্দের পাথার বহিয়া যাইতে লাগিল। অসময়ে হঠাৎ ঐরূপ মনপ্রাণ-মাতান সংকীর্ত্তন-ধ্বনি শ্রবণে চারিদিক

হইতে বহুলোক সমবেত হইতেছে। মঠে প্রবেশ করিয়া শ্রুতিমধুর সংকীর্ত্তন শ্রবণ এবং ঠাকুরদিগের অপূর্ব্ব সম্মিলন দর্শনে সকলেই যেন বিমুগ্ধ হইয়া যাইতেছেন। সকলেই আত্ম-বিস্মৃত হইয়া বিস্মিতভাবে অনিমেষনয়নে উপস্থিত ব্যাপার দর্শন করিয়া স্বীয় স্বীয় কার্য্য ভুলিয়া গিয়াছেন। বহুক্ষণ সংকীর্ত্তনের পর ভোগের সময় উপস্থিত জানিয়া সংকীর্ত্তন সমাপ্ত করিলেন। যথাসময়ে ভোগ শেষ হইলে উপস্থিত ভক্তবৃন্দ সহ পরমানন্দে মহাপ্রসাদ গ্রহণান্তে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করতঃ সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে পূর্ব্ববৎ সংকীর্ত্তন করিতে করিতে ঠাকুরদিগকে স্বীয় স্বীয় মন্দিরে স্থাপনপূর্ব্বক মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

একদিন বেলা অনুমান সাড়ে সাতটার সময় শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত বিমলাপ্রসাদ দত্ত ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী মহাশয় মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইতিপূর্ব্বে বাবাজী মহাশয়ের সহিত উঁহার পরিচয় ছিল কিনা জানি না—হঠাৎ উঁহাকে দেখিবামাত্র ইনি পরমসমাদরে উঁহাকে নিজ সম্মুখে একখানি আসনে উপবেসন করাইয়া নানারূপ আলাপাদি করিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে বিমলাবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"আচ্ছা! আপনার এই শিষ্যদিগের মধ্যে নানারূপ ভাব, নানারূপ বেশ দেখা যায় কেন?"

বাবাজী। বাবা! ইঁহারা কেহই আমার শিষ্য নন। আমি নিজেই কাহারও শিষ্য হইতে পারিলাম না! সর্ব্বদা অভিমান ও অহংকারে মত্ত হইয়া লাভ, পূজা ও প্রতিষ্ঠার আশায় দেশবিদেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াই; আমি আবার কাহাকে শিষ্য করিব?

বিমলা। কেন? উহারা প্রায় সকলেই ত আপনার শিষ্য বলিয়া পরিচয় দেয়।

বাবাজী। ঐটীই উঁহাদের মহত্ত্ব। উঁহারা নিতাইদাস। তাঁহার আদেশে আমাকে সেবাদি শিক্ষা দিবার জন্য এখানে আছেন। উঁহারা আমার শিক্ষাগুরু।

বিমলা। আচ্ছা, এই যে কয়েকজন সখীবেশে আছে, ইহারা কী আপনার আদেশে ঐরূপ বেশ ধারণ করিয়াছে

বাবাজী। না বাবা! আমি কাহাকেও আদেশ করি নাই। উঁহারা স্বেচ্ছায় ঐরূপ বেশ ধারণ করিয়াছে।

বিমলা। আপনি উহাদিগকে বারণ করেন না কেন?

বাবাজী। উহারা আমার কথা শুনে না।

বিমলা। যদি আপনার কথাই না শুনে, তবে আপনি উহাদিগকে তাড়াইয়া দেন না কেন?

বাবাজী। দেখুন, নিতাই এর সংসারে তিনি তাঁহার দাসদাসীকে রাখিবেন, আমি তাড়াইবার কে? বিশেষতঃ, আমি উহাদিগের আচার ব্যবহারে, ভজন সাধনে এমন কোন দোষ দেখিতে পাই না যে, উহাদিগকে অবজ্ঞা করিব; বরং উহাদিগকে আদর্শস্থানীয় বলিয়াই মনে হয়। কোন এক সময় উহাদিগের বেশ লইয়া নানারূপ সমালোচনা আরম্ভ হইলে, আমি আমার গুরুদেবকে ঐ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি আদেশ করিলেন যে—"নিতাইচাঁদের সংসারে কাহাকেও অবজ্ঞা করিও না। তুমি সমস্তকে আদর যত্ন করিতে পার; কিন্তু বিদায় দিবার অধিকার তোমার নাই। গোস্বামীপাদগণের শাস্ত্রের গূঢ়মর্ম্ম বেশ প্রণিধান করিয়া ভাবিলে বুঝিতে পারিবে যে, ভাবকে স্থায়ী করিতে হইলে স্বভাবে পরিণত করা প্রয়োজন; স্বভাবে পরিণত করতে হইলে দেহে তদ্‌জাতীয় বেশভূষাদি ধারণ, বাক্যে তদ্‌জাতীয় আলাপ-ব্যবহার ও লীলাগুণ কীর্ত্তনাদি, মনে তদ্‌ভাবাঢ্য নিত্য পরিকরগণের আনুগত্যে লীলাদি স্মরণ, মনন, নিদিধ্যাসনাদি আচরণ করা বিশেষ আবশ্যক। যদি সাধুগুরুবৈষ্ণবের কৃপায় কাহারও সেরূপ সৌভাগ্য ঘটিয়া থাকে, তবে তাহাদিগকে আদর্শস্থানীয় মনে করিবে।" গুরুদেবের এইরূপ আজ্ঞা পাইয়া আমি উহাদিগকে আর কোনওরূপ কিছু বলিতে সাহস পাই নাই ।

বিমলা। আচ্ছা, শাস্ত্রানুসারে ঐরূপ বেশের কিছু আবশ্যকতা দেখাইতে পারেন কি? অথবা পূর্ব্বমহাজনগণ কেহ ঐরূপ বেশ ধারণ করিয়াছেন, দেখাইতে পারেন কি?

বাবাজী। বাবা! আমি শাস্ত্রসিদ্ধান্তাদি কিছুই জানি না, তবে সাধারণ যুক্তি অনুসারে দেখিতেছ যে, সকল শাস্ত্রেই একবাক্যে বেশের প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়া গিয়াছেন। একে একে দুই চারিটী আপনাকে দেখাইতেছি,—যজ্ঞোপবীত ব্রাহ্মণত্বের পরিচায়ক বা সাধনের সহায়। এইরূপ সন্ন্যাসীর ত্রিপুণ্ড, গৈরিকবসন, দণ্ডীর ত্রিদণ্ড, শৈবের রুদ্রাক্ষ, বিভূতি ও ব্যাঘ্রচর্ম্ম; বৈষ্ণবগণের তিলক, তুলসীমালা প্রভৃতি ধারণ শাস্ত্রসম্মত নহে কি? সধবা রমণীয় শঙ্খসিন্দুর স্বামীর স্মারক বা উদ্দীপক অথবা অস্তিত্বের পরিচায়ক নয় কি? আপনি যে সখী ভাবের কথা বলিতেছেন, এ বিষয়ে আমি আর কি বলিব? শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যমের অষ্টম পরিচ্ছেদে শ্রীরায় রামানন্দ-সংবাদটী আলোচনা করিলেই, ইহার প্রয়োজনীয়তা বেশ হৃদয়ঙ্গম হইবে। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন—

রাধাকৃষ্ণ-লীলা এই অতি গূঢ়তর।
দাস্যবাৎসল্যাদি ভাবের না হয় গোচর।।
সবে এক সখীগণের ইঁহা অধিকার।
সখী হইতে হয় এই লীলার বিস্তার।।
সখী বিনা এই লীলা পুষ্ট নাহি হয়।
সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয়।।
সখী বিনা এই লীলায় অন্যের নাহি গতি।
সখীভাবে যেই তাঁরে করে অনুগতি।।
রাধাকৃষ্ণের কুঞ্জসেবা সাধ্য সেই পায়।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায়।।

অন্যত্র ঃ—

সেই গোপীভাবামৃতে যার লোভ হয়।
বেদধর্ম্ম ত্যজি সেই কৃষ্ণকে ভজয়।।
রাগানুগা মার্গে তাঁরে ভজে যেই জন।
সেইজন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দন।

স্থানান্তরে ঃ—

অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার।
রাত্রিদিন চিন্তে রাধাকৃষ্ণের বিহার।।
সিদ্ধদেহ চিন্তি করে তাঁহাঙ্ঘ্রি সেবন।
সখীভাবে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ।। ইত্যাদি।

আবার শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—"সখীনাং সঙ্গিনীরূপামাত্মানং বাসনাময়ীম্। আজ্ঞাসেবাপরাং তত্তৎ-রূপালঙ্কার-ভূষিতাম্।।" সনৎকুমার তন্ত্রে "আত্মানং চিন্তয়েত্তত্র তাসাং মধ্যে মনোরমাম্। রূপযৌবনসম্পন্নাং কিশোরীং প্রমদাকৃত্রিম্।। ইত্যাদি বহু বহু স্থানে সখীভাব স্থায়ী করিয়া রাধাকৃষ্ণলীলা ভাবনা করিবার কথা বলিয়াছেন। আবার—"সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি। তদ্ভাবলিপ্সু না কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ।।" ইত্যাদি বাক্যে শ্রীজীব গোস্বামিপাদের টীকা—"সাধকরূপেণ যথাবস্থিতদেহেন সিদ্ধরূপেণ অন্তশ্চিন্তিতাভীষ্টতৎসেবোপযোগিদেহেন। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী—সাধকরূপেণ যথাবস্থিতদেহেন। সিদ্ধরূপেণ অন্তশ্চিন্তিতাভীষ্টতৎসাক্ষাৎসেবোপযোগিদেহেন। তদ্ভাবঃ স্বপ্রেষ্ঠকৃষ্ণ-বিষয়কঃ স্বসমীহিতকৃষ্ণভজনাশ্রয়কশ্চ যো ভাব উজ্জ্বলাখ্যস্তং লব্ধুমিচ্ছতা সেবা মনসৈবোপস্থাপিতৈঃ সাক্ষাদপ্যুপস্থাপিতৈশ্চ সমুচিতদ্রব্যাদিভিঃ পরিচর্য্যা কার্য্যা। অত্র প্রকারমাহ—ব্রজলোকানুসারতঃ সাধক-রূপেণানুগম্যমানা

যে ব্রজলোকাঃ শ্রীরূপগোস্বাম্যাদয়ঃ যে চ সিদ্ধরূপেণানুগম্যমানা ব্রজলোকাঃ শ্রীরূপমঞ্জর্য্যাদয়স্তদনুসারতঃ।। ইত্যাদি পূর্ব্বমহাজনগণের বাক্যের সহিত ইহাদের আচরণের কোনওরূপ বৈপরীত্য দেখা যায় কি?

বিমলা। বৈপরীত্যের মধ্যে এই যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনগণ কর্ত্তৃক অননুষ্ঠিত, অন্তশ্চিন্তিত ভাবযোগ্যদেহকে বাহিরে প্রকাশ করা।

বাবাজী। কেন? এরূপ যোগ্য দেহ ত অনেকেই ধারণ করিয়া জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন! নিত্যানন্দ প্রভু বলরামের আবেশে তদযোগ্য বেশভূষা ধারণ করিয়া জগৎকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। তাহার সঙ্গীয় পরিকরগণ প্রায় সকলেই সখ্যভাবাবিষ্ট হইয়া গোপবেশ ধারণ করিতেন। দাস গদাধর রাধিকার ভাবাবেশে গোপীবেশ ধারণ করিয়া নিত্যানন্দপ্রভুর সহিত নানা লীলাদি আচরণ করিয়াছিলেন। অভিরাম ঠাকুর সখ্যভাবাবেশে বংশী প্রভৃতি ধারণ করিতেন। আবার লোচনানন্দ দাস ঠাকুর, খণ্ডবাসী নরহরি সরকার ঠাকুর প্রভৃতি কখনও নদীয়া নাগরীবেশে গৌরের সহিত মিলন করিতেন, আবার কখনও বা ব্রজ গোপীর বেশে কক্ষে গাগরী লইয়া দধিদুগ্ধ বিক্রয়ীর ভাবে রাস্তায় রাস্তায় ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। আচ্ছা! আমি একটী কথা জিজ্ঞাসা করি—শাস্ত্রে কোথাও ভাবযোগ্য বেশভূষা বাহিরে ধারণ করিবার নিষেধ করিয়াছেন পাওয়া যায় কি? বা ভাবটী স্বভাবে পরিণত করিবার চেষ্টা করাটাকে কেহ অসঙ্গত মনে করিয়াছেন কি?

ইত্যাদি নানারূপ তত্ত্ব-আলোচনার পর বিমলাবাবু চলিয়া গেলেন। ইনিও নিজ নিত্যকৃত্যাদি করিতে গমন করিলেন।

একদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া ইঁহার মনে কি খেয়াল উদয় হইল; নিজহস্তে কলার ডোঙ্গা খোলা কাটিতে লাগিলেন। এদিকে একজনকে কিছু শ্রীজগন্নাথের মহাপ্রসাদ আনিতে পাঠাইয়া দিয়া ললিতাদাসীকে বলিলেন—"দেখ, আমি শ্রাদ্ধ করিব। তিল, তুলসী, ফল, কুশ প্রভৃতি যাহা যাহা দরকার যোগাড় করিয়া দাও?" ললিতাদাসী প্রথমে শ্রাদ্ধের কথা শুনিয়া একটু বিস্মিতভাবে

বলিলেন, "আজ্ঞে! শ্রাদ্ধ করা কিরূপ, আমি ত কিছুই বুঝিলাম না! বর্ণাশ্রম ত্যাগের সহিত সদুচিত ক্রিয়াকর্ম্মাদিরও ত্যাগ হইয়া যায় ত?

বাবাজী। ত্যাগ অনেক প্রকার, গীতায় বলিয়াছেন—"ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ। যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে।"

ললিতা। আজ্ঞে! এইটী নিত্যকর্ম্মপর বাক্য নহে কি?

বাবাজী। যে সকল কর্ম্মে ফল উক্ত হয়, সে সমস্ত কর্ম্ম নিত্যকর্ম্মের মধ্যে ধরা হয় না। যে কর্ম্ম আচরণে ফল নাই, অকরণে প্রত্যবায় হয়, পণ্ডিত মহাপুরুষগণ তাহাকেই নিত্যকর্ম্ম বলিয়াছেন।

ললিতা। আচ্ছা, যখন ভেক গ্রহণের পর পূর্ব্বাশ্রমের পিতা, মাতা বা আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে কোন সম্বন্ধই থাকে না, এমন কি পূর্ব্ব গোত্র পর্য্যন্ত পরিত্যাগ হইয়া যাওয়ায়, অচ্যুত গোত্রে গোত্রী হইয়া ভগবৎ পথের পথিক হওয়ায় পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্তি হয়, তখন পূর্ব্ব গোত্রস্থ পিতামাতা প্রভৃতিকে কিরূপে পিণ্ডদান সম্ভব হইবে?

বাবাজী। সম্বন্ধ দুই প্রকার,—মায়িক ও পরমার্থিক। মায়িক সম্বন্ধ আশ্রম, বর্ণ এবং দেহগত। এই তিনটির এক একটির পরিবর্ত্তনে সম্বন্ধ চ্যুত হইয়া যায়। আর পারমার্থিক সম্বন্ধ নিত্য। উহার কখনও বিনাশ হয় না। পিতামাতার সহিত জাতি, কুল বা আশ্রমগত যে সম্বন্ধ থাকে, সন্ন্যাস গ্রহণের পর সেই সম্বন্ধ রহিত হইয়া যায়; কিন্তু পরমার্থ সম্বন্ধ কখনই ধ্বংস হইতে পারে না। বিশেষতঃ, যতদিন এই দেহ বর্তমান থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত পিতৃঋণ, ঋষিগণ দেবঋণ, এই ত্রিবিধ ঋণে সে আবদ্ধ। ঐ ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য লোক সংসার পরিত্যাগ করিয়া পরমার্থ ধন উপার্জ্জনে ব্যগ্র হয়। সাধু, গুরু, বৈষ্ণব কৃপায় এবং ভগবদনুগ্রহে এই স্থূল দেহের সাহায্যে উপার্জ্জিত পরমার্থ ধনের একাংশ পিতৃ-মাতৃ উদ্দেশ্যে, একাংশ ঋষিদিগের, একাংশ দেবতাদিগের, বাকী একাংশ নিজের। আর একটি কথা ভাবিয়া দেখ, কেহ যদি কোনও উত্তম বস্তু

প্রাপ্ত হয়; তবে তাহা সকলকে (নিজ ভালবাসার লোকদিগকে) না দিয়া নিজে ব্যবহার করা ঠিক কি?

ললীতা। না, তাহা না দিলে সুখ হইবে কেন!

বাবাজী। তাই আজ এই শ্রাদ্ধ বা সমর্পণকার্য্য করিবার ইচ্ছা হইয়াছে।

ললিতাদাসী আর কোনও কথা না কহিয়া হৃষ্টচিত্তে ইঁহার আদেশ অনুযায়ী সমস্ত দ্রব্য যোগাড় করিয়া দিলে, ইনি শ্রাদ্ধ করিতে বসিলেন। এদিকে শ্রীজগন্নাথের অন্ন মহাপ্রসাদ, ডাল, তরকারি এবং নানারূপ পীঠা পানা আনা হইয়াছে। বাবাজী মহাশয় ললিতাদাসীকে আদেশ করিলেন—"মহাপ্রসাদ, ডাল, তরকারি প্রভৃতি সমস্ত একসঙ্গে মাখিয়া পিণ্ড আকারে প্রস্তুত করতঃ একটি বড় থালায় রাখ। আমার প্রয়োজন অনুসারে আমার হাতে এক একটি করিয়া দিবে।" ললিতাদাসী আদেশানুরূপ কার্য্য করিতে লাগিল।

বাবাজী মহাশয় প্রথমে চুপে চুপে কতকগুলি পিণ্ড প্রদান করিয়া তৎপরে এক একজন সঙ্গীকে ডাকিয়া তাহার বংশের মধ্যে মৃত ব্যক্তিদিগের নাম ও গোত্র উল্লেখ পূর্ব্বক মহাপ্রসাদের পিণ্ড এবং নানারূপ পীঠাপানা প্রভৃতি মিষ্ট মহাপ্রসাদ সমর্পণ করতঃ করযোড়ে সাশ্রুগদগদকণ্ঠে নানারূপ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! সঙ্গিগণ সকলেই করযোড়ে দণ্ডায়মান—সকলেরই চোখের জলে মুখ বুক ভাসিয়া যাইতেছে। সকলেই যেন প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিতেছেন যেন বহু বহু মূর্ত্তি বালক, বৃদ্ধ, যুবা, স্ত্রী, পুরুষ, মহাপ্রসাদ গ্রহণ পূর্ব্বক দিব্য তেজঃপুঞ্জ দেহ ধারণ করতঃ হৃষ্টচিত্তে, সকলকে আশীর্ব্বাদ করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিতেছেন। হঠাৎ বাবাজী মহাশয় উঠিয়া সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবামাত্র সঙ্গিগণও ব্যাকুলিতভাবে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। সমস্ত মহাপ্রসাদ একত্র করিয়া সর্ব্বাগ্রে কয়েক মূর্ত্তি অভ্যাগত বৈষ্ণবকে পরিতৃপ্তভাবে সেবা করাইয়া তদবশেষ গ্রহণপূর্ব্বক সঙ্গিগণ সঙ্গে ইনি মহাপ্রসাদ সেবা করিতে লাগিলেন।

মহাপুরুষদিগের যত কিছু লীলাখেলা অন্তরঙ্গ ভক্ত লইয়া। এ জগৎ

শিক্ষাভূমি; শিক্ষাভূমিতে প্রবেশ করিলেই পরীক্ষা অবশ্যম্ভাবী। বাবাজী মহাশয় শ্রাদ্ধ করিলেন, চারিদিকে এই আন্দোলন চলিতে লাগিল। একদিন রামদাদা, গোবিন্দদাদা, নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী, নগেনদাদা প্রভৃতি কয়েকজন শ্রীরাধারমণকুঞ্জ মঠে বসিয়া নানারূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময় একজন বলিলেন বলিলেন—"আচ্ছা! বাবাজী মহাশয়ের কর্ম্মকাণ্ডের দিকে এত ঝোঁক কেন? আমরা ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না?" কেহ বলিতেছেন—'ইহার এক এক সময় কেমন এক এক রকম খেয়াল উদয় হয়।" একজন বলিলেন—"এই কা'ল যে শ্রাদ্ধ করা হইল, ইহার তাৎপর্য্য ত আমি কিছুই বুঝিতে 'রিলাম না। এদিকে ইনিই সিদ্ধান্তে বলেন যে—ব্রজধামগত পিতা, মাতা, ভাই, ভগিনী প্রভৃতিকে শ্রাদ্ধাদি সামান্য কার্য্য উপলক্ষ্য করিয়া স্থানচ্যুত করান কোনমতেই যুক্তিসঙ্গত নয়।" আবার ইনিই ঐরূপ আচরণ করিয়াছেন বলিয়া, কত কত লোক যে ভ্রমে পড়িবে কে তাহা নিবারণ করিবে? ভেক গ্রহণ করিলে যখন পূর্ব্বাশ্রমের সংস্রব পর্য্যন্ত থাকে না বা রাখাও নিষেধ, তখন কিরূপে এই কার্য্য হইতে পারে?" ইত্যাদি বহুপ্রকার সমালোচনা হইতে লাগিল। ক্রমে বাহিরের সমালোচনা হৃদয়ে স্পর্শ করায় উহাদিগকে যেন কেমন একপ্রকার করিয়া তুলিল। কেহ ভাবিতেছেন—বৃন্দাবন যাই, কেহ বা নবদ্বীপ, কেহ কেহ বা অন্যান্য স্থানে যাইবার সংকল্প পর্য্যন্ত মনে মনে স্থির করিতেছেন।

এদিকে বাবাজী মহাশয় অতি গম্ভীর ভাবে ঝাঁজপীটা মঠের আঙ্গিনায় বসিয়া আছেন, হঠাৎ রামদাদা এবং গোবিন্দদাদা সেই স্থানে উপস্থিত হইবামাত্র গম্ভীরস্বরে 'রাম' বলিয়া ডাক দিলেন। ইহার সেই গম্ভীর ভাব এবং কণ্ঠস্বর দেখিয়া শুনিয়াই রামদাদা এবং গোবিন্দদাদার মনে আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে; সুতরাং সাহস করিয়া কেহই আর নিকটে গমন করিতে সমর্থ হইতেছেন না। তখন আবার ইনি বলিলেন—"হ্যাঁগো, তোমাদের কি সব সমালোচনা হইতেছিল? আমি নানারূপ স্বতন্ত্রতা আচরণ করি, কর্মকাণ্ডের উপরে আমার

বিশেষ ঝোঁক এবং শ্রাদ্ধ করিয়াছি ইত্যাদি কারণে আমার পতন হইয়াছে—কেমন, এই না? যখন আমার পতন হইয়াছে, তখন পতিত জীবের সঙ্গ করা তোমাদের ন্যায় মহাত্মার কোন মতেই উচিত হয় না; সুতরাং এই মুহূর্তেই এখান হইতে চলিয়া যাও।" বলিয়া একটু ক্রোধাবেশ প্রকাশ করতঃ সঙ্গিগণকে বলিলেন—"দেখ, উহারা চলিয়া গেলে ঐস্থানে বেশ করিয়া গোবরছড়া দাও ত!" সকলেই নীরব নিস্তব্ধভাবে অবস্থান করিতেছেন। রামদাদা অত্যন্ত ভীত এবং কম্পিত কলেবরে অতিকষ্টে দাঁড়াইয়া আছেন। গোবিন্দদাদা সাহসে ভর করিয়া কি বলিতে উদ্যত হইবামাত্র ইনি বাধা দিয়া বলিলেন—"পাষণ্ড! তোদের মুখ দেখা উচিত নয়। আমি যাহাই হই না কেন, তোরা ত একদিন আমাকে গুরুবুদ্ধি করিয়াছিলি! যদি বা আমার কোন ব্যবহারে তোদের মনে কোনওরূপ সন্দেহ উদয় হইয়াছিল, তবে অন্যত্র সমালোচনা না করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলি না কেন? তোদের ন্যায় চঞ্চলচিত্তব্যক্তিদিগের সঙ্গ করা উচিত নয়। এখনও দাঁড়াইয়া রহিলি যে? তোদের মুখ দেখিলে আমার হৃদয়ে ক্রোধের উদ্রেক হইতেছে।" এই বলিয়া ক্রোধাবেশে নিকটস্থিত একটা পিক্‌দানী উহাদের দিকে নিক্ষেপ করিবামাত্র উহারা উভয়ে ভয়ে পলায়ন করিলেন।

ইহার কঠোর শাসনে সঙ্গিগণ ভীতভীতভাবে গোবর গুলিয়া ছড়া দিলেন বটে; কিন্তু সকলেই বিমর্ষ। সেই দিবস রাত্রের ট্রেনেই রামদাদা কলিকাতা চলিয়া গেলেন। গোবিন্দদাদা শ্রীধামেই রহিলেন; কিন্তু বড়ই ভীত। বাবাজী মহাশয়ের নিকটে যাইতে সাহস পাইলেন না। বলরাম বাবুর বাড়ীতে গিয়া রহিলেন। বলরামদাদা এবং অন্যান্য গুরুভাইগণ নানারূপ অনুরোধ করিলেও গোবিন্দদাদা অভিমানে প্রসাদ পাইলেন না। একটি নির্জ্জন গৃহে শয়ন করিয়া রহিলেন। ক্রমে বেলা শেষ হইয়া গেল—সন্ধ্যা আগতপ্রায়, এই সময় গোবিন্দদাদার ভয়ানক মাথায় যন্ত্রণা আরম্ভ হইল। বড়ই অস্থির হইয়া পড়িলেন দেখিয়া বলরামদাদা আসিয়া বাবাজী মহাশয়কে বলিলে ইনি কাতরভাবে

বলিলেন,—"অবোধ বালকের ন্যায় ব্যবহার! কোনই হিতাহিত জ্ঞান নাই। আমি উহাদের হিতের জন্য চেষ্টা করিতে গেলাম; কিন্তু উহারা বিপরীত বুঝিল। যাক, এখানে লইয়া আইস।"

বলরাম। আজ্ঞে! তাঁহার উঠিবার সাধ্য নাই, অসহ্য মাথার যন্ত্রণায় ছট্ফট্ করিতেছেন, আর এপাশ হইতে ওপাশ গড়াগড়ি করিতেছেন। আপনি একবার অনুগ্রহ করিয়া চলুন, তাহা না হইলে তাঁহার কষ্ট কিছুতেই নিবারণ হইবে না।

এই কথা শুনিয়া ইনি আর কোন কথা না বলিয়া বলরামের সঙ্গে তাহার বাড়ী গিয়া, যে ঘরে গোবিন্দদাদা ছিলেন সেই ঘরে গিয়া উঁহার অবস্থা দর্শনে সাশ্রুগদগদকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—"কিরে গোবিন্দ! কি হইয়াছে?

গোবিন্দদাদা নিরুত্তর। তখন ইনি গোবিন্দদাদার মাথায় বাম হস্ত বুলাইয়া বলিলেন—"যা, খাওয়া দাওয়া কর গিয়া, না বুঝিয়া অভিমান কেন? আমি তোদের ভালর জন্য বলিয়াছি।" এতক্ষণে গোবিন্দ দাদার চোখে জল আসিল, ঠিক বালকের ন্যায় রোদন করিতে করিতে ইঁহার চরণতলে পতিত হইলেন, ইনিও উঁহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন দানে হৃদয়ে যতকিছু জল্পনা-কল্পনাদি ছিল, সমস্ত গ্রহণ পূর্ব্বক হৃদয় স্বচ্ছ এবং নির্ম্মল করিয়া দিলেন।

এদিকে অনুভবী রামদাদা কলিকাতায় গিয়াও শান্তি পাইতেছেন না—সর্ব্বদাই যেন নিজেকে অপরাধী মনে করিতেছেন। কাহারও সহিত মেশামেশি করিতেছেন না, আপন মনে হরিনাম জপ করিতেছেন, আর মনে মনে নানারূপ সংকল্প বিকল্প করিতেছেন। এইরূপে দুইদিন গেল। তিন দিনের দিন আর স্থির থাকিতে না পারিয়া, নিজ হস্তে একখানি পত্র লিখিলেন। পত্রখানির মর্ম্ম এই—"জয় নিতাই! অগ্নি যৈছে নিজ ধাম, দেখাইয়া অবিরাম, পতঙ্গীরে আকর্ষিয়া মারে। কৃষ্ণ ঐছে নিজগুণ, দেখাইয়া হরে মন, পাছে দুঃখ-সমুদ্রেতে ডারে॥ নিজ বুদ্ধিভ্রমেই হউক বা সঙ্গপ্রভাবেই হউক, আমার হৃদয়ে যাহা কিছু জল্পনা কল্পনা উদয় হইয়াছিল, আপনি নিজ কৃপাশক্তি বলে সমস্তই অবগত

আছেন, সে বিষয়ে লেখা বাহুল্য মাত্র। হৃদয়ে অযথা অনধিকার চর্চ্চারূপ পাপস্পর্শ হেতু কৃপাদণ্ড গ্রহণ করিতে অসমর্থ বিধায় ভীত হইয়া আপনার অজ্ঞাতসারে কলিকাতায় চলিয়া আসিয়াছি; কিন্তু কোন প্রকারেই শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হইতেছি না। জীব স্বভাববশতঃ অপরাধ করা আমাদিগের চিরস্বভাব কিন্তু আপনি যদি ক্ষমা না করেন, তবে আমাদের গতি কি হইবে? স্বকৃত কর্ম্মের ফলে আমরা নানারূপ শাস্তি বা অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করি, তাহাতে আমার বিন্দুমাত্র ক্ষোভ নাই; কিন্তু আমি আপনার প্রাণে ব্যথা দিয়াছি, আমার এ অনুতাপ কিছুতেই নিবৃত্ত হইতেছে না। সর্ব্বদাই যেন হৃদয় হু হু করিয়া জ্বলিতেছে। এই তিন দিনের মধ্যে এক মুহূর্ত্তও আমার শান্তি নাই। এখন ভাবিয়া দেখিলাম, আপনার সুশীতল চরণ আশ্রয় ভিন্ন আমার এ জ্বালা জুড়াইবার আর অন্য উপায় নাই। আপনি প্রসন্নচিত্তে কৃপা করিয়া যদি আকর্ষণ না করেন, তবে নিকটে যাইবার আমার ক্ষমতা হইবে না। আপনার অভয় বাণী হৃদয়ে অনুভব করিবামাত্রই পুরী রওনা হইব!" ইত্যাদি নানাবিধ কারুণ্যপূর্ণ পত্রখানি পাইবামাত্র বাবাজী মহাশয় যেন কেমন একপ্রকার হইয়া গেলেন। চোখের জলে মুখবুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। এতই অস্থির হইয়া পড়িলেন যে, অনেকরূপ চেষ্টা করিয়াও পত্রখানি পড়িয়া শেষ করিতে না পারায়, অগত্যা একজন সঙ্গীকে পড়িতে বলিলেন। সঙ্গীটী সাশ্রুগদগদকণ্ঠে পত্রখানি পড়িতে লাগিলেন, আর অপরাপর সঙ্গিগণ কাঁদিয়া অধীর হইতে লাগিলেন। সকলেরই মনে এমন উৎকণ্ঠা হইয়াছে যে, যদি সম্ভব হয় ত এই মুহূর্ত্তে রামদাদাকে আনিয়া ইঁহার সহিত মিলন করান। সকলের উৎকণ্ঠাতেই হউক বা গুরুদেবের আকর্ষণেই হউক, সাতদিনের দিন রামদাদা পুরী আসিয়া বলরাম বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইবামাত্র বলরামবাবু গিয়া বাবাজী মহাশয়কে বলিলে, ইনি অনতিবিলম্বে উহাকে মঠে লইয়া আসিতে আজ্ঞা দিলেন। আজ্ঞা পাইয়া বলরামবাবু এবং অন্যান্য কয়েকজন গিয়া রামদাদাকে মঠে লইয়া আসিলেন। রামদাদা মঠে প্রবেশ করিয়া, বাবাজী মহাশয়ের দর্শন পাইবামাত্র

একেবারে সাষ্টাঙ্গে ভূমিতলে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। ইনিও বৎসহারা গাভীর ন্যায় ছুটিয়া গিয়া উঁহাকে আলিঙ্গন প্রদানে হৃদয়ের অভিমান, অনুতাপ, বিরহ-জ্বালা প্রভৃতি দূর করতঃ শান্তি-সুধা সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। আঁধারের পর আলো, দুঃখের পর সুখ, বিরহের পর মিলনটী বড়ই মধুর, বড়ই চিত্তাকর্ষক, বড়ই আনন্দপ্রদ হইয়া থাকে। আজ তাহাই হইল, উভয়ের চোখের জলে উভয়ে সিঞ্চিত। উভয়ের স্পর্শে উভয়ে বিভোর। কিছুক্ষণ পরে রামদাদা একটু ধৈর্য্য ধারণ পূর্ব্বক সাশ্রুগদগদকণ্ঠে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন—"সামান্য অপরাধ বা দোষ গ্রহণ করিয়া যদি তাড়াইয়া দেওয়াই মতলব ছিল, তবে আর প্রথমে অত সাদা মানুষের মত ব্যবহার করিয়া আকর্ষণ করিবার দরকার ছিল কি?"

বাবাজী। না ভাই! এ ত অপরাধের জন্য নয়! বা আমি নিজে মনে কোনওরূপ দুঃখ করিয়া যে তোমাদিগকে শাসন করিয়াছিলাম, এ কথা মনে করা তোমাদের ভুল। আমার বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, কাহারও কোন ব্যবহারে যদি কাহারও মনে কোনরূপ সন্দেহ হয় বা দোষবুদ্ধি আসে, তবে সেই ব্যক্তির নিকট খোলাপ্রাণে বলিলেই পরস্পরের মঙ্গল হয়। তোমাদের মনে যে যে সন্দেহগুলি উদয় হইয়াছিল, নিজেরাই সিদ্ধান্ত না করিয়া একবার আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেই আমার মনের ভাব বেশ বুঝিতে পারিতে। তোমাদের প্রধান সমস্যা হইয়াছিল—আমি শ্রাদ্ধ করিয়াছি, কেমন তাই নয়?

রাম। হ্যাঁ, তাই বটে।

বাবাজী। তাই ত বলি, জিজ্ঞাসা করিলেই প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে পারিতে। যাক্, এখন সাদা কথায় বুঝ যে, কর্ম্মকাণ্ডের শ্রাদ্ধে এবং এই শ্রাদ্ধে কত পার্থক্য। কর্ম্মকাণ্ডের শ্রাদ্ধ, মন্ত্র এবং আচারগত। আর এই শ্রাদ্ধ ভক্তিবিশ্বাসগত। খালি ডোঙ্গা, খোলা বা তিল-তুলসী দেখিয়াছ বলিয়াই তোমাদের শ্রাদ্ধ বলিয়া ধারণা হইয়াছে। মূলতঃ, এইটী কেবল পিতা, মাতা, ভাই, ভগিনী, প্রভৃতি ধামান্তরগত বা দেহান্তরগত ব্যক্তিগণকে

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ সমর্পণ মাত্র। যতদিন পর্য্যন্ত এই স্থূল দেহে বর্ত্তমান থাকা যায়; ততদিন পর্য্যন্ত দেবতা, পিতৃ এবং ঋষিবর্গের নিকট ঋণি থাকিতে হয়। উঁহারা সকলেই প্রার্থনা করেন যে, আমাদের বংশে কোনও একজন যদি বৈষ্ণব হইত, তাহা হইলে আমাদের আশা পূর্ণ হইত। কারণ বৈষ্ণবগণ যে সমস্ত পরমার্থ সম্পত্তি উপার্জ্জন করেন, ঐ সম্পত্তির এক এক অংশ উঁহাদের প্রাপ্য; সুতরাং মহাপ্রসাদ, নাম বা অন্যান্য যে কোন উপাদেয় অপ্রাকৃত বস্তু প্রাপ্ত হইলে, তাহার কিঞ্চিৎ উঁহাদের উদ্দেশ্যে প্রীতির সহিত স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সমর্পণ করা উচিত। পরমার্থরাজ্যের কথা ত দূরে থাকুক, প্রাকৃত সংসারেও যদি কেহ কোন ভাল দ্রব্য প্রাপ্ত হয়, তবে তাহা আত্মীয়স্বজনগণকে না দিয়া একাকী গ্রহণ করিয়া থাকে কি? ভুলক্রমে গ্রহণ করিলেও লোকে তাহাকে অকৃতজ্ঞ বলিয়া ঘৃণা করে। তাই বলি, অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা করিলে ভক্তির হানি হয়। ইত্যাদি নানারূপ উপদেশ দ্বারা সকলের মনের সন্দেহ দূর করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয়বার শ্রীধাম বৃন্দাবন যাত্রা

এইরূপে পরমানন্দে নানা লীলাখেলায় দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। একদিন শ্রীধামবৃন্দাবন হইতে বনমালী রায় বাহাদুর একখানি পত্র লিখিলেন। পত্রখানির মর্ম্ম এই—"দাদা! আপনি শ্রীধাম হইতে যাওয়া অবধি আমাদের মন বড়ই খারাপ। শ্রীহরিচরণ দাস বাবাজী, শ্রীমাধবদাস বাবাজী প্রভৃতি আপনার বিরহে বড়ই কাতর হইয়াছেন। আমাদের মন যেন সর্ব্বদা আপনার জন্য উৎকণ্ঠিত হইতেছে। কোন লীলা বা সেবা কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে পারিতেছি না। আপনি দয়া করিয়া যত শীঘ্র হয় শ্রীধামে চলিয়া আসিবেন। আমি দুই তিন দিন মধ্যে পাথেয়সহ লোক পাঠাইতেছি। বিশ পঁচিশ জন

সঙ্গিসহ অবশ্য আসিবেন, কোনও মতে অন্যথা করিবেন না।" পত্রখানি পাঠ করিয়া ইনি একটু মৃদু হাসিতে হাসিতে সকলকে শুনাইতে লাগিলেন।

ললিতাদাসী বলিল—"আজ্ঞে! সত্য সত্যিই কি সম্প্রতি আবার বৃন্দাবন যাওয়া হইবে?"

বাবাজী । বৃন্দাবনেশ্বরী রাধারাণী জানেন। আমি ইচ্ছা করিলেও হইবে না, কেহ টাকা পাঠাইলেও হইবে না।

ললিতা । তবুও নিজের একটা স্বাধীন ইচ্ছা রহিয়াছে ত?

বাবাজী । সে স্বাধীন ইচ্ছাও যে ভগবানের ইচ্ছার অধীন, এইটী সর্ব্বদা জানিতে হইবে। আমার স্বাধীন ইচ্ছায় বেশ কার্য্য চলিতেছে। আমি যেমন মনে করিলাম যে, আমার বুদ্ধি বা বিদ্যার কৌশলে আমি এই কার্য্যটী শেষ করিয়াছি বা করিতেছি, অমনি ভগবান্ তাঁহার নিজের ইচ্ছাটীকে একটু সরাইয়া ফেলিবামাত্র আমার স্বাধীন ইচ্ছা অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িল। তবে বল, এই যে মারফতদারী স্বাধীনতা, এই স্বাধীনতার বলেই কি আমি শ্রীধামে যাইবার সঙ্কল্প করিব? নিতাইচাঁদের ইচ্ছা হয় লইয়া যাইবেন, না হয় না লইবেন, আমার কি?

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর ইনি শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শনে গমন করিলেন। তিন চার দিন পরে একদিন বেলা আন্দাজ নয়টার সময় নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাবাজী মহাশয় উঁহাকে দেখিবামাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হে বটু! এ সময় কোথা হইতে আসিলে?"

বটু । আজ্ঞে! শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে।

বাবাজী । কেন, বৃন্দাবন ছাড়িয়া এ সময় আসিবার উদ্দেশ্য কি?

বটু । আজ্ঞে! বনমালী রায় সদলে আপনাকে লইয়া যাইবার জন্য পাথেয় খরচ সহ আমাকে পাঠাইয়াছেন।

বাবাজী । বেশ হইয়াছে! আগামী কল্য নবগ্রহ পূজার ইচ্ছা হইয়াছিল, নিতাইচাঁদ মিলাইয়া দিলেন।

বটু। আজ্ঞে! গ্রহপূজায় এই টাকা খরচ হইয়া গেলে, বৃন্দাবন যাইবার কি ব্যবস্থা হইবে?

বাবাজী। সে ভাবনা তোমার ভাবিবার প্রয়োজন নাই। একজন ধনী ভক্ত বৃন্দাবন যাইবার পাথেয় খরচ দিলেই যাওয়া হইবে, নচেৎ আর বৃন্দাবনে যাইবার উপায়ান্তর নাই? তবে ত বৃন্দাবনেশ্বরীর কৃপার অপেক্ষা না করিয়া সেই ধনী ভক্তের কৃপা গ্রহণ করিলেই হয়।

বটুদাদা আর কোনও কথা বলিতে পারিলেন না। এদিকে ইনি একজন ভাল ব্রাহ্মণ ডাকাইয়া যোড়শোপচারে নবগ্রহ পূজার একটী তালিকা করতঃ লোক দ্বারা সমস্ত যোগাড় করিতে লাগিলেন। পীঠাপানা প্রভৃতি যত রকম মিষ্ট দ্রব্য জগন্নাথদেবের ভোগে লাগে, নবগ্রহকে মহাপ্রসাদ সমর্পণ মানসে বলরাম বাবুকে বলিয়া সেই সমস্ত ভোগের ব্যবস্থা করাইলেন। আশ্রমেও নানারূপ ভোগের দ্রব্য প্রস্তুত করিতে আদেশ করিলেন। গ্রহগণের প্রত্যেকেরই যোড়শোপচারে পূজা হইবে; সুতরাং নানা বর্ণের বস্ত্র, অলঙ্কার ও পুষ্পাদির সংগ্রহ হইতে লাগিল। যথাসময়ে ব্রাহ্মণগণ যথাবিধি পূজা আরম্ভ করিলেন। খোল করতাল যোগে পূজার স্থান ঘেরিয়া সকলকে নাম করিতে আদেশ করিলে নাম আরম্ভ হইল। ইনি এক একবার ব্রাহ্মণদিগের নিকট গিয়া পূজার এক একটী ক্রম বলিয়া দিতেছেন। ব্রাহ্মণগণ ইঁহার মুখে পূজার ব্যবস্থা শুনিয়া বিস্মিতভাবে পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন—"কি আশ্চর্য্য! আমরা সর্ব্বদা এই সমস্ত কর্ম্মে রত থাকিলেও যে সমস্ত কথা পূজা-পদ্ধতি না দেখিলে আমাদিগের স্মরণ হয় না, ইনি কি না অনায়াসে সেই সমস্ত কথা বলিয়া দিতেছেন! এরূপ সর্ব্বপ্রকার শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ ত আমরা আর কখনও দেখি নাই।" কেহ বলিতেছেন—"গৃহস্থ অবস্থায় ইনি বোধ হয় বিশেষ কর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন। আবার কেহ কেহ বা বলিতেছেন, "আরে রাজার মত বড়লোক; উঁহারা কি পুঁথি দেখিয়া এই কর্ম্মকাণ্ড মুখস্থ করিতে গিয়াছিলেন! এ সমস্ত ভজন-প্রভাবসিদ্ধ মহাপুরুষদিগের জগতের যাবতীয়

বস্তু করামলকবৎ প্রতিভাত হইয়া থাকে।" ইত্যাদি যাঁহার যেরূপ ধারণা, তিনি সেইরূপ অনুমান করিতেছেন, আর নিজ নিজ কার্য্য করিতেছেন। যথাসময়ে পূজা শেষ হইলে আরত্রিকাদি করিয়া দক্ষিণান্ত করাইলেন। এদিকে নাম সমাপ্তি করিয়া ব্রাহ্মণগণের মহাপ্রসাদ সেবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণভোজনান্তে সকলে মহাপ্রসাদ পাইয়া বিশ্রাম করিলেন।

এইরূপ ভাবে দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। বটুদাদা প্রত্যহই বলেন—"আজ্ঞে! বৃন্দাবন যাওয়ার কি হইল, কবে দিন স্থির করিলেন?" ইনি বলেন—"আরে ক্ষেপা! রাধারাণীর ইচ্ছা না হইলে আমি কি করিব? নিজের ইচ্ছায় কি আর বৃন্দাবন যাওয়া যায়?" এইরূপ স্তোভ বাক্যে প্রায় দশ বার দিন কাটিয়া গেল। বটুদাদা বড়ই ভাবিত হইয়াছেন। ইনি যাইবেন কি না তাহা ঠিক বুঝিতে না পারায় বৃন্দাবনে পত্রাদিও দিতে পারিতেছেন না; আবার এক একবার ভাবিতেছেন, যদি না যাওয়া হয়, অথচ টাকাগুলিও খরচ হইয়া গেল, সে ভদ্রলোকই বা কি মনে করিবেন? ইত্যাদি নানারূপ সংকল্প মনের মধ্যে সমালোচনা করিতেছেন। কিন্তু সাহস করিয়া কোনও কথা খোলা ভাবে জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেছেন না। বাবাজী মহাশয়ের কিন্তু এ সমস্ত বিষয়ে খেয়ালই নাই—আত্মানন্দী সর্ব্বদা আনন্দেই আছেন।

একদিন প্রাতঃকালে উঠিয়াই ললিতাদাসীকে বলিলেন,—"দেখ, আজ একটু সকালে ঠাকুরদের ভোগ দিবার যোগাড় করিয়া দাও ত।" তাহাই হইল। দশটার সময় ঠাকুরের ভোগ হইয়া গেলে, ইনি মহাপ্রসাদ পাইয়া জগন্নাথের মন্দিরে গমন করিলেন। ফণী সঙ্গে আছে। মন্দিরে প্রবেশ করিয়াই দেখেন, সকাল ধূপের পর দর্শন খোলা হইয়াছে। দর্শনোৎকণ্ঠায় ব্যগ্র হইয়া জগন্নাথের নিকট যাইবামাত্র মাধব পশুপালক জগন্নাথের প্রসাদী মালা আনিয়া ইঁহার গলায় দিলেন। ইনি তখন করযোড়ে সাশ্রুগদগদকণ্ঠে অর্দ্ধস্ফুটস্বরে জগন্নাথদেবকে কি জানাইলেন, ইনিই জানেন। ক্ষণকাল পরে রত্নবেদী পরিক্রমা করতঃ বাহিরে আসিয়া মন্দিরাভ্যন্তরস্থ সমস্ত দেবদেবীগণকে প্রণাম বন্দনা

করিয়া, লক্ষ্মীদেবীর মন্দিরে গমন করিবামাত্র সেবক পাণ্ডা লক্ষ্মীদেবীর গলার মালা আনিয়া ইঁহার গলায় দিলে, ইনি পূর্ব্ববৎ প্রণাম করতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্ম দর্শন, স্পর্শন ও বন্দনা করিয়া সিংহদ্বারে আসিয়া সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্ব্বক ফণীকে বলিলেন—“দেখ্ ফণী। তুই মঠে গিয়া ললিতাদাসীকে বল্ যে, আমি আজই বৃন্দাবন যাইবার জন্য ষ্টেশনে রওনা হইলাম। তাহারা যেন যত্নপূর্ব্বক ঠাকুরের সেবাদি করে, আমি অল্পদিনেই আবার ফিরিয়া আসিতেছি।”

ফণী বলিল—“আজ্ঞে! আজই হঠাৎ কিরূপে শ্রীধাম ছাড়িবেন? আর যদি যাইতেই হয়, তবে মঠে চলুন; সকলকে বলা কহা করিয়া মঠ হইতে যাইবেন।”

বাবাজী। হ্যাঁরে, আমি কি করিব? আমাকে এই স্থান হইতেই যাইবার জন্য জগন্নাথদেবের আদেশ হইল। আমি চলিলাম, তুই মঠে গিয়া এই সংবাদ দে।

এই বলিয়া ইনি ষ্টেশনাভিমুখে রওনা হইলেন। ফণী অগত্যা মঠে আসিয়া এই সংবাদ দিলে, প্রথমে ললিতাদাসী মর্ম্মাহত হইয়া ক্ষণকাল বিমর্ষভাবে অবস্থানপূর্ব্বক অগত্যা বাবাজী মহাশয়ের ব্যবহারোপযোগী প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ফণীর হাতে দিয়া, যাহাতে ইঁহার সেবার কোনওরূপ ত্রুটি না হয়, সে বিষয়ে বিশেষ যত্ন করিতে বলিয়া উহাকে ষ্টেশনে পাঠাইয়া দিলেন।

বাবাজী মহাশয় ষ্টেশনে গিয়াছেন শুনিয়া বটুদাদা, গোবিন্দদাদা প্রভৃতি সকলেই ষ্টেশনে গমন করিলেন। ফণী এবং রাধাবিনোদ বাবাজী মহাশয়ের ব্যবহার্য্য দ্রব্যসকল লইয়া গেল। পূর্ব্ব হইতেই ললিতাদাসী প্রভৃতি সখীগণকে শেষ রাত্রে সমুদ্রে স্নান করা ভিন্ন মঠের বাহিরে যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কাজেকাজেই উহারা ছাড়া আর সকলেই বাবাজী মহাশয়ের সহিত দেখা করিতে ষ্টেশনে গমন করিলেন। ইঁহার বিরহ সহ্য করিতে পারিবেন না বলিয়া সকলেই কাতর প্রাণে দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলে, ইনি বলিলেন,—

"যে যে আমার সঙ্গে বৃন্দাবন যাইতে ইচ্ছা কর, দুইহাত তুলিয়া একদিকে যাও।" শুনিবামাত্র সকলেই দুই হাত তুলিয়া একদিকে গেল এক জনকে সংখ্যা করিতে বলিলে, সে সংখ্যা করিয়া দেখিল—ইনি ছাড়া পঞ্চাশ জন হইয়াছে। তখন ইনি বটুদাদাকে বলিলেন,—"দেখ, আটখানি কটকের টিকিট করিয়া বাদবাকী সমস্তগুলি কলিকাতার টিকিট কর।" বটুদাদা বলিলেন—"আমার নিকট ত অত টাকা নাই। অনুমান পঞ্চাশ টাকা আছে; কারণ প্রায় সমস্ত টাকাই নবগ্রহ পূজায় খরচ হইয়া গিয়াছে।" ইনি বলিলেন—"আচ্ছা, তোমার নিকট যাহা আছে, তাহা দ্বারা আটখানা কটকের এবং বাকী কলিকাতার টিকিট কর; যাহা অভাব বলরাম দিবে।' তাহাই হইল। টিকিট হইলে সকলে গিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। যথাসময়ে গাড়ী কটক ষ্টেশনে পৌঁছিলে, বাবাজী মহাশয় রামদাদাকে বলিলেন,—"রাম! তুমি ইহাদিগকে লইয়া কলিকাতায় যাও, আমি পাঁচ ছয় দিনের মধ্যে আসিতেছি। যোগেন মিত্র এবং আর আর সকলকে আমার বৃন্দাবন যাওয়ার সংবাদ দিও।" এই বলিয়া বটুদাদা, গোবিন্দদাদা, সীতারাম, রাধাবিনোদ, ফণী প্রেমদাদা ও উদ্ধারণকে সঙ্গে লইয়া ইনি শ্রীরাসবিহারীজীউর মঠে গমন করিলেন। কটকবাসিগণ আজ অযাচিত ভাবে বাবাজী মহাশয়কে পাইয়া পরমানন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। নিত্যানন্দ-সমিতির সেবকবৃন্দ সর্ব্বদাই ইঁহার কাছে থাকিয়া নিজ নিজ মনোভাবানুযায়ী নানারূপ প্রশ্ন করিতেছেন, ইনিও হাসিমুখে সরলভাবে উহাদের সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদানে সর্ব্বসাধারণের আনন্দবর্দ্ধন করিতেছেন। এইরূপে পরমানন্দে ছয় সাত দিন কাটাইয়া সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক কলিকাতা মির্জ্জাপুর মঠে আসিয়া পৌঁছিলেন। অনেকদিন পরে বাবাজী মহাশয় কলিকাতায় শুভাগমন করিয়াছেন, শুনিতে পাইয়া বহু ভক্তগণ আসিয়া নানারূপ ভগবৎপ্রসঙ্গে সংসারের অশেষ জ্বালা যন্ত্রণা মিটাইয়া পরম শান্তি লাভ করিতে লাগিলেন। এদিকে বাবাজী মহাশয় সঙ্গিগণের মধ্যে একজনকে

শ্রীধাম নবদ্বীপ পাঠাইয়া, ইঁহার শিক্ষাগুরু শ্রীযুক্ত গৌরহরি দাস মহান্ত মহারাজকে কলিকাতায় আনাইলেন।

ছয় সাত দিন যায়—একদিন পুলিনদাদাকে ডাকিয়া বলিলেন—"দেখ পুলিন! ষাটজনের উপযোগী একখানি গাড়ী রিজার্ভ করিয়া আইস ত। হাতরাস পর্য্যন্ত রাস্তায় তিন জায়গায় গাড়ী কাটা থাকিবে।"

পুলিন । আজ্ঞে! কোথায় কোথায় গাড়ী কাটা থাকিবে?

বাবাজী । বৈদ্যনাথ, মোগলসরাই এবং বিন্ধ্যাচল।

পুলিন । আজ্ঞে! কবে যাওয়া হইবে?

বাবাজী । কাল হইলেই ভাল হয়, অগত্যা পরশ্ব।

পুলিনদাদা ইঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করতঃ হাওড়া ষ্টেশনে গমন করিয়া দরখাস্ত করিলেন। পর দিবস টাকা জমা দিবার হুকুম হইল। পুলিন দাদা আসিয়া ইঁহাকে বলায় ইনি বলিলেন—"আচ্ছা, কাল টাকা লইয়া যাইও।" নিত্যস্বরূপ প্রভৃতি সকলে পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন, "কি আশ্চর্য্য! একটী পয়সাও ত আমাদের হাতে নাই, নিজে ত পয়সাকড়ি স্পর্শও করেন না; কিন্তু প্রশান্তচিত্তে পুলিনদাদাকে বলিলেন—'আচ্ছা, কাল টাকা নিও।' দেখা যাক্ নিতাইচাঁদের কি খেলা!" আবার কেহ কেহ বলিতেছেন—"আমরা অনেকবার দেখিয়াছি। যখন ইঁহার ইচ্ছা হইয়াছে, তখন কোথা হইতে টাকা আপনা-আপনি আসিয়া পড়িবে।" ইত্যাদি আপন আপন বিশ্বাস অনুরূপ সমালোচনায় সে দিন কাটিয়া গেল। ইঁহার বৃন্দাবন যাইবার কথা শুনিয়া অনেকেই ইঁহার সহিত দেখা করিতে আসিতেছেন। রাত্র অনুমান আটটার সময় যোগেন্দ্র মিত্র মহাশয় ইঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া, রেল ভাড়ার জন্য পাঁচ শত টাকা দিয়া গেলেন।

পরদিবস পুলিনদাদা ঐ পাঁচ শত টাকা লইয়া ষ্টেশনে জমা দিয়া আসিলেন। বাবাজী মহাশয়ের ইচ্ছায় টাকা আসা সম্বন্ধে সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তৎপর দিবস সদলে হাওড়া ষ্টেশনে গিয়া পৌঁছিলে, বহুলোক ইঁহার সহিত

সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। ইনি সকলের নিকট মিষ্ট বাক্যে বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক গাড়ীতে উঠিবামাত্র গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

ট্রেনের মধ্যে খুব নাম হইতে লাগিল। যথাসময়ে বৈদ্যনাথ ষ্টেশনে পৌঁছিয়া গাড়ী কাটা রহিল। যাঁহারা বৈদ্যনাথ দর্শন করেন নাই বা দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে দর্শনে যাইবার আদেশ করিলেন। এদিকে ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী একটী স্থানে ঠাকুরের ভোগের যোগাড় হইতে লাগিল। ইঁহারাও স্নান আহ্নাকাদি শেষ, করতঃ "জয় জয় নিত্যানন্দাদ্বৈত" কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। গতবারে বৃন্দাবন যাইবার সময় বৈদ্যনাথ অবস্থানকালে পাণ্ডা পূজারী প্রভৃতি বহু ভক্তবৃন্দের সহিত ইঁহার পরিচয় হইয়াছিল; সুতরাং এবার গাড়ীতে থাকিলেও অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ইঁহার আগমনবার্ত্তা সহরে প্রচার হইয়া পড়িল। অনেক ভক্তগণ আসিয়া নামে যোগ দিতে লাগিলেন। প্রায় আড়াই ঘণ্টা সময় খুব মাতামাতি সংকীর্ত্তন করিয়া সংকীর্ত্তন সমাপ্তি করতঃ মহাপ্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক গাড়ীর মধ্যে গিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। যথাসময়ে বৈদ্যনাথ হইতে গাড়ী ছাড়িয়া পরদিবস মোগলসরাই ষ্টেশনে পৌঁছিয়া গাড়ী কাটা রহিল। ষ্টেশনের পার্শ্ববর্ত্তী একটী মাটকোঠার নীচে ঠাকুরের ভোগরাগের যোগাড় হইল। যথাসময়ে ভোগ হইয়া গেলে সকলে মহাপ্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক ঐ গাড়ীতেই কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলেন। সন্ধ্যার সময় গাড়ী পূর্ব্ববৎ ইঁহাদিগের গাড়ী লইয়া বিন্ধ্যাচলে পৌঁছিয়াই গাড়ী কাটিয়া রাখিয়া গেল। ইনি সকলকে বলিলেন,—"দেখ, মা বিন্দুবাসিনীকে দর্শন করিতে যাহার ইচ্ছা হয় যাইতে পার, আমি কিন্তু একাকী যাইব।" তাহাই হইল। সকলে মা বিন্দুবাসিনীকে দর্শন করিয়া আসিলেন। ইনি সেই স্থানেই বসিয়া রহিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ-সন্তান প্রভুপাদ শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী সস্ত্রীক ইঁহার সঙ্গে রহিয়াছেন। ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী একটী বাগানে ঠাকুরের ভোগরাগের ব্যবস্থা হইতে লাগিল। মা গোস্বামিনী প্রভুপাদকে বলিলেন,—"আমার বড় ইচ্ছা হয় যে, এই বনের মধ্যে আমি নিজহস্তে রাঁধিয়া সকলকে খাইতে দিই।" প্রভুপাদ এই কথা

বাবাজী মহাশয়কে জানাইলে, ইনি বলিলেন—"এত আমাদের পরম সৌভাগ্য, তবে বহু লোক সঙ্গে—এত রান্না করিতে মায়ের কষ্ট হইবে যে!" মা গোস্বামিনী মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—বাবা! ছেলেদের খাওয়াইতে মায়ের কি কখনও কষ্ট হয়?" বলিয়া রান্না করিতে আরম্ভ করিলেন। এদিকে বাবাজী মহাশয় মা বিন্দুবাসিনীকে দর্শন করিতে গিয়ে মায়ের শ্রীচরণ দর্শন করতঃ, বিভোর ভাবে সেই স্থানে বসিয়া আছেন। বেলা অতিরিক্ত হইয়াছে, তবু আসিবার কথা মনে নাই। এক একবার মাকে দর্শন করিতেছেন, আর নয়নধারায় ইঁহার মুখবুক ভাসিয়া যাইতেছে। অর্দ্ধস্ফুট স্বরে আপন মনে মায়ের নিকট কি যে বলিতেছেন, তিনিই জানেন। এদিকে মা গোস্বামিনীর রান্না শেষ হইয়া গেল, তবুও ইনি আসিতেছেন না দেখিয়া একজন অনুসন্ধানে গিয়া দেখেন যে, ইঁনি বিমুগ্ধভাবে মায়ের সম্মুখে বসিয়া আছেন।

সঙ্গিটী নিকটে গিয়া বলিলেন—"আজ্ঞে! বেলা অতিরিক্ত হইয়াছে, মা গোস্বমিনীর বড়ই কষ্ট হইতেছে। সেবা করিবেন চলুন।" বাবাজী মহাশয় যেন চকিতের ন্যায় বলিলেন—"তাই ত অনেক বেলা হইয়াছে! আচ্ছা চল চল।" বলিয়া বাগানে আসিলেন। বাবাজী মহাশয়ের ইচ্ছা যে, প্রভুপাদকে, ইঁহার গুরুদেবকে এবং আর আর যে কয়েক মূর্তি বৈষ্ণব সঙ্গে আছেন, তাহাদিগকে সেবা করাইয়া তবে নিজে বসিবেন; কিন্তু তাহা হইল না। মা গোস্বামিনী এবং প্রভুপাদের বিশেষ আগ্রহে ইঁনিও সেই সঙ্গে বসিলেন। মহাপ্রসাদ পাইতেছেন, আর যেন আনন্দের পাথার বহিয়া যাইতেছে। মা গোস্বামিনী আনন্দে বিভোর হইয়া এক একটী জিনিষ পরিবেশন করিতেছেন, আর ইনি সাশ্রুগদগদকণ্ঠে বলিতেছেন, "মা! আমার যেন সীতা ঠাকুরানী, বনের মধ্যে রান্না করিয়া লব-কুশাদিকে নিজহস্তে বাৎসল্য করিয়া খাওয়াইতেছেন।" এরূপ পরমানন্দে মহাপ্রসাদ সেবা হইয়া গেল। কিছুক্ষণ সেই বাগানেই বিশ্রাম করিয়া সন্ধ্যার সময় সকলে গাড়ীতে উঠিলে বটুদাদা

জিজ্ঞাসা করিলেন—"আজ্ঞে! আর কোথাও গাড়ী রাখা হইবে কি?" বাবাজী মহাশয় বলিলেন,—"না একেবারে হাতরাস চল।"

এই কথা শুনিয়া বটুদাদা বৃন্দাবনে গণেশ ভট্টাচার্য্যকে এই মর্ম্মে একখানি টেলিগ্রাম করিলেন যে, "বাবাজী মহাশয় ষাট্ সত্তর জন লোক সঙ্গে শ্রীধাম বৃন্দাবন যাইতেছেন। আগামী কল্য সন্ধ্যার সময় গিয়া পৌঁছিবেন, তোমরা ষ্টেশনে প্রস্তুত থাকিবে।" এদিকে গাড়ী যথাসময়ে হাতরাস পৌঁছিলে, সে স্থানে ঠাকুরদের সামান্য কিছু ভোগের ব্যবস্থা করিয়া বৃন্দাবনের গাড়ীতে উঠিলেন। বৃন্দাবনের গাড়ীতে উঠিয়াই যেন ইঁহার মনপ্রাণের ভাব অন্যরূপ হইয়া গেল। কেমন যেন আনমনা ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঠিক সন্ধ্যার সময় গাড়ী বৃন্দাবনে পৌঁছিল। শ্রীযুক্ত রামহরিদাস বাবাজী, শ্রীযুক্ত মাধবদাস বাবাজী প্রভৃতি অনেক মূর্ত্তি বৃন্দাবনবাসী মহাত্মা বৈষ্ণব ষ্টেশনে ইঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। যেমন গাড়ী থামিল অমনি উভয় দিক হইতে" রাধে রাধে" ধ্বনি উত্থিত হইয়া সর্ব্বসাধারণের মনপ্রাণ মাতাইয়া তুলিল। ইঁহারা গাড়ী হইতে নামিয়া সকলকে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ করিবামাত্র শ্রীযুক্ত রামহরিদাস বাবাজী মহাশয় বাবাজী মহাশয়কে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন। এইরূপভাবে সকলের সহিত প্রেমালিঙ্গন, প্রীতি-সম্ভাষণ, দণ্ডবৎ প্রণতি যথাযোগ্য ব্যবহার সম্পাদন করতঃ সকলের সঙ্গে গঙ্গাজীউর মন্দিরে গমন করিলেন।

প্রথমবার অপেক্ষা এবার যেন বাবাজী মহাশয় একটু গম্ভীর ভাব অবলম্বন করিলেন। গঙ্গাজীউর মন্দিরে উপস্থিত হইয়া কিছুকাল পরে মহাপ্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় অটলদাদা বলিলেন—"আজ্ঞে! আজ কয়েক দিন হইতেই কালীয়দহের শ্রীযুক্ত জগদীশদাস বাবাজী মহাশয় আপনাকে দেখিবার জন্য বড়ই উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন।" শুনিবামাত্র ইনি উদ্দেশে প্রণাম করিয়া আনন্দিত মনে বলিলেন—"আচ্ছা, কাল'ই তাঁহাকে দর্শন করিতে যাওয়া যাইবে।" তাহাই হইল। পরদিবস প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ

করিয়া কালীয়দহে গমন করিলেন। শ্রীযুক্ত রামহরিদাস বাবাজী, শ্রীযুক্ত মাধবদাস বাবাজী মহাশয় প্রভৃতি কয়েকজন মহাত্মা সঙ্গে আছেন। কালীয়দহের নিকটবর্ত্তী হইতে না হইতেই দেখেন যে, শ্রীযুক্ত জগদীশদাস বাবাজী মহাশয় আসিতেছেন। রাস্তায় পরস্পরের মিলন হইবামাত্র দণ্ডবৎ প্রণতি, প্রেমালিঙ্গনাদি সমাপনান্তে বাবাজী মহাশয় বলিলেন—"বাবা! কোথায় যাইতেছিলেন?"

জগদীশ। বাবা! আমি তোমার নিকটেই যাইতেছিলাম। তুমি আসিয়াছ শুনিয়া কাল রাত্রেই আমি যাইব মনস্থ করিয়াছিলাম। ভাল হইল, তুমি নিজেই আসিলে, আর এই বৃদ্ধের যাইতে হইল না।

বাবাজী। কেন বাবা! আমি ত আপনার সন্তান; হুকুম করিলেই ত হয়, আপনার কষ্ট করা কেন? আমি কাল রাত্রেই আপনার দর্শনে আসিতাম; কিন্তু অনেক রাত্র হইয়াছিল। পাছে আপনার ভজনের ব্যাঘাত হয়, তাই আসিলাম না।

জগদীশ। বাবা! আমার দুই একটী কথা বলিবার আছে।

বাবাজী। আজ্ঞা করুন! এ দাস ত আপনাদেরই।

জগদীশ। বাবা! নিতাইচাঁদের নিকট আমার অপরাধ হইয়াছে।

বাবাজী। (চমকিত ভাবে) সে কি বাবা!

জগদীশ। প্রথমবার তুমি যখন বৃন্দাবনে আসিয়াছিলে তখন শ্রীখুন্তি সম্বন্ধে একটী গোলযোগ উপস্থিত হয়। সে কারণ অনের লোক আসিয়া আমার নিকট অভিযোগ করায় আমি বলিয়াছিলাম যে,—"গোস্বামিপাদগণের অমর্য্যাদা করিয়া এরূপ কার্য্য করা চরণের বড়ই অন্যায় হইয়াছে! আমি তাহাকে ডাকাইয়া বিশেষ শাসন করিয়া দিব।" কিন্তু সে যাত্রায় হঠাৎ তুমি গৌড়মণ্ডলে চলিয়া গেলে; পুনরায় আর তোমার সহিত দেখাশুনা বা কোনও কথাবার্ত্তা হয় নাই। তৎপরে বিশেষ প্রাজ্ঞলোকের নিকট শুনিয়াছিলাম যে—শ্রীধামপুরীর রাজগুরু শ্রীপাদ রঘুনাথদেব গোস্বামী প্রমুখ কয়েক মূর্ত্তি সম্ভ্রান্ত নিত্যানন্দ সন্তান এবং অদ্বৈত সন্তান গোস্বামিপাদগণ তাঁহাদের নিজ নিজ

খুন্তি তোমার হাতে দিয়া তোমাকে নাম প্রচার করিবার আদেশ করিয়াছেন। কাজেই আমি নিতাইচাঁদের নিকট ঘোর অপরাধী হইয়াছি। সেই হইতেই আমার মনে বড়ই অশান্তি হইয়াছে। কারণ নিতাইএর নিকট অপরাধী হওয়াও যা, তুমি তাঁহার দাস, তোমার নিকট অপরাধী হওয়াও তাই। অতএব বাবা! তুমি আমায় ক্ষমা কর।

বাবাজী ! নিতাই, নিতাই! বাবা! আমি আপনার সন্তান। ঐরূপ কথা বলিয়া আমাকে অপরাধী করা কি আপনার উচিত?

এই বলিয়া উঁহার চরণ ধারণপূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। জগদীশ দাস বাবাজী মহাশয়ও ইঁহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন প্রদানপূর্ব্বক গদগদকণ্ঠে বলিলেন—"বাবা! আমি তোমার সরল ব্যবহারে বড়ই প্রীতিলাভ করিলাম। আশীর্ব্বাদ করি, নামপ্রচার দ্বারা জগতের জীবগণকে পরমার্থপথে অগ্রসর করাও। আমায় একটু নাম শুনাইবে না? বাবাজী মহাশয় "এ ত আমার পরম সৌভাগ্য" বলিয়া পদ ধরিলেন—

জয়রে জয়রে জয়, ঠাকুর শ্রীনরোত্তম, প্রেমভকতি মহারাজ।
যাঁকো মন্ত্রী, অভিন্ন কলেবর, রামচন্দ্র কবিরাজ।।

প্রেম-মুকুট মণি, ভূষণ ভাবাবলী, অঙ্গহি অঙ্গ বিরাজ।
নৃপ আসন, খেতুরি মহা বৈঠত, সঙ্গহি ভকত সমাজ।।
সনাতন রূপকৃত, গ্রন্থ শ্রীভাগবত, অনুদিন করত বিচার।
রাধামাধব, যুগল উজ্জ্বলরস, পরমানন্দ সুখসার।।
শ্রীসংকীর্ত্তন, বিষয়রস উনমত, ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি জান।
যোগদান ব্রত, আদি ভয়ে ভাগত, রোয়ত করম গেয়ান।।
ভাগবত শাস্ত্রগণ, যো দেই ভকতিধন, তাক গৌরব করু আপ।
সাংখ্য মীমাংসক, তর্কাদিক যত, কম্পিত দেখি পরতাপ।।
অভকত চৌর, দুরহি ভাগি রহু, নিয়ড়ে নাহি পরকাশ।
দীন হীন জনে, দেয়ল ভকতি ধনে, বঞ্চিত গোবিন্দদাস।।

প্রায় আধঘণ্টা ধরিয়া এই পদটী কীর্ত্তন হইল। জগদীশ বাবাজী মহাশয় পরমানন্দিত চিত্তে ইহাকে আলিঙ্গনপ্রদানপূর্ব্বক গিরিধারীর কিঞ্চিৎ পেড়ামহাপ্রসাদ আনিয়া দিলেন। সকলেই হৃষ্টচিত্তে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ মহাপ্রসাদ গ্রহণ করতঃ বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

একদিন সকাল বেলা বাবাজী মহাশয় গঙ্গাজীউর মন্দিরের উপরতলায় বসিয়া আছেন, এই সময় গণেশ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আচ্ছা! বৈষ্ণবেরা দেবদেবী মানে না কেন?"

বাবাজী। কে বলিল ভাই! বৈষ্ণবেরা দেবদেবী মানে না?

"ব্রাহ্মণ আচণ্ডাল কুক্কুরান্ত করি।
দণ্ডবৎ করিবেক বহু মান্য করি।।
এই সে বৈষ্ণব ধর্ম্ম সবারে প্রণতি।
সেই ধর্ম্মধ্বজী যার ইথে নাহি মতি।।"

এই বাক্যটি যে ধর্ম্মের মূল ভিত্তি, সেই ধর্ম্মে কি কাহাকেও না মানিলে চলিতে পারে?

গণেশ। কেন, বৈষ্ণবেরা বলে যে, নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় "প্রেম ভক্তি চন্দ্রিকায়" বলিয়াছেন—"সাধুসঙ্গে কৃষ্ণসেবা, না পূজিবে দেবীদেবা, এই ভক্তি পরম কারণ।" অন্যত্র—"হৃষীকে গোবিন্দসেবা, না পূজিবে দেবীদেবা, এই ত অনন্যভক্তি কথা।" ইত্যাদি। তবেই ভাবিয়া দেখুন, এই কথায় দেবদেবীর উপর দ্বেষভাব প্রকাশ পাইল না কি?

বাবাজী। যে বাক্য বলিতে হয় তাহার পূর্ব্বাপর বিচার না করিয়া বলিলে দোষ ঘটে। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের যে বাক্য দুইটির উল্লেখ হইল, এই বাক্যদ্বয় অনন্যভক্তি কথার প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে। একটি হৃদয়ে বা মনে এককালীন সমভাবে বস্তুদ্বয়ের উপলব্ধি হইতে পারে না। এই কারণ আচার্য্যগণ প্রবর্ত্তক এবং সাধকদিগকে পুনঃ পুনঃ সাবধান করিয়াছেন, যেন তাহাদের নিষ্ঠা ভঙ্গ না হয়। নিষ্ঠা না থাকিলে ভগবৎপ্রাপ্তিই অসম্ভব। স্বাভাবিক কথায় একটা

দৃষ্টান্ত দেখ, শাস্ত্রে আছে—"পতিব্রতা স্ত্রীলোকের পতিই পরম গুরু, পতিই একমাত্র সেব্য, পতিছাড়া অন্য পুরুষের মুখাবলোকন করিলে তাহার ধর্ম্ম নষ্ট হইবে। পতির উচ্ছিষ্ট ভিন্ন গ্রহণ করিবে না।" ইত্যাদি যে সমস্ত বাক্য পতিব্রতার প্রতি বলা হইল, ইহাতে কি বুঝিতে হইবে যে, বিবাহ হইবামাত্র পিতা, মাতা, শ্বশুর, শ্বাশুড়ী, ভাসুর, দেবর প্রভৃতির সেবাশুশ্রূষা আদরযত্ন পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র স্বামীকেই সেবা করিবে? এইরূপ অনর্থ ঘটিবে এই ভয়েই শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় স্থানান্তরে বলিয়াছেন—"সর্ব্বদেব পূজিবে না হবে তৎপর। সবার নিকট মেগে লবে ইষ্ট ভক্তি বর।" যেমন স্ত্রীলোকের স্বামীসেবাই একমাত্র লক্ষ্য, অর্থাৎ স্বামীর সম্বন্ধ ছাড়া কাহাকেও ভালবাসা বা স্বামীর যোগ্য আসনে অর্থাৎ সেই জাতীয়ভাবে কাহাকেও দেখাকেই পুরুষান্তর দর্শনের মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। স্বামীর ভালবাসা পাইবার জন্য অথবা তাহাকে সুখী করিবার জন্য শ্বশুর, শ্বাশুড়ী, দেবর ভাসুর, এমন কি—চাকর, চাকরাণী, বিড়াল, কুকুরকে পর্য্যন্ত সেবা করা পতিব্রতা স্ত্রীর পাতিব্রত্যের লক্ষণ। এইরূপ যাঁহারা যে দেবদেবীর উপাসক, তাঁহাদের সেই উপাস্য ব্যতীত তদ্‌জাতীয়ভাবে অন্য যে কোনও দেবদেবীর পূজাকেই নিষেধ করিয়াছেন। যতক্ষণ ধর্ম্মান্তরে, দেবতান্তরে, নামান্তরে বা রূপান্তরে দ্বেষবুদ্ধি থাকিবে, ততক্ষণ তিনি কোন রকমেই শান্তিসুখ বা প্রেমভক্তি লাভ করিতে পারিবেন না, এ কথা ধ্রুব সত্য।

এইরূপ নানাবিধ তত্ত্ব আলোচনার পর সকলেই নিজ নিজ নিত্যকৃত্য করিতে গমন করিলেন।

একদিন বনমালী বাবুর কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার ঘোষ মহাশয় শ্রীরাধাকুণ্ড হইতে গঙ্গাজীউর মন্দিরে বাবাজী মহাশয়ের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাবাজী মহাশয় তখন অনেক লোকের সহিত তত্ত্বকথায় নিমগ্ন ছিলেন। কামিনী বাবু দণ্ডবৎ প্রণাম করিবামাত্র বলিলেন—"কামিনী! কেন আসিয়াছ?"

কামিনী। আজ্ঞে! রাজর্ষি বাহাদুর আপনাকে সদলে শ্রীরাধাকুণ্ডে লইয়া যাইবার জন্য আমাকে পাঠাইয়াছেন।

বাবাজী। আচ্ছা, আগামী কল্য যাওয়া যাইবে।

কামিনী। আজ্ঞে! তাহা হইলে আমি সমস্ত ব্যবস্থা করি?

বাবাজী। ভাই! কোন ব্যবস্থার প্রয়োজন নাই। আমার সঙ্গে শ্রীগুরুদেব এবং কয়েক মূর্ত্তি বৃদ্ধ বৈষ্ণব আছেন, তাঁহাদিগের জন্য দুইখানি গাড়ীর বন্দোবস্ত করিলেই হইবে। আমরা সকলে পদব্রজে গমন করিব।

কামিনী। আজ্ঞে! "তাহা হইলে রাজর্ষি বাহাদুর আমার প্রতি রুষ্ট হইবেন। তিনি বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন যে, যেরূপ বন্দোবস্ত করিলে ও যত গাড়ী করিলে উঁহাদের কোনওরূপ কষ্ট না হয়, সেইরূপ বন্দোবস্তের যেন কোন অন্যথা না হয়।"

বাবাজী। তা বেশ! যিনি গাড়ীতে যাইতে ইচ্ছা করেন, যাইতে পারেন, আমার কোনও আপত্তি নাই; তবে আমি হাঁটিয়া যাইব।

তখন কামিনীবাবু অনেকের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন; কিন্তু কেহই গাড়ীতে যাইতে স্বীকৃত না হওয়ায়, অগত্যা দুইখানি গাড়ীর ব্যবস্থা করিলেন।

পরদিবস যথাসময়ে শ্রীযুক্ত রামহরিদাস বাবাজী, শ্রীধাম পুরীর রামকৃষ্ণদাস বাবাজী, ইঁহার গুরুদেব, কয়েক মূর্ত্তি বৃদ্ধ বৈষ্ণব, জগদীশ বাবু এবং একটি রোগী—এই কয়েকজনকে দুইখানি গাড়ীতে রওনা করিয়া দিয়া, ইনি নাম করিতে করিতে সদলে রওনা হইলেন।

বৃন্দাবন ও রাধাকুণ্ড ইহার মধ্যবর্ত্তী একটি স্থানে ইঁহারা বিশ্রাম করিতেছেন, এই সময় একটি ব্রজবাসী কিছু তেলে ভাজা ফুলরী বিক্রী করিতে যাইতেছিল; বাবাজী মহাশয় উহাকে দেখিবামাত্র ডাকিয়া, উহার সমস্ত জিনিষগুলি ঢালিয়া লইলেন এবং উহার কত মূল্য জিজ্ঞাসা করায়, ব্রজবাসী বলিল—"মহারাজ! আপকা যো খুসী।" তখন ইনি একজন দ্বারা কামিনী বাবুকে বলিয়া উহাকে

আট আনা পয়সা দেওয়াইলেন। মাধবদাস বাবাজী মহাশয় বলিলেন—"দাদা! দুই আনার বস্তু হইবে না, আপনি উহাকে আট আনা দিতেছেন যে?"

বাবাজী। ভাই! এমনি ত আর কিছু দিব না; যাহা হউক, কোন প্রকারে যদি ব্রজবাসীকে কিছু দিতে পারি, তাহাতে অত আপত্তি কেন? ভাবিয়া দেখ, যদি এখানে উহার কিছু প্রাপ্য নাই থাকিবে বা ইহার মধ্যে রাধারাণীর কোন খেলাই না থাকিবে, তবে ও ব্রজবাসী এই বনের মধ্যে আসিবে কেন?

ইত্যাদি নানারূপ কথাবার্ত্তার পর ফুলারী ভোগ দেওয়া হইল। এদিকে বৃন্দাবন হইতে বৈকুণ্ঠদাস বাবাজী মহাশয় আন্দাজ চল্লিশজনের পরিমাণ পুরী, কচুরী, তরকারী ও মিষ্টি প্রভৃতি আনিয়াছিলেন; সুতরাং সকলেই ঐ স্থানে প্রসাদাদি পাইয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করতঃ শ্রীরাধাকুণ্ডে রওনা হইলেন। ইঁহারা সদলে আসিতেছেন শুনিয়া রাজর্ষি, হরিচরণদাস বাবাজী এবং রসিকদাস বাবাজী প্রভৃতি কয়েক মূর্ত্তি ইহাদিগকে আনিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। পরস্পর দেখা হইবামাত্র দণ্ডবৎ নমস্কার প্রতিনমস্কার করিয়া সকলে নাম করিতে করিতে বিনোদের মন্দিরে প্রবেশ করতঃ কিঞ্চিৎ বিশ্রামান্তে মহাপ্রসাদ পাইতে বসিলেন। নানারূপ ইষ্টগোষ্ঠী হইতেছে, এই সময় রাজর্ষি বলিলেন...."দাদা! আমি আশা করিয়াছিলাম যে, আপনি ট্রেন হইতে একেবারে শ্রীরাধাকুণ্ডে বিনোদের মন্দিরে শুভাগমন করিবেন; কিন্তু আমার অদৃষ্টদোষে কেন যে তাহা হইল না আপনি জানেন। যাক্, আজ হইতে আর কোথাও যাওয়া হইবে না, বিনোদের মন্দিরে থাকিতে হইবে।"

বাবাজী। না ভাই! এবার আমি একটু একান্তে কুসুম সরোবরে থাকিব মনস্থ করিয়াছি।

বনমালী। আজ্ঞে! তাহা হইলে আমাদের মনে বড়ই কষ্ট হইবে। বরং একদিন কুসুম সরোবরে যাইয়া ইষ্টগোষ্ঠী করা যাইবে।

বাবাজী। না ভাই! এবার আমার কুসুম সরোবর ছাড়া অন্য কোথাও থাকিবার মন হইতেছে না, আমি কি করিব?

বনমালী। অগত্যা যদি তাহাই হয়, তবে সকলকে বিনোদের প্রসাদ পাইতে হইবে।

বাবাজী। না ভাই! তাহাও হইবে না। কেবল মাত্র সাত আটজনের পরিমাণ মহাপ্রসাদ কুসুম সরোবরে পাঠাইয়া দিও।

বনমালী। আপনার অন্য সঙ্গিগণ কি করিবে?

বাবাজী। কেন, শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়াছে; সকলে মাধুকরী করিবে। আমরা আজই কুসুম সরোবরে যাইব।

বনমালী। আজ্ঞে! তাহা হইলে আমার মনে হইতেছে যে, আমি হয়ত কোন অপরাধ করিয়াছি। তাহা না হইলে একদিনও বিনোদের বাড়ী থাকা হইবে না কেন?

বাবাজী মহাশয় আর কোন উত্তর দিতে না পারিয়া, অগত্যা সে রাত্রি বিনোদের বাড়ী থাকিয়া পরদিবস প্রাতে নাম করিতে করিতে কুসুম সরোবরে গমন করিলেন। যথাসময়ে কুসুম-সরোবরে পৌঁছিয়া রাধাবিনোদ, ফণী, উদ্ধারণ প্রভৃতি কয়েকজনকে প্রত্যহ গিরিরাজ পরিক্রমা করিতে আদেশ করতঃ, অপরাপর সঙ্গিগণকে কুসুম সরোবরের চারিদিক ঝাড়ুগিরি এবং মাধুকরী করিবার আজ্ঞা দিলেন। যথাসময়ে বিনোদের মন্দির হইতে মহাপ্রসাদ আসিয়া পৌঁছিল। শ্রীযুক্ত রামহরি দাস বাবাজী, মাধবদাস বাবাজী, হরিচরণদাস বাবাজী প্রভৃতি কয়েকজন মহাত্মা ইহার সঙ্গেই রহিয়াছেন। বিনোদের যে পূজারী মহাপ্রসাদ লইয়া আসিলেন, বাবাজী মহাশয় তাঁহাকে বলিলেন,—"দেখ বাবা! বনমালীকে বলিবে যে, আর মহাপ্রসাদ পাঠাইবার প্রয়োজন নাই, এস্থানে দাউজী আছেন, যদি কিছু পাঠাইবার ইচ্ছা হয় অমনিয়া পাঠাইবে! এখানে দাউজীর ভোগ হইলে আমরা প্রসাদ পাইব।" এইরূপ পরমানন্দে কুসুম সরোবরে দিনযাপন করিতে লাগিলেন।

একদিন একাদশী; ছত্রির উপর নাম হইতেছে, অপূর্ব্ব নামের ধ্বনিতে

দশদিক্ মুখরিত। কয়েক মূর্ত্তি বৈষ্ণব এবং ভক্ত সঙ্গে করিয়া বনমালী রায় আসিয়া দেখেন যে, নামের ধ্বনিতে সমস্ত কম্পিত হইতেছে। বনমালী রায় মনে ভাবিতেছেন যে, যেরূপ উদ্দণ্ড কীর্ত্তনের রোল উঠিয়াছে, তাহাতে ছত্রির ছাদ টিকিলে হয়! অন্য কোনই আশঙ্কা করি না, তবে বাবাজীদের কোনওরূপ কিছু না হয়! মনে মনে এইরূপ ভাবনা করিতেছেন, ইত্যবসরে বাবাজী মহাশয় নাম করিতে করিতে নীচে আসিয়া গান ধরিলেন—

"গৌরাঙ্গ-প্রেমের ভরে মাতিল নিতাই।
মাতিল নিতাই জগৎ মাতা'ল নিতাই॥
(নিতাই) আপনি পড়িয়া বলে সামাল রে ভাই।" ইত্যাদি।

বহুক্ষণ এইরূপ কীর্ত্তনের পর নাম সমাপ্তি করিয়া সকলের সঙ্গে নানারূপ ইষ্টগোষ্ঠী করিতে লাগিলেন।

একদিন প্রাতঃকালে ফণীকে সঙ্গে করিয়া বনের মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে গোয়ালকুণ্ডে উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন—"এই স্থানটি আমার বলাই দাদার বিশ্রামস্থান। যখন তিনি গোবর্দ্ধনে গোচারণ করিতে আগমন করেন, তখন সুবল ও মধুমঙ্গলকে সঙ্গে করিয়া কৃষ্ণ শ্রীরাধাকুণ্ডে গমন করেন; দাউজী নিজ সঙ্গিগণসহ এই স্থানে আসিয়া বিশ্রাম করেন। আহা মরি, স্থানটির কি মাধুরী! কি অপরূপ শোভা! অদ্যাপি নিত্যলীলা বর্তমান।" বলিতে বলিতে ইহার চক্ষু দুইটি রক্তবর্ণ হইল; একখানি ইট মাথায় দিয়া শয়ন করতঃ ফণীকে বলিলেন, "তুই কুসুম সরোবরে যা; আমি যে এখানে আছি, সাবধান! কাহাকেও যেন বলিস না।" এদিকে সঙ্গিগণ নানাস্থানে বহু অন্বেষণ করিয়াও ইহার সন্ধান না পাইয়া বড়ই ক্ষোভিত হইলেন। বেলা অনুমান চারিটার সময় ইনি ঢুলিতে ঢুলিতে আসিয়া কুসুম সরোবরে উপস্থিত হইবামাত্র সকলে যেন মৃত শরীরে প্রাণ পাইবার ন্যায় গিয়া মিলিত হইলেন। হরিচরণ দাস বাবাজী মহাশয় ইহাকে বলিলেন,—"দাদা! আপনি কোথায় গিয়াছিলেন? আমরা কত খুঁজিয়াছি!"

বাবাজী। ভাই! আমি সামান্য জীব; আমাকেই খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলে না। কৃষ্ণকে কিরূপে বাহির করিবে? রাধারাণী এই কুসুম সরোবরে নিত্যই কুসুম চয়ন করিতে আসেন। আমরা একদিনও তাঁহার দর্শন পাইয়াছি কি? কি করিয়া পাইব? আমাদের সে অনুসন্ধান কোথায়? আমি তো তোমাদের নিকটেই ছিলাম, তোমরা না দেখিলে আমি কি করিব?

ইত্যাদি নানারূপ রসতত্ত্ব-কথার পর ইনি স্নানাদি সমাপনপূর্বক মহাপ্রসাদ পাইয়া বিশ্রাম করিলেন।

একদিন অনেক লোক সঙ্গে ইনি গোবর্দ্ধনের নীচে ভ্রমণ করিতেছেন, আর নানারূপ ভগবৎ-প্রসঙ্গ হইতেছে, এই সময় হরিচরণ দাস বাবাজী মহাশয় বলিলেন,—"দাদা! অনেকদিন হইতে আমি একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব বলিয়া মনে করি; কিন্তু আর বলা হয় না। যদি আদেশ হয় ত আজ বলি।"

বাবাজী। বেশ! স্বচ্ছন্দে বল ভাই!

হরি। আচ্ছা, মহাপ্রভুর প্রচারিত এত নাম থাকিতে আপনি আবার নূতন নাম (ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম) প্রচার করিতেছেন কেন?

বাবাজী। ভাই! নাম ত স্বপ্রকাশ। আমি আর কি প্রকাশ করিব? আচ্ছা তুমি ত পণ্ডিত মানুষ, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি—নিতাই, গৌর রাধে, শ্যাম, হরে, কৃষ্ণ, হরে রাম—এই নামের মধ্যে কোন্ কোন্ নামটি নূতন, একবার আমাকে বুঝাইয়া দাও ত!"

হরি। না দাদা! আমি সে ভাবে নূতনের কথা বলি নাই। আমার বলিবার উদ্দেশ্য এই যে—"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ, হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রীরাধে গোবিন্দ।" এই নাম এবং "নিতাই গৌর রাধে শ্যাম, হরে কৃষ্ণ হরে রাম।" এই নাম একই জিনিষ। পূর্বোক্ত নাম করিলেই ত হয়, আবার নূতন রকমে একটি নাম বাঁধিবার দরকার কি?

বাবাজী। নূতন রকমে বাঁধিবার প্রয়োজনীয়তা একটি সামান্য ভাবে তোমাকে

দেখাইয়া দিতেছি। আচ্ছা, ঐ যে রাখাল বালকগুলি গোচারণ করিতেছে, উহাদিগকে ডাক ত।

হরিচরণদাস বাবাজী মহাশয় রাখালগণকে ডাকিবামাত্র উহারা আসিয়া পৌঁছিলে, বাবাজী মহাশয় হরিচরণ দাস বাবাজী মহাশয়কে বলিলেন,—"উহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামটি বলাও ত।" হরিচরণ দাস বাবাজী মহাশয় বালকদিগকে বলিলেন—"এ ছোড়া! তোম্ লোক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ এই বাত বোল ত? আচ্ছি তরে সে লড্ডু খিলায়েঙ্গে।" এইরূপ তিন চারি বার বলাতে বালকগণের কেহ কেহ কিছু কিছু অসম্বদ্ধ ভাবে বলিতে লাগিল। তখন বাবাজী মহাশয় একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"এ বাচ্চা! নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥ বোল ত।" দুইবার বলাতেই বালকগণ সমস্বরে বলিতে লাগিল দুই চারি বার বলিতে বলিতে বালকগণের মনে কেমন এক প্রকার খেয়াল উদয় হইল। এই নাম বলিতে বলিতে নানারূপ ভঙ্গি করিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। দেখিয়া সকলে অবাক্! তখন বাবাজী মহাশয় হরিচরণ দাসজীকে বলিলেন—"কেমন, দেখিলে ত, এই নাম স্বপ্রকাশ কি না? কলিরাজের প্রভাবে জীবসকলের জিহ্বার জড়তা জন্মিয়াছে; সুতরাং সর্বাগ্রে নিত্যানন্দ পদাশ্রয় পূর্বক নিত্যানন্দ শক্তিলাভ ব্যতীত কোন নাম উচ্চারণের সামর্থ কোথায় পাইবে? দেশ কাল পাত্র অনুযায়ী ব্যবস্থা না হইলে লোকে গ্রহণ করিতে পারে কি?" হরিচরণ-দাসজী বিস্মিত ভাবে বলিলেন—"সত্য সত্যই আপনার কৃপায় আমার বহুদিনের ভ্রম সংশোধন হইল। এতদিন আমি ভুল বুঝিয়াছিলাম। অভিমানই আমাদিগকে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে; কাজেই যথার্থ তত্ত্ব অনুভব করিতে পারি না। প্রত্যেক বিষয়ের গুণ দেখিবার পরিবর্ত্তে দোষ দেখিয়া ফেলি। আপনি কৃপা করুন, যেন প্রত্যেক বস্তুতে ভগবৎ-শক্তি অনুভব বা বিশ্বাস করিতে পারি।" এইরূপ কথাবার্ত্তার পর সকলে কুসুম সরোবরে আসিয়া মহাপ্রসাদ গ্রহণপূর্বক বিশ্রাম করিলেন।

একদিন শ্যামদাদা বাবাজী মহাশয়কে বলিলেন,—"দেখুন! কুসুম সরোবরে

বড়ই চোরের উৎপাত আছে, তাহাতে আবার আপনার সঙ্গে অনেক জিনিযপত্র রহিয়াছে। ব্রজবাসিগণ কখন কখন দলবদ্ধ হইয়া ডাকাতি করে। আমাদের বড়ই ভয় হয়; সুতরাং বনমালীবাবুকে বলিয়া দুইজন বন্দুকধারী সিপাহি আনিলে ভাল হয় না কি? আজ্ঞা হয় ত আমি ব্যবস্থা করি।"

বাবাজী। শ্যামদাস! কোনও ভয় নেই। যে স্থানে সাক্ষাৎ দাউজী বিরাজমান রহিয়াছেন সেস্থানে ভয় কি? আমরা যতদিন এস্থানে থাকিব ততদিন তোমরা নিশ্চিন্ত থাক। আমি পাহারা দিব এইটি ধারণা করিয়া রাখ।

শ্যামদাদা আর কোন কথা বলিলেন না। সেই হইতেই রাত্রে বাবাজী মহাশয় একখানি খাটলির উপর মন্দিরের বাহিরে শয়ন করিয়া থাকিতেন।

একদিন রাত্রে প্রসাদাদি পাইয়া বাবাজী মহাশয় বাহিরে শয়ন করিয়া আছেন, শ্যামদাদা ইহার চরণ সেবা করিতেছেন। রাত্র অনুমান বারটার সময় শ্যামদাদা দেখিতেছেন যে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লাঠি হাতে করিয়া কতকগুলি লোক বার বার যাতায়াত করিতেছে। বাবাজী মহাশয়ের একটু নিদ্রাবেশ হইয়াছে; কাজেই শ্যামদাদা ডাকিতে সাহস পাইতেছেন না; কিন্তু অত্যন্ত ভীত হইয়াছেন। হঠাৎ ইনি উঠিয়া বসিয়া শ্যামদাদাকে বলিলেন—"শ্যামদাস! অত ভীত হইযাছ কেন?"

শ্যাম। আজ্ঞে! লাঠি হাতে করিয়া কতকগুলি লোক বার বার যাতায়াত করিতেছিল দেখিয়া মনে বড়ই ভয় হইয়াছে।

বাবাজী। ভয় কি ভাই! ওসব কিছু নয়—বিভীষিকা মাত্র। তুমি আমার পার্শ্বে একটু শয়ন কর।

এই বলিয়া শ্যামদাদাকে কাছে লইয়া শয়ন করিলেন। কিছুক্ষণ পরে শ্যামদাদা দেখিলেন যে নানারূপ অস্ত্রশস্ত্রধারী দিব্য তেজঃপুঞ্জশালী কয়েক মূর্ত্তি ছত্রীর সম্মুখে এবং বাবাজী মহাশয়কে ঘেরিয়া পাহারা দিতেছেন। উহারা মুখে কোনও কথা না বলিলেও উহাদের অবস্থা দেখিয়াই বোধ হইতেছে, যেন সকলকে অভয়বাণী দ্বারা শান্ত করিতেছেন। সেইদিন হইতে শ্যামদাদা নিশ্চিন্ত

হইলেন। ইহারাও পরমানন্দে কুসুম সরোবরে বাস করিতে লাগিলেন। বৃন্দাবন আগমনের দুইদিন পরেই ইহার শ্রীগুরুদেব কালীবাবুর কুঞ্জে গিয়া রহিলেন।

একদিন ইনি শ্রীগুরুদেবের দর্শন মানসে কালীবাবুর কুঞ্জে গমন করিলেন। ইহাকে দেখিবামাত্র শ্রীযুক্ত রামহরিদাস বাবাজী মহাশয় প্রভৃতি কয়েক মূর্ত্তি বৈষ্ণব আসিয়া উপস্থিত হইলেন, ইনি যথাযোগ্য ভাবে সকলকে দণ্ডবৎ প্রণাম করতঃ সকলকে সঙ্গে লইয়া শ্রীগুরুদেবের দর্শনে গমন করিলেন। যাইয়া দেখেন যে, তখনও তিনি ভজনে আছেন। ইনি আর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া একেবারে গিয়া গুরুদেবের চরণে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিবামাত্র তিনি কোন কথা না বলিয়া পার্শ্বস্থ নিজের লাঠি দ্বারা সজোরে ইহার পৃষ্ঠের উপর তিনটি আঘাত করিলেন। ইনি কিন্তু পূর্ব্ববৎ প্রফুল্লচিত্তে উঠিয়া করযোড়ে উহার সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। উপস্থিত বৈষ্ণবগণ দেখিয়া অবাক্! শ্রীরামহরিদাস বাবাজী মহাশয় বাবাজী মহাশয়ের কাকা গুরু এবং ইহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট, সুতরাং মনে মনে যেন একটু কষ্ট পাইয়াই বলিলেন,—"দাদা! কি করিলেন? যাহাকে আপনি লাঠি মারিলেন, তাহাকে যে আজ জগৎ পূজা করিতেছে!"

গুরুদেব। ও কালিকার যাদবা *উহাকে আবার জগৎ পূজা করে? আজ পর্য্যন্তও বালক-স্বভাব ঘুচিল না, মানুষ হইবে কবে? যা, তোরা গিয়া উহাকে মহাপুরুষ সাজা, আমার ছেলে আমি চিরকাল শাসন করিয়াছি এবং করিব।

আহা মরি কি বিশুদ্ধ বাৎসল্য ভাব! বাৎসল্য ভাব কখনও স্নেহের পাত্রকে মহৎ, বয়স্থ, গুণবান্ বা বলবান্ দেখিতে জানে না। স্নেহের পাত্র চিরদিনই শিশু, চিরদিনই শাসনার্হ। শাস্ত্রাদিতে নন্দ, যশোমতী বা শচী, জগন্নাথ মিশ্র মহাশয়ের যেরূপ বাৎসল্যের কথা শুনা যায়, আজ ইঁহাদের গুরুশিষ্যের ব্যবহারে তাহা প্রত্যক্ষ অনুভূত হইল। মনে কোনরূপ ঐশ্বর্য্যের গন্ধ থাকিতে

---

*। গুরুদেব ইঁহাকে এই নামে সম্বোধন করিয়া থাকেন।

বিশুদ্ধ বাৎসল্য জন্মিতে পারে না। তাড়ন, ভর্ৎসন, শাসন প্রভৃতিই বাৎসল্য রসের জীবন। উহা না থাকিলে রসের পরীক্ষা কোথায়? বাবাজী মহাশয় পুনরায় সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিলে, গুরুদেব ইঁহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করতঃ মস্তক চুম্বন পূর্ব্বক বলিলেন—"আজ কয়দিন হইল একটী সংবাদও দিতে নাই কি? যা, কোন ভয় নাই, আমি ভাল আছি।" আজ্ঞা পাইয়া ইনি শ্রীরামহরিদাস বাবাজী মহাশয় এবং অপর বৈষ্ণব কয় মূর্ত্তির সঙ্গে আসিতে আসিতে বলিলেন,—"কাকা! দেখিলেন, অধমের প্রতি গুরুদেবের কি বিশুদ্ধ বাৎসল্য? কি অকৃত্রিম স্নেহ! এই অহৈতুকী কৃপাই আমার একমাত্র সম্বল। এই কৃপা প্রভাবেই আমার যাহা কিছু।" ইত্যাদি নানাকথাবার্ত্তার পর উঁহাদিগকে দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক ইনি কুসুম সরোবরে রওনা হইলেন।

কুসুম সরোবরে অবস্থান কালে নিত্য নূতন ভাবের তরঙ্গ, নিত্য নুতন প্রেমের খেলায় দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে নৃসিংহ চতুর্দ্দশী আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রাতঃকালে উঠিয়াই বাবাজী মহাশয় সকলকে আদেশ করিলেন, "আজ নৃসিংহ চতুর্দ্দশী ব্রত; সুতরাং নিষ্কণ্টকে ভক্তিপথে অগ্রসর হইবার কামনায় সকলকে নিরম্বু উপবাস করিয়া অষ্টপ্রহর নাম কীর্ত্তন করিতে হইবে। আগামী কল্য নাম করিতে করিতে গিরিরাজ পরিক্রমা করিতে হইবে।" এই বলিয়া নিজে "ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥" এই নাম ধরিলেন। পরমানন্দে নাম চলিতে লাগিল। গগনভেদী নামের রোলে দশদিক্ মুখরিত। সকলেই যেন বাহ্যস্মৃতি-রহিত। সকলেই বিভোর ভাবে নামকীর্ত্তন করিতেছেন আর চোখের জলে উঁহাদের মুখবুক ভাসিয়া যাইতেছে। এইরূপ পরমানন্দে কোথা দিয়া দিনরাত কাটিয়া গেল, কেহই তাহা জানিতে পারিলেন না। পর দিবস প্রাতে গিরিরাজ পরিক্রমায় বাহির হইলেন। পূর্ব্ব হইতে অনেকেই শুনিয়াছেন যে, বাবাজী মহাশয় সদলে নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে গিরিরাজ পরিক্রমা করিবেন; সুতরাং অনেক লোক উপস্থিত হইয়াছেন। স্ত্রী পুরুষে প্রায় তিনশত লোক সঙ্গে করিয়া ইনি

পরিক্রমায় বাহির হইলেন। গিরিরাজের নিকট পৌঁছেয়াই যেন ইঁহার কেমন একরকম অবস্থা হইয়া গেল। আবিষ্টভাবে বলিতে লাগিলেন—

এই সেই গিরিরাজ ভকত প্রধান।
গোধন চরান যাঁহা কৃষ্ণ বলরাম॥
ঝড় বৃষ্টি বজ্রাঘাত বহি নিজ শিরে।
রাখিলেন যিনি অকুণ্ঠিত ব্রজপুরে॥
যাঁর গুপ্ত কুঞ্জ মাঝে যুগল বিলাস।
সহচরীগণ সঙ্গে হাস পরিহাস॥
ইঁহার তটেতে কৃষ্ণের যত লীলা খেলা।
অন্য কুত্রাপিও তত নাহি প্রকাশিলা॥
অদ্যাপিহ গোচারণ করে রাম কানু।
আপন দুর্দ্দৈব দোষে দেখা না পাইনু॥
গিরিরাজ কৃপা কর মো অধম জনে।
নিত্য লীলা স্ফূর্ত্তি হউক তোমার দরশনে॥
কেন বা আছয়ে প্রাণ কি সুখ লাগিয়া।
গোবিন্দ বিরহে কেন না গেল মরিয়া॥
না শুনি মূরলী, লীলা না করি দর্শনে।
কি সুখে আছয়ে ছার শ্রবণ নয়নে॥
পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব।
যমুনায় ঝাঁপ দিয়া পরাণ ত্যজিব॥

বলিতে বলিতে ব্যাকুলিত ভাবে ভূমিতলে গড়াগড়ি দিয়া মাথা কুটিতে লাগিলেন। কাহার সাধ্য যে, ইঁহাকে ধরিয়া রাখে? এক একবার রাধে রাধে বলিয়া ঠিক বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছেন। সঙ্গিগণ বহু চেষ্টা যত্ন দ্বারাও ইঁহাকে স্থির করিতে না পারিয়া বড়ই চিন্তিত হইলেন। অনেক কৌশল ও শুশ্রূষায় প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে কিঞ্চিৎ অর্দ্ধ বাহ্যদশা প্রাপ্ত হইলে,

সকলে ধরাধরি করিয়া ইঁহাকে উঠাইলেন। তখন আবিষ্ট অবস্থায় ভাবগদগদকণ্ঠে নাম করিতে করিতে সে স্থান হইতে রওনা হইয়া দানঘাটে পৌঁছিবামাত্র ইঁহার ভাবান্তর ঘটিল। আর বিরহ নাই; দানলীলা স্ফূর্ত্তি হইল। অমনি পদ ধরিলেন,—

কোথা যাও গোয়ালিনী, কোথা তোমার ঘর।
কিসের পসরা দাসী, মাথার উপর॥
ওলাও পসরা ধনি দেখি ভাল মতে।
আগে সাধি নিব দান তবে দিব যেতে॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোলে পসরা আমার।
কে তুমি তোমার বোলে ওলাব পসার॥
ঘাটের ঘাটিয়াল আমি মহাদানী।
আজি দান দিতে হবে শুন বিনোদিনী॥
ভরম লইয়া থাক না কহিও কথা।
উচিত কহিলে পাছে মনে পাবে ব্যথা॥
দানী কহে ফিরি ফিরি না শুনয়ে রাই।
বাহু পসারিয়া দানী রাখিল তাই॥
যত আভরণ গায় বেশভূষা আছে।
সব লেখা করি দান দেহ মোর কাছে॥
নিতি নিতি গতায়াত কর এই ঠাঁই।
এ পথে মদন রাজ কভু শুন নাই॥
কত ভঙ্গি কথা কহ ভয় নাহি বাস।
রাজ অনুগত জনে হেরি পুন হাস॥
কাহার গরবে যাও দিয়া বাহু নাড়া।
ভূষণ যৌবন ধন সব হবে হারা॥
বংশী কহয়ে বুঝি অরাজক হইল।
পথে বাটয়ারী কর নহিবেক ভাল॥

পথ ছাড় ওহে কানাই কিবা রঙ্গ কর।
যার বাতাস নিতে না পাও তারে করে ধর॥
এখনই মরণ হউক এই ছিল কপালে।
বৃষভানুসুতা তনু ছুঁইবে রাখালে॥
একে সে তোমারে ভালবাসে কংসাসুর।
এ বোল শুনিলে হইবে দেশ হইতে দূর॥
কে তোমায় করিল দানী ফেল দেখি পাটা।
তুমি সে নূতন দানী আমরা নহি টুটা॥
থাকিবা খাইয়া যদি যমুনার পানি।
না ছুঁইও গোপিকার অঙ্গ না হইও দানী॥

কহ লহু লহু, জটিলার বহু, তোমারে সবাই জানে।
কহিতে কহিতে, অনেক কহিছ, এত না গরব কেনে॥
পসরা লইয়া, যাইছ চলিয়া, দানীরে না কর ভয়।
রাজ কাজ করি, দান সাধি ফিরি, হেথা কিবা পরিচয়॥
এরূপ যৌবনে, নানা আভরণে, যাইছ মথুরার দিকে।
বুঝি দান নিব, তবে যেতে দিব, আমি ডরাইব কাকে॥
অমূল্য রতন, করিয়া গোপন, রেখেছ হিয়ার মাঝে।
নিজ ভাল চাহ, খসাইয়া দেহ, ইথে কি আমার লাজে॥
এত কহি হরি, দুবাহু পসারি, রহে পথ আগুলিয়া।
জ্ঞান দাস কয়, না করিহ ভয়, যাহ হাত ঠেলা দিয়া॥

ছি ছি ছুঁইও না নিলাজ কানাই আমরা পরের নারী।
পরপুরুষের পবন পরশে সচেলে সিনান করি॥

গিরি গিয়া যদি গৌরী আরাধহ পান কর কনক ধূমে।
কাম সাগরে কামনা করহ বেণী বদরিকাশ্রমে॥
সূর্য্য উপরাগে, সহস্র সুন্দরী দ্বিজ করে কর সাথ।
তবু হয় নয়, তোমার শকতি, রাই অঙ্গে দিতে হাত॥
গোবিন্দ দাসের, বচন মানহ, না কর এমন ঢঙ্গ।
যোই নাগরী, ও রসে আগরি, করহ তাকর সঙ্গ॥

তোঁহারি হৃদয়, বেণী বদরিকাশ্রম, উন্নত কুচগিরি জোর।
সুন্দর বদন ছবি, কনকধূম পিবি, ততই তপতজীউ মোর॥
সুন্দরী তুঁহুক নিয়ড় অব ছোড়ি।
গৌরী আরাধনে, কাঁহা চলি যায়ব, তুঁহু তিরিথময়ী গোরী॥
মৃগমদ বিন্দু সিন্দুর পরশল এহি সুরজ গ্রহ জান।
তুয়া পদ নখ, দ্বিজরাজহি সোঁপলু, সুন্দরী সহস্র পরাণ॥
কাম সাগরে হাম, সহজেই নিমগন, কামপুরবী তঁহু রাই।
শামের বোলি, চরণে নাহি ঠেলবি, গোবিন্দদাস মুখ চাই॥

তোরা কেউ কিছু বলিস্ না গো, ঘামিয়াছে চাঁদ মুখখানি।
দে দে পসরা আনি, যার লাগি বিকিকিনী, সেই খাউক এই ক্ষীর নবনী,
এত বলি মহাসুখে, তুলে দিল কৃষ্ণমুখে, সখী দিল রাধার বদনে।
ভোজন হইল সায়, আচমন কৈল তায়, প্রসাদ পাইল জনে জনে।
আর আমি ফিরিয়া ঘরে, যাবনারে একেবারে
অঙ্গের আভরণ নে গো খুলে।
সাজায়ে দে শ্যাম দাসী, যা আমি অভিলাষী,
রহি গেলাম এই তরুতলে।

(তোমরা) ঘরে গিয়া এই ব'লো. দান ঘাটে রাই বিকাল,
যার রাধা হইল তাহার।
রাধা নাম ধরি যেন, তিলাঞ্জলি দেয় যেন,
সুশীতল জলে যমুনার॥
এত বলি মহাসুখে, দুঁহু হেরে দুঁহু মুখে,
রসের সায়রে দুঁহু ভাসে।
দুঁহু মুখ সুমাধুরী, হেরিয়ে নয়ন ভরি,
গুণ গায় বৃন্দাবন দাসে॥

(অমনি) শ্যামের বামে দাঁড়াইল নবীনা কিশোরী।
নব জলধরে জনু থির বিজুরী॥
ললিতা বিশাখা আদি যত সখীগণ।
আনন্দে দোঁহার মুখ করে নিরীক্ষণ॥
শ্রীরূপ অনঙ্গ রতি মঞ্জরীর গণ।
(তারা) সময় উচিত দোঁহার করয়ে সেবন॥
শ্যামের বামে কিবা শোভা (রাই) রসের মঞ্জরী।
সখীগণে জয় দেয় দুঁহু রূপ হেরি॥

ইত্যাদি বহু বহু পদের দ্বারা দানলীলা আস্বাদন করিয়া সেস্থান হইতে একেবারে গোবিন্দকুণ্ডে শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীর আসনের নিকট একটী বটবৃক্ষতলে যাইয়া উপবেশনপূর্ব্বক পুরী গোস্বামীর ভজন, গোপাল আগমন ও সেবানিষ্ঠা প্রভৃতি কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। প্রায় একঘণ্টা যায় এই সময় ইঁহার সহিত দেখা করিবার মানসে সিদ্ধ মহাত্মা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মনোহর দাস বাবাজী মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উঁহার দর্শন পাইবামাত্র ইনি সসম্ভ্রমে উঠিয়া দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—"বাবা! আমি ত আপনার দর্শন আকাঙক্ষাতেই এতক্ষণ অপেক্ষা করিতেছিলাম, নিজগুণে কৃপা

করিয়া দর্শন দিলেন! আজ আমি ধন্য হইলাম।" পণ্ডিত বাবাজী মহাশয় প্রতিনমস্কার করিয়া বলিলেন—"বাবা! আমি আপনার দর্শন করিব বলিয়া অনেক দিন হইতেই চেষ্টা করিতেছি; কিন্তু নানা কারণে ঘটিয়া উঠে নাই, আজ রাধারাণী কৃপা করিয়া আনিয়াছেন; সুতরাং অনায়াসে দর্শন ঘটিল। আমিই আজ ধন্য হইলাম।' ইত্যাদি বৈষ্ণবোচিত দৈন্য দ্বারা উভয়ে উভয়ের মর্য্যদা সংরক্ষণ করিলে, বাবাজী মহাশয় পণ্ডিত বাবাজী মহাশয়ের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া নাম করিতে করিতে শ্রীরাঘব পণ্ডিতের গোফা দর্শনে গমন করিলেন। গোফার নিকট উপস্থিত হইয়াই সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করতঃ সেস্থান হইতে জতীপূরা পার হইয়া একেবারে পরিক্রমার প্রশস্ত রাস্তার উপর একটী বৃক্ষমূলে যাইয়া উপবেশন করিলেন। সে স্থানটীর রজ অতি সুন্দর। এত নির্ম্মল এবং স্বচ্ছ যে, বলিয়া শেষ করা যায় না। বাবাজী মহাশয় রজে গড়াগড়ি করিতেছেন দেখিয়া সকলেই গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ এইরূপ আনন্দের পর ইনি শ্রীরামহরিদাস বাবাজী, হরিচরণদাস বাবাজী, মাধবদাস বাবাজী, শ্যামদাস বাবাজী প্রভৃতি মহাত্মাগণের নিকট করযোড়ে বাষ্পগদগদকণ্ঠে বলিলেন—"দেখুন, আপনাদের সকলের নিকট আমার একটি প্রার্থনা—আপনারা সকলেই কৃপা করিয়া আমাকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ রজ ভিক্ষা দিন, যেন আমার মনোবাসনা পূর্ণ হয়; আমি যেন রজ সমাধি লাভ করিতে পারি।" শুনিয়া রামহরিদাস বাবাজী মহাশয় হাসিতে হাসিতে এক অঞ্জলি রজ লইয়া ইঁহার গায়ে দিবামাত্র বৈষ্ণবগণ সকলেই এক এক অঞ্জলি করিয়া রজ দিতে লাগিলেন। 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ"—উঁহাদের দেখাদেখি উপস্থিত ভক্তমণ্ডলী এমন কি ইঁহার সঙ্গিগণ পর্য্যন্ত ইহার গায়ে রজ দিতে লাগিলেন। কণ্ঠ পর্য্যন্ত রজে প্রোথিত হইয়া গেল। মহাপুরুষ হৃষ্টচিত্তে নয়ন মুদ্রিত করিয়া আছেন দেখিয়া হরিচরণদাস বাবাজী মহাশয় আর রজ দিতে নিষেধ করায় সকলেই ক্ষান্ত হইলেন। ইনি তখন আবেশে এরূপ ভাবে ধাম ও রজের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে লাগিলেন যে, শুনিয়া সকলেই বিস্মিতভাবে পরস্পর

বলাবলি করিতে লাগিলেন,—"আমরা অনেকের মুখে রজের এবং ধামের মাহাত্ম্য শুনিয়াছি; কিন্তু এইরূপ ভাবের বর্ণনা আজ পর্য্যন্ত কাহারও মুখে শুনি নাই। আজ আমরা ধন্য হইলাম।" বলিয়া সকলে সেই রজ হইতে এক এক কণা মুখে দিতে লাগিলেন। এইরূপ পরমানন্দে কিছুক্ষণ কাটিয়া গেলে সেস্থান হইতে রওনা হইয়া শ্রীরাধাকুণ্ডে পৌঁছিলেন। ইঁহাদিগকে দেখিবামাত্র বনমালী রায় সসম্ভ্রমে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করতঃ সকলকে বিনোদের মহাপ্রসাদ পাইবার জন্য বিশেষ জেদ করিতে লাগিলে, ইনি বলিলেন "না ভাই! আমরা পরিক্রমায় বাহির হইয়াছি। পরিক্রমা শেষ না হইলে জল গ্রহণও করিব না। তবে তোমার যদি ইচ্ছা হয়, কুসুম সরোবরে মহাপ্রসাদ পাঠাইয়া দিতে পার। আমরা পরমানন্দে গ্রহণ করিব। বলিয়া সেস্থান হইতে কুসুম সরোবরে রওনা হইলেন। যথাসময়ে কুসুম সরোবরে পৌঁছিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর সকলে সরোবরে গিয়া জলকেলি করিতে লাগিলেন। আহা মরি কি আনন্দ! সকলেরই যেন বাল্যভাব। সকলেই সরল বালকের ন্যায় উদার ভাবে নানারূপ ক্রীড়াকৌতুক করিতেছেন। কাহারই বাহ্যস্মৃতি নাই। বাবাজী মহাশয় দুইটি বাহু ঊর্দ্ধে তুলিয়া "রাই জয় জয় রাধে রাধে" বলিতে বলিতে কেবল চরণের সাহায্যে অল্প সময়ের মধ্যে সরোবরের অপর পারে চলিয়া গেলেন। কিন্তু সঙ্গিগণের মধ্যে সাঁতার দিতে বিশেষ নিপুণ ও বলিষ্ঠ চারি পাঁচজন অতি কষ্টে ইঁহার অনেক পরে তথায় গিয়া পৌঁছিলেন। তীর এবং নীরস্থ দর্শকবৃন্দ উপস্থিত ব্যাপার দর্শনে অতিশয় বিস্মিত হইলেন। অনেক সময় এইরূপ ক্রীড়া কৌতুকের পর তীরে উঠিয়া তিলক অহ্নিক করিতেছেন, ইত্যবসরে শ্রীকুণ্ড হইতে বিনোদের নানাবিধ মহাপ্রসাদ আসিয়া উপস্থিত হইল। বনমালী রায়ের আগ্রহে সকলে একত্রে বসিয়া মহাপ্রসাদ পাইতে লাগিলেন। রসময়ের প্রত্যেক বিষয়েই রস ছাড়া কোনও কার্য্য নাই। মহাপ্রসাদ পাইতে পাইতে কতই কৌতুক হইতেছে। ইনি বনমালী বাবুকে বলিলেন—"দেখ ভাই বনমালী!

তুমি যে এত যত্ন করিয়া নানারূপ মহাপ্রসাদ পাওয়াইতেছ, আমি তোমার নিকট ঋণী। তোমার এ ঋণ কিরূপে শোধ করিব?"

বনমালী বাবু করযোড়ে বলিলেন—"দাদা! বিনোদ ত আপনারই, বিনোদের দাসদাসীর নিকট আবার ঋণ কি? অনুগ্রহই দাসের প্রার্থনা। আপনি কৃপা করুন, যেন সাধু বৈষ্ণবের চরণে অক্ষুন্ন রতি মতি থাকে।" ইত্যাদি নানারূপ কথোপকথনের সহিত মহাপ্রসাদ পাওয়া শেষ হইলে সকলে, নিজ নিজ স্থানে গমন করিলেন। ইঁহারাও কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

একদিন বাবাজী মহাশয় প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া স্নান আহ্নিকাদি শেষ করতঃ কুসুম সরোবরের চারিদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে নানাবিধ ফুল তুলিতে লাগিলেন। কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে কোনই উত্তর না দিয়া কেবল বলিতেছেন—"তোমরাও ফুল তোল, দেখিবে কত আনন্দ পাইবে।" এইরূপভাবে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অনেক ফুল তুলিয়া নানারূপ ভাবের মালা ও তোড়া প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে এবং সঙ্গিগণ দ্বারা প্রস্তুত করাইতে লাগিলেন। বেলা অনুমান এগারটার সময় সমস্ত ফুল গাঁথা শেষ হইলে, ফণী, অটল, উদ্ধারণ প্রভৃতি কয়েক জনকে লইয়া রাধাকুণ্ডে গমন করতঃ রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড পরিক্রমা করতঃ বিনোদের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলেন। বনমালী বাবু ইঁহাকে দেখিবামাত্র বলিলেন—"দাদা! এ কি ! এত রৌদ্রে আসা কেন? বড়ই কষ্ট হইয়াছে! আসুন, বিশ্রাম করিবেন।"

বাবাজী। না ভাই! আমার কোনই কষ্ট হয় নাই। আজ আমার বড়ই আনন্দের দিন; কারণ শ্রীমতীর কয়েকগাছি ফুলের মালা ও কয়েকটী তোড়ার প্রয়োজন হওয়ায় এ দাসীর উপরে উহা সংগ্রহের আদেশ হইয়াছিল; তাই আমি লইয়া আসিয়াছি। তুমি বিনোদিনীকে জানাইয়ে তাঁহার আদেশক্রমে বিনোদকে সাজাইয়া দাও। আমরা দাসী, আমাদের আবার কষ্ট কি? প্রাণেশ্বরীর যৎকিঞ্চিৎ আদেশ পাইলেই কৃতার্থ। ভাবিয়া দেখ না, এই প্রখর-কিরণ সূর্য্যের উত্তাপে প্রতপ্ত বালুকার উপর দিয়া শিরীষ-কুসুম-কোমলাঙ্গী প্রাণেশ্বরী আমার

মন্থর গমনে প্রত্যহ এই কুঞ্জে গমনাগমন করিয়া কতই লীলাখেলা আচরণ করিয়া থাকেন।

বলিতে বলিতে দুইটী নয়নজলে ইহার মুখবুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। গদগদকণ্ঠে শ্রীমতীর দিবা অভিসারের দুই একটী পদ গান করিয়া শ্রীকুণ্ডের তীরে মিলন করাইলেন। এদিকে বনমালী বাবু ঐ সমস্ত ফুলের মালা প্রভৃতি দিয়া বিনোদ বিনোদিনীর অপূর্ব্ব সিঙ্গার করতঃ ইঁহাকে ডাকিলেন। ইনি দ্রুতপদে গিয়া বিনোদ বিনোদিনীর অপরূপ রূপলাবণ্য দর্শনে একেবারে বিমোহিত হইয়া গেলেন। বিনোদকে দর্শন করিয়া সকলেই এক বাক্যে বলিতে লাগিলেন যে— "আমরা প্রায় প্রত্যহই ঠাকুরের ফুলের সিঙ্গার দর্শন করি; কিন্তু আজ যেমন অপূর্ব্ব বেশ হইয়াছে, এরূপ ভুবনমোহন ভাব আর কখনও দর্শন করি নাই।" বিনোদবিহারীর শোভা দর্শনে সকলেই নানারূপ বলাবলি করিতে লাগিলেন। বনমালী বাবু বলিলেন,—"আজ বিনোদিনী প্রিয় নর্ম্মমঞ্জরীর উপর আদেশ করতঃ নিজের মনের ভাবানুযায়ী মালাদি প্রস্তুত করাইয়াছেন তাই এত মধুর সাজিয়াছে; ইত্যাদি নানারূপ রসকৌতুকে কিছুক্ষণ পরমানন্দে কাটিয়া গেলে, যথাসময়ে বিনোদের মহাপ্রসাদ পাইয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করতঃ বনমালী বাবুকে সঙ্গে লইয়া কুসুম সরোবরে আগমন করিলেন।

একদিন ইনি দাউজীর সম্মুখে বসিয়া শ্রীরামহরিদাস বাবাজী, হরিচরণদাস বাবাজী, মাধবদাস বাবাজী, বনমালী রায়-প্রভৃতি কয়েকজন মহাত্মার সহিত নানাবিধ লীলাপ্রসঙ্গ করিতেছেন। আজকার লীলাপ্রসঙ্গ রাধাগোবিন্দ লইয়া নয়। কেবল বলরামের তত্ত্ব সম্বন্ধীয় কথা। চিৎশক্তি বলরাম হইতে যে শয্যা, আসন, ছত্র, পাদুকাদি লীলার যাবতীয় বস্তুর প্রকাশ হইয়াছে; কৃষ্ণসুখের জন্য দাউজী দয়াল যে আপনা পর্য্যন্ত ভুলিয়া যান, সর্ব্বদা যে তিনি কৃষ্ণসেবায় নিমগ্ন, এই সমস্ত কথার প্রস্তাব হইতে হইতে হঠাৎ ইনি অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। অষ্টসাত্ত্বিক বিকার সেই সুবিশাল দেহখানি সমলঙ্কৃত করিয়া সাধারণের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিল। আরক্তিম ঢুলু ঢুলু নয়নযুগল হইতে

অবিরত ধারে অশ্রু ঝরিয়া দর্শকবৃন্দের হৃদয় দ্রব করিতেছে। কিছুক্ষণ নানারূপ শুশ্রূষার পর কিঞ্চিৎ বাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া ঢুলিতে ঢুলিতে দাউজীর মন্দিরের পূর্ব্বদিকস্থ একটী নিম্ববৃক্ষতলে গিয়া দাঁড়াইলেন। পূর্ব্বোক্ত মহাত্মাগণ সকলেই সঙ্গে রহিয়াছেন। বৃক্ষরাজের অপূর্ব্ব দর্শন। প্রথম একটী মূল হইতে দুইভাবে বিভক্ত হইয়া অনুমান দুই হস্ত ঊর্দ্ধে উঠিয়া অবার একত্র মিলিত ভাবে বর্দ্ধিত হইয়াছেন। মধ্যস্থ ফাঁকটী দেখিয়া ইনি হৃষ্টচিত্তে সকলকে বলিলেন—"দেখ, এইটী ব্রহ্মযোনি—যিনি ইহার ভিতর দিয়া পার হইয়া যাইতে পারিবেন, তাহার আর গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না।" এই বলিয়া নিজে ইহার ভিতর দিয়া পার হইয়া গেলেন। ইঁহার দেখাদেখি মাধবদাস বাবাজী, হরিচরণ দাস বাবাজী, বনমালী বাবু প্রভৃতি সকলেই অক্লেশে পার হইয়া গেলেন। শ্রীরামহরিদাস বাবাজী মহাশয় পারহইতে গিয়া আটকাইয়া গেলেন। পেট আর কিছুতেই গলিতেছে না দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—"বাবা চরণ! আমি ত তোমার ব্রহ্মযোনি পার হইতে পারিলাম না আমার ত পেট আটকিয়া গেল!" তখন ইনি বলিলেন,—"বাবা! আপনি নিঃশঙ্কভাবে গলিয়া আসুন, আমি আছি ভয় কি?" বলিতে না বলিতেই তিনি অনায়াসে পার হইয়া গেলেন। তখন সকলে ঐ বৃক্ষরাজের মূলে উপবেশনপূর্ব্বক কিছুক্ষণ নানারূপ ইষ্টগোষ্ঠী করতঃ নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করিলেন।

একদিন মা জাহ্নবা দেবীর উৎসব উপলক্ষে বনমালী বাবু সগণে বাবাজী মহাশয়কে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। ইনি মাধবদাস বাবাজী, হরিচরণ দাস বাবাজী প্রভৃতি মহাত্মাগণকে সঙ্গে লইয়া গমনোদ্যত হইয়া নাম ধরিলেন—"হরি বলের ভাই! গদাধর গৌরাঙ্গ বসু জাহ্নবা নিতাই। বসু জাহ্নবা নিতাই, সীতা অদ্বৈত গোঁসাই॥" ইত্যাদি। অপূর্ব্ব আনন্দ! সকলে নৃত্য করিতে করিতে শ্রীরাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড পরিক্রমা করিয়া মা জাহ্নবার ঘাটে কিছুক্ষণ উদ্দণ্ড নৃত্য কীর্ত্তন করতঃ বিনোদের মন্দিরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্ব হইতেই কীর্ত্তনধ্বনি শুনিয়া বনমালী বাবু ইঁহাদিগকে অভ্যর্থনার জন্য অগ্রগামী

হইতেছিলেন, বিনোদের বাড়ীর সদর দরজায়ই উভয়ের মিলন হইলে, বনমালী বাবু দণ্ডবৎ প্রণাম করিবামাত্র ইনি উঁহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন প্রদান পূর্ব্বক ভিতরে প্রবেশ করতঃ কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর মহাপ্রসাদ গ্রহণানন্তর পুনরায় নাম করিতে করিতে কুসুম সরোবরে গমন করিলেন।

রাত্রি অনুমান দশটা—সকলেই নিদ্রিত। বাবাজী মহাশয় দাউজীর সম্মুখবর্ত্তী একটী বকুলতলায় শয়ন করিয়া আছেন। শ্যামদাদা ইঁহার চরণসেবা করিতেছেন। চারিদিক্ নিস্তব্ধ, হঠাৎ ইঁহার শরীর হইতে প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় ভয়ানক একটা তেজ বাহির হইতে লাগিল। শ্যামদাদা সহ্য করিতে না পারিয়া চক্ষু মুদ্রিত করতঃ মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—"কি আশ্চর্য্য! এরূপ উজ্জ্বল রূপ ত আমি আর্ কখনও দেখি নাই! চোখ ঝল্‌সিয়া যায় রে!" ভাবিতে ভাবিতে চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন যে, সেই তেজের মধ্য হইতে ইঁহার দেহে বহুবিধ ঐশ্বর্য্যের বিকাশ হইতে লাগিল। দেখিয়া শ্যামদাদা একেবারে স্তম্ভিত। মনে মনে নানারূপ সংকল্প বিকল্প করিতেছেন, ইত্যবসরে ইনি নিজ চরণ দুইখানি শ্যামদাদার কোল হইতে টানিয়া লইয়া 'কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!' বলিতে বলিতে শ্যামদাদাকে বলিলেন,—"শ্যাম!"

শ্যাম। আজ্ঞে!

বাবাজী। তুই কি চাস্?

শ্যামদাদা একমনে ইঁহার কথা শুনিতেছিলেন। যেমন ইনি চরণদুইখানি উঁহার কোলের উপর হইতে নামাইয়া নিলেন, অমনি শ্যামদাদা চমকিত ভাবে ইঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন; সুতরাং ইঁহার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইল না; তখন আবার নিজেই বলিতে লাগিলেন,—"দেখ নিতাই-গৌর, রাধা-কৃষ্ণ পাওয়া অতি সহজ। তাঁহারা ত তোদের সম্মুখে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, উপযুক্ত হৃদয় না হইলে তাঁহাদিগকে চিনে কে? যোগ্য দেহ না হইলে উঁহাদিগকে আস্বাদন করিবে কে? আচার্য্যগণ যত কিছু সাধন ভজনের উল্লেখ করিয়াছেন, একমাত্র দেহ প্রস্তুত করিবার জন্য। যোগ্য দেহ প্রস্তুত হইবামাত্রই তৎক্ষণাৎ

কৃষ্ণপ্রাপ্তি হইবে! কৃষ্ণ বা কৃষ্ণপ্রেম প্রাপ্তির জন্য কোনও সাধনের প্রয়োজন হইতে পারে না।" সাধনের কথা শুনিয়া শ্যামদাদার মুখখানি কেমন একপ্রকার হইয়া গেল দেখিয়া বলিলেন—"যা, কোন চিন্তা নাই, নিতাইএর কৃপায় সব হইবে।" ইত্যাদি নানা কথাপ্রসঙ্গে রাত্র শেষ হইয়া গেল। প্রাতঃকালে উঠিয়াই গোবিন্দদাদাকে বলিলেন,—"গোবিন্দ! তোমার নিকট যে বস্তু রাখিতে দিয়াছিলাম* তাহা শীঘ্র লইয়া আইস।" বলিয়া কয়েকজন সঙ্গিসহ শ্রীরাধাকুণ্ডে গমন করিলেন। যথাসময়ে তথায় উপস্থিত হইয়া উভয় কুণ্ড পরিক্রমা পূর্ব্বক সঙ্গমস্থলে বসিয়া গোবিন্দদাদার নিকট হইতে পূর্ব্বোক্ত বস্তু গ্রহণ করতঃ প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা সময় ধ্যান-নিমগ্নভাবে থাকিয়া প্রেম-পুলকিত শরীরে উক্ত বস্তুটী সঙ্গমের জলে নিক্ষেপ করিলেন। এদিকে সঙ্গিগণ পরমানন্দে শ্রীকুণ্ডের জলে সন্তরণ করিতেছিলেন। ইনি নৃত্য করিতে করিতে গিয়া শ্রীকুণ্ডে অবগাহন করিলেন। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত নানাভাবে জলকেলি করতঃ যথাসময়ে বিনোদের মন্দিরে মহাপ্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক কুসুম সরোবরে প্রত্যাগমন করিলেন।

একদিন অপরাহ্ন সময় ইনি শ্রীরামহরিদাস বাবাজী, হরিচরণদাস বাবাজী, মাধবদাস বাবাজী, শ্যামদাদা প্রভৃতি বৃন্দাবনবাসী কয়েক মূর্ত্তি বৈষ্ণব সঙ্গে বসিয়া আছেন, এই সময় হঠাৎ বনমালী বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলে, ইনি বলিলেন,—"দেখ ভাই! আমার মনে হয় যে, একবার তোমাদের সকলকে লইয়া শ্রীধাম পুরী যাই।" শুনিয়া সকলেই যেন একটু বিস্মিত ভাব ধারণ করিলে, হরিচরণ দাস বাবাজী বলিলেন—"দাদা! ঐ আজ্ঞাটী করিবেন না। আশীর্ব্বাদ করুন, পরম মাধুর্য্যময়ী সুমধুর বৃন্দাবনভূমি পরিত্যাগ করিয়া যেন ঐশ্বর্য্যের ধাম শ্রীজগন্নাথে যাইতে না হয়। পুরীধাম মহান ঐশ্বর্য্যের ধাম। সেই স্থান কি আমাদের ভাল লাগে?"

বাবাজী। ভাই! পুরীধাম ঐশ্বর্য্যের ধাম এ কথা আমি স্বীকার করি; কিন্তু

---

*। ছোট একটী কাপড়ের পুটুলি ঝাঁজপীটা মঠে গোপনে উঁহার নিকট রাখিবার জন্য দিয়াছিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ত আর ঐশ্বর্য্যধামে বাস করেন নাই। তিনি জগন্নাথকে ব্রজেন্দ্রনন্দন এবং পুরীধামকে বৃন্দাবন দর্শন করিয়াছেন; সুতরাং মহাপ্রভুর অনুগত লোকেরা ত নিশ্চয়ই পুরীধামকে মধুর হইতে সুমধুর মনে করিবে। ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য সাধকের মানসিক ভাব অনুসারে ইহয়া থাকে। যেমন পূর্ণ পূর্ণতম ব্রজেন্দ্রনন্দনে মাধুর্য্যের পূর্ণতমতা, ঐশ্বর্য্যেরও পূর্ণতমতা, সেইরূপ তাঁহার নিত্য বসতিস্থল শ্রীবৃন্দাবন ধামেও উভয়েরই পূর্ণতমতা বর্ত্তমান। সাধকের ভাবানুয়ায়ী কেহ বা গো-গোপবালকসহ কৃষ্ণের বন্যভোজন গ্রহণ করিয়াছেন, আবার কেহ বা ব্রহ্মার মোহন ভাব গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপ সর্ব্বত্রই জানিতে হইবে। ভাব ত আর বাহিরের শাস্ত্রগত নহে, ভাব উপাসকের অন্তর-গত।

হরি। ভাব অন্তরগত এ কথা সত্য, কিন্তু বাহিরের কতকগুলি বস্তুর সংসর্গে উৎকর্ষ অপকর্ষ হইয়া থাকে ত! "ন হি বস্তুশক্তির্বুদ্ধিমপেক্ষতে।" ঐশ্বর্য্যপ্রধান স্থানে থাকিলে বিশেষ চিন্তা করিয়া মাধুর্য্য ভাব আনিলেও ধামগত স্বভাব-সিদ্ধ ঐশ্বর্য্য ভাব থাকিবেই থাকিবে।

বাবাজী। আচ্ছা, তুমি ত পণ্ডিত; নবদ্বীপ, নীলাচল এবং বৃন্দাবন ধামের মধ্যে কোন্ ধামটীকে তুমি ঐশ্বর্য্যের ধাম বল?

হরি। কেন, এ ত সর্ব্বসাধারণেরই জানা আছে যে, নীলাচল ধাম ঐশ্বর্য্য-প্রধান?

বাবাজী। একটু বিশেষ ভাবে চিন্তা করিয়া বল।

হরি। আমি ত চিন্তা করিয়া ইহা অপেক্ষা অন্য কিছু ধারণায় আনিতে পারিতেছি না। আচ্ছা, আপনি কি বলেন?

বাবাজী। আমি ত বলি বৃন্দাবন ধাম পূর্ণ পূর্ণতম ঐশ্বর্য্য এবং মাধুর্য্যের স্থান।

হরি। কিরূপে? আমায় বুঝাইয়া দিন।

বাবাজী। বৃন্দাবনের ঐশ্বর্য্যের কথা কত বলিব? প্রথম হইতে ধর—

পুতনা, অঘাসুর, বকাসুর, যমলার্জ্জুন, শকটাসুর, তৃণাবর্ত্ত, বৎসাসুর, প্রলম্বাসুর, ব্যোমাসুর প্রভৃতির বিনাশ, কালীয়দমন, দাবানল-ভক্ষণ, গোবর্দ্ধনধারণ, ব্রহ্মমোহন, নন্দমোহন, মৃত্তিকাভক্ষণ প্রভৃতি কোন্ লীলাটী মাধুর্য্যময় আমাকে বুঝাইয়া দাও ত।

হরি। অসুরবধাদি কার্য্য ত কৃষ্ণের নহে; 'বিষ্ণুদ্বারে করেন কৃষ্ণ অসুর সংহার।' পূর্ণতম ব্রজেন্দ্রনন্দনে একমাত্র মাধুর্য্য লীলা ব্যতীত ঐশ্বর্য্যের সংস্পর্শ থাকিতে পারে না। 'নিরন্তর কুঞ্জক্রীড়া যাঁহার চরিত।'

বাবাজী। ভাই! তুমি ত পণ্ডিত; আগা গোড়া সমন্বয় রাখিয়া সিদ্ধান্ত করা উচিত। তুমিই বলিলে "ন হি বস্তুশক্তির্বুদ্ধিমপেক্ষতে।" প্রকাশমান্ ঐশ্বর্য্যের মধ্যে আরোপ করিয়া মাধুর্য্য ভাব আনিলেও তাহার মধ্যে ঐশ্বর্য ভাব থাকিবেই থাকিবে। পূতনার বক্ষের উপর কৃষ্ণকে দেখিয়াও যে তিনি কার্য্য করেন না, একথা একমাত্র উপসকভেদে ধারণার বিষয় ভিন্ন সার্ব্বজনীন হইতে পারে না। যদি তাহাই স্বীকার করিতে হয়, তবে ধামান্তরেও ত সামান্য ঐশ্বর্য্যের বিষয়কে মাধুর্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে। এ ত গেল বিচারের কথা। যদি নিরপেক্ষ ভাবে ভাবিয়া দেখিতে হয়, তবে বলিতে হইবে যে, যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের মতাবলম্বী সাধক, তাঁহাদের পক্ষে নীলাচল ধাম সর্ব্বোপরি এবং শ্রীগৌরাঙ্গদেব ধামকে এবং ধামেশ্বরকে যেরূপ ভাবে দর্শন, স্পর্শন, বা অনুভব করিয়াছেন, ঠিক সেইরূপ ভাবে দর্শন, স্পর্শন বা অনুভব করা উচিত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতারের যে উদ্দেশ্য তাহা অন্য কোথাও সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব বলিয়া শ্রীনীলাচল ধামে অষ্টাদশ বৎসর একাদিক্রমে বাস করতঃ শ্রীরাধাভাবে বিভাবিত হইয়া অন্তরঙ্গ শ্রীস্বরূপ দামোদর এবং রায় রামানন্দের সঙ্গে নিগূঢ় ব্রজরস আস্বাদন করিয়াছিলেন। আমাদের যখন সেই বস্তু আস্বাদনের বিষয়, তখন সেই ধামে, সেই মহাপ্রভুর আনুগত্য স্বীকার না করিলে কিরূপে আস্বাদন হইবে? অন্যান্য পথ বা মতাবলম্বী সাধকগণ নীলাচল ধামকে যাহাই বলুন না কেন, আমাদের পক্ষে সেইটীই পরম ধাম।

ইত্যাদি নানারূপ ভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মাধুর্য্যতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া উপস্থিত সকলের হৃদয়ে আনন্দ প্রদান করিলেন।

শ্রীরামহরিদাস বাবাজী মহাশয় বলিলেন—"বাবা! আমার কোনই আপত্তি নাই; কারণ যেখানে আমার মহাপ্রভু; সেইখানেই বৃন্দাবন—সেইখানেই নবদ্বীপ বর্ত্তমান। ইনি একটু মৃদু হাসিয়া হরিচরণ দাস বাবাজীকে বলিলেন—"কি হে পণ্ডিত ভায়া! কি ভাবিতেছ?"

হরি। না, কি আর ভাবিব? আপনার কথায় আমার ভ্রম সংশোধন হইল: যথার্থই প্রাকৃত ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা চিন্ময় অপ্রাকৃত বস্তুর উপলব্ধি করিতে যাওয়া ভুল। ভাবের দ্বারাই বস্তুর উপলব্ধি, ভাবের দ্বারাই আস্বাদন। একবস্তু হইতেই ভাবভেদে পৃথক্‌রূপ আস্বাদন হইয়া থাকে। ভাবই একমাত্র মূল। এ সমস্তই বুঝিলাম; কিন্তু এই ব্রজের রজ ছাড়িয়া প্রাপ্তির বিষয় অধিক থাকিলেও যেন অন্যত্র যাইতে না হয় এই কৃপা করুন।

বাবাজী। এরূপ নিষ্ঠা থাকা অতি সুন্দর, তবে দেখ ভায়া! আমি অন্য কিছু বলিতে চাই না। এই বৃন্দাবনে এমন একটী সময় আসিবে, যখন তোমাদের সকলকে, এমন কি এই বনমালীর প্রাণধন বিনোদ-বিনোদিনীকে পর্য্যন্ত স্থানান্তরে যাইতে হইবে।

এইরূপ নানা কথোপকথনে বেলা অবসান হইল দেখিয়া অন্যান্য সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। ইনিও নিজ নিত্য কৃত্য করিতে গমন করিলেন।

এইরূপ পরমানন্দে কয়েক দিন কুসুম সরোবরে কাটিয়া গেল। একদিন ইনি পুরী যাইবার মানসে ফণী, রাধাবিনোদ, কালাকৃষ্ণ, মধুদাদা, দয়ালদাস, শীতলদাস প্রভৃতি সঙ্গিগণকে ডাকিয়া বলিলেন,—"দেখ, তোমরা আর কালবিলম্ব না করিয়া আজই হাঁটাপথে শ্রীধাম পুরী যাত্রা কর। আমার সহিত যথাসময়ে সেখানে দেখা হইবে।" প্রথমে উহারা ইঁহার সঙ্গছাড়া হইবার জন্য

একটু আপত্তি করিতে লাগিল দেখিয়া মাধবদাস বাবাজী বলিলেন,—"দাদা! এই সুকুমারমতি বালকদিগের উপর এরূপ কঠোর আদেশ করা হইল কেন? উহারা কি অত কষ্ট সহ্য করিতে পারিবে?"

বাবাজী। ভাই! উহাদিগের প্রতি মহাপ্রভুর বিশেষ কৃপা। এটী আমার আজ্ঞা নহে, মহাপ্রভুর আজ্ঞা। উহারা অবিচারে পালন করিতে পারিলে উহাদেরই মঙ্গল হইবে।

সঙ্গিগণ আর কোন কথা না বলিয়া সকলকে দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক রওনা হইলেন। কেবলমাত্র রাধাবিনোদ এবং কালাকৃষ্ণ ইহারা দুইজনে একটী কাঁটাবনের মধ্যে লুকাইয়া রহিল। অন্যান্য সকলে রওনা হইয়া যাইবার পরদিন আসিয়া উহারা বাবাজী মহাশয়ের সহিত দেখা করিবামাত্র ইনি ক্রোধান্বিতভাবে বলিলেন—"তোমরা যাও নাই কেন?" উহারা বলিল—"আপনার সঙ্গ ছাড়িয়া যাইতে পারিলাম না।"

বাবাজী। তোমরা যখন মহাপ্রভুর আজ্ঞা লঙঘন করিলে, তখন আমার সঙ্গ ত ছাড়িতেই হইবে; তোমাদের আরও বিশেষ অনিষ্ট হইবে।

এই বলিয়া নীরব হইলেন। সঙ্গিগণকে বিদায় দিয়া দশ বার দিন কুসুম সরোবরে থাকিয়া মধুর বাক্যে সকলের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক যথাসময়ে অবশিষ্ট সঙ্গিগণকে সঙ্গে লইয়া শ্রীধাম পুরী রওনা হইলেন।

ইতি পঞ্চম খণ্ড

জীবনচরিত, কীর্ত্তন ও ভক্তিগ্রন্থাবলী

১। চরিতসুধা ৬ খণ্ড

শ্রীমদ রাধারমণচরণদাস দেবের পূত জীবনচরিত। কিরূপভাবে ভক্তজীবন গঠিত হয় বা ধর্ম্মপথে অগ্রসর হওয়া যায় এই শ্রীগ্রন্থে তাহা বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

২। চরিতমাধুরী—৪ খণ্ড

শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহারাজের সুমধুর জীবনচরিত যাহা অসাধারণ বৈরাগ্য ও ভক্তি যাজনের বাস্তবচিত্র বা চরিত্র।

৩। শ্রীগুরুকৃপার দান—৩ খণ্ড

শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজের আখর সমন্বিত এই কৃপারদান রসিক ভক্তগণের আস্বাদ্যতম প্রেমের পাথার।

৪। সাধক-কণ্ঠমালা

ভক্তিলিপ্সু শ্রীবৈষ্ণবভক্তবৃন্দের নিত্য কর্ত্তব্য বিষয় সঙ্কলিত নিত্য পাঠ্য অতিপ্রিয় গ্রন্থ (৫) শ্রীগুরুকথা প্রসঙ্গ – ১ম খণ্ড – ৩০.০০, ২য় খণ্ড – ৩০.০০ (৬) শ্রীশ্রীগোপালসহস্রনাম—৩.০০ (৭) প্রেমসহচরী - ১৫.০০ (৮) শ্রীএকাদশী মাহাত্ম্য—১০.০০ (৯) ভাগবতাচার্য্য-লীলাপ্রসঙ্গ—১০.০০ (১০) ব্রহ্মমোহন—৬.০০ (১১) দামবন্ধন ও অঘাসুর বধ—১০.০০ (১২) পরমার্থ কথা—৫০.০০ (১৩) শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী—৭৫.০০ (১৪) ত্রিসন্ধ্যা-কীর্ত্তন—১৫.০০ (১৫) নামমহিমা—১০.০০ (১৬) মায়াচ্ছন্ন মায়াপুর—২৫.০০ (১৭) মহাপ্রভুর মহাপ্রয়াণ—৪০.০০ (১৮) শ্রীশ্রীললিতা সখী— ৩০.০০ (১৯) শ্রীকৃষ্ণের রাসরসতত্ত্ব—৩০.০০ (২০) গোপীগীতের পূর্ব্বকথা ও গোপীগীত—৩০.০০ (২১) সংকলিত ভাগবতী কথা—১ম ৩০.০০, ২য় ৩০.০০ (২২) ঠাকুর হরিদাস —১৬.০০ (২৩) ছয় গোস্বামী ও বাবাজী মহারাজ ১৫.০০ (২৪) The Life of Love 125.00 (২৫) বড়বাবার সার্দ্ধ শতবর্ষ স্মরণিকা—৩০.০০ (২৬) বৈষ্ণবব্রতোৎসব বিবরণী—১২.০০ (২৭) শ্রীশ্রীনিতাইসুন্দর পত্রিকা, বাৎসরিক ভিক্ষা সডাক—৫০.০০

প্রাপ্তিস্থান

১। শ্রীপাঠবাড়ী আশ্রম, বরাহনগর, কলকাতা-৩৫। ফোনঃ ২৫৭৭-০১৩৩

২। শ্রীরাধারমণবাগ (সমাজবাড়ী আশ্রম), নবদ্বীপ, নদীয়া। ফোনঃ ৯৫৩৪৭২/২৪০-১৩২